অপহৃতা

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬৩

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

সত্তর দশকের গোড়ার দিক। বর্ষা বিদায় নিচ্ছে। আকাশে সাদা সাদা মেঘের টুকরো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর বুকে রোদ ও ছায়ার লুকোচুরির খেলা চলছে। মাঠে বিস্তীর্ণ সবুজ ধান ক্ষেত মেতে উঠেছে। বর্ষার জমে থাকা জল নেমে গেলেও মাটি নরম আছে। পথের ধারে সারি সারি গাছ বর্ষার জলে সবুজ ও সতেজ। সোনালী ঝিলিকে রোশনাই। জি· টি· রোড বেয়ে একটি অ্যাম্‌বাসাডার গাড়ী চলেছে। আসছে কোলকাতা থেকে। গন্তব্যস্থল —পাণ্ডুয়া ; একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে।

পথের দু-পাশে গ্রাম, মাঠ, দোকান, বাড়ীঘর একটার পর একটা পার হয়ে, গাড়িটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দক্ষ ড্রাইভার—ওভারটেক্ করা গাড়ীগুলোর মোকাবিলা করছে খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই।

পাণ্ডুয়া ঢোকার মুখে কুতবমিনারের মত একটা মিনার রাস্তার ডান পাশে দেখে, গতিবেগ কমলো এবং ডানদিকের গ্রাম্য কাঁচা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে গেল।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন আরোহী। সুপুরুষ, পরনে নিপুণ দর্জির হাতে তৈরী দামী জামা প্যান্ট ও টাই আভিজাত্যের ছাপ বহন করছে। মোজা সমেত দামী বাটার জুতো, ধুলো বালি থেকে বাঁচাতে উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন। মাঝবয়সী ; দাড়ি গোঁফ নিখুঁত-ভাবে কামানো, হাতে বিদেশী রিস্টওয়াচ। মিনারটির চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন।

মুহূর্তের মধ্যে দু-তিনটি মোটর সাইকেল এসে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেলেও ইঞ্জিন সচল ছিল। একজন আরোহী মোটর সাইকেল থেকে নেমে নমস্কার জানিয়ে বললো—'আমি সেখ ইস্‌লাম। আপনার নাম কি মিঃ এম· চৌধুরী ?'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। সেখ ইস্‌লাম বয়সে যুবা। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা, হাতে রিস্টওয়াচ, পায়ে হাওয়াই

চপ্পল। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে পরস্পরের করমর্দন করলেন। অপর দুটি মোটর সাইকেলের আরোহীরাও নেমে এসে পাশে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিলেন—একজনের নাম তারাপদ পাল এবং অপরজনের নাম শম্ভু শেঠ। ভদ্রলোক উভয়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন। উভয়েই বয়সে যুবা, পরনে ফুলপ্যান্ট ও ফুলশার্ট, পায়ে চটি জুতো।

মিঃ এম· চৌধুরী মিনারটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এটি কোন্ সময়ে তৈরী হয়েছিল?' পাশে প্রাচীন ইঁটের তৈরী সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে তার নির্মাণ সময় এবং উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লাম বললো—'খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দিনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার উদ্দিন (মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী)-এর বাংলাদেশ অধিকারকালে রাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেই সময় স্থানীয় এই পরগনার রাজা ছিলেন পাণ্ডু বা পাণ্ডব। তাঁর রাজধানী ছিল 'মহানাদ'। মহানাদের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, সুলতান শাহ সুফিউদ্দীন বিজয়স্তম্ভ হিসাবে এই মিনার নির্মাণ করেছিলেন। আর ঐ যে প্রাচীন ইঁটের তৈরী ভগ্ন তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছেন—ওটা হচ্ছে —বাইশদুয়ারী। সুলতান শাহ সুফিউদ্দিনের সময়েই তৈরী।

মিঃ এম· চৌধুরী 'রাজু' বলে ডাক দিতে, 'জী! হুজুর' বলে গাড়ীর ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে নেমে এল। পশ্চিম দেশীয়, বয়স বাইশ তেইশ বৎসর। গায়ের রং ফর্সা, বয়সের তুলনায় স্বাস্থ্য মজবুত। গাঁট্টা গোট্টা। পরনে খাঁকি প্যান্ট-জামা। জামার পকেটে লালসুতোয় লেখা 'চেম্বার অফ্ কমার্স' শব্দগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চেম্বার অফ্ কমার্সেরই নিযুক্ত ড্রাইভার।

মিঃ এম· চৌধুরী বায়নোকুলারটি আনতে বলায়, ড্রাইভার গাড়ীর ভিতর রাখা অ্যাটাচি খুলে বায়নোকুলারটি এনে তাঁর হাতে দিল। তিনি বায়নোকুলারের সাহায্যে মিনারটি দেখতে দেখতে বললেন—'দেখছি মিনারটির পাঁচটি থাক। ভিতরে নিশ্চয়ই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি আছে?'

শম্ভু শেঠ জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি ওপরে উঠবেন?

তাহলে দরোয়ান ডেকে দরজা খুলে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

মিঃ চৌধুরী উঠতে রাজী হলেন না।

মিনারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইস্‌লাম বললো—'স্যার, এটা উচ্চতায় একশো পঁচিশ ফুট। আগে ছিল একশো ছত্রিশ ফুট। একশো একষট্টিটি সিঁড়ি আছে।' বাইশদুয়ারী দেখবার জন্য মিঃ চৌধুরী হাঁটতে শুরু করলেন। সকলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললো। আশপাশের ছেলে ছোকরারা ভিড় করেছিল।

তিনি বায়নোকুলার দিয়ে পাথরের থামের নক্সাগুলি মনোযোগ দিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন; বললেন—'দেখছি, টেরাকোটা শিল্পে তৈরী এই ইমারত, তৎকালীন যুগের সমাজব্যবস্থার ছবি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট।'

পাশ থেকে কেউ মন্তব্য করলো—'এইগুলি হিন্দু সংস্কৃতি। মুসলমানেরা একে বিকৃত করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে কেউ বললো—'না, এ হচ্ছে মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতি।' মিঃ চৌধুরী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বিতর্ক এড়িয়ে বললেন, 'প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এর সংরক্ষণ করবে। যেমন আছে—তেমনই থাকবে। ইতিহাস যা বলেছে তা সকলকে মেনে নিতে হবে। আমার নিজস্ব কোন মন্তব্য নেই।'

উপস্থিত জনতাকে সামনে রেখে মিনার এবং বাইশদুয়ারীর দুটি ফোটোগ্রাফ নেওয়া হোল।

ইসলাম জিজ্ঞাসা করলো—'স্যার, জি. টি. রোডের ওপারে কাছেই শাহসুফি সুলতানের দরগা আছে! দেখবেন নাকি?'

মিঃ চৌধুরী বললেন—'না, আমি যে কাজে এসেছি—তার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলুন।' চিৎকার করে রাজুকে গাড়ী আনতে হুকুম করলেন।

রাজু গাড়ীতেই বসেছিল। গাড়ী নিয়ে এলে মিঃ চৌধুরী উঠে বসলেন। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। একটা মোটর সাইকেল গাড়ীর সামনে এবং অপর দুটি পিছনে চলতে আরম্ভ করলো।

চোখ ধাঁধানো একটি অতি সুন্দর বিরাট দোতলা বাড়ীর সামনে এসে সব যানই থেমে গেলো। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল আয়তন একটি

হলঘরের মধ্যে সকলে প্রবেশ করলেন। দামী পাথর দিয়ে মোজাইক করা মেঝে। ডিসটেম্পার করা দেওয়াল। দেওয়াল আলমারীর দামী কাঠের সুন্দর পালিশের জন্য ঘরের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। বহু অর্থব্যয়ে দেওয়ালের চারদিকে বিদেশী শিল্পীর আঁকা চিত্রপট। কন্সিলস্ ওয়ারিং।

ঘরের মেঝেতে অল্প উঁচু প্লাটফর্মের ওপর ডায়াস। তিনটি গদি আঁটা চেয়ার। সামনে দামী চক্চকে টেবিলের ওপর হাতের কাজ করা সুন্দর টেবিল ক্লথ। টেবিলের দুপাশে ফুলদানীতে দুটি মনোমুগ্ধকর ফুলের তোড়া।

চেয়ারগুলোর পেছনের দেওয়ালের ওপরদিকে গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ রংয়ের ব্যানার—তাতে লেখা রয়েছে—'হুগলী জেলা বালিখাদ মালিক অ্যাসোসিয়েশন', সাদা থার্মোকল কেটে কেটে অক্ষর বসানো হয়েছে।

ডায়াসের দুপাশে লম্বালম্বিভাবে চেয়ার সাজানো। মাঝে চলা-ফেরার রাস্তা। নক্সাকাটা চন্দনকাঠের সুন্দর ধূপদানীতে রাখা দামী ধূপের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর।

মিঃ চৌধুরী হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ালেন। ইসলাম, শম্ভু শেঠ এবং তারাপদ পাল মিলে মিঃ চৌধুরীকে ডায়াসের ওপর নিয়ে গিয়ে প্রধান অতিথির আসনে বসিয়ে দিলেন। তাঁর সামনে একটি ফলক, লেখা—'প্রধান অতিথি'। প্রধান অতিথির ডান দিকের চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর একটি ফলক। লেখা—ডাঃ ব্যানার্জী 'সভাপতি' ডানদিকের চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর অনুরূপ ফলকে লেখা—মহম্মদ ইব্রাহিম 'সম্পাদক'।

মাঝবয়সী, দোহারা চেহারার কালো রঙের একজন ভদ্রলোক—মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে করমর্দন করে পরিচয় দিলেন যে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি 'ডাঃ ব্যানার্জী'। বললেন তিনি মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার এবং স্যান্ড মার্চেন্ট। তারপর তাঁর নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন।

দামী পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং জুতো পরা একজন মাঝবয়সী স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে করমর্দন করে

তাঁর পরিচয় দিলেন যে তাঁর নাম 'মহম্মদ ইব্রাহিম'—অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী।

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ দু সারির চেয়ারে নিজ নিজ আসনে বসে আছেন। পোশাক পরিচ্ছদে সকলের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রকাশ।

হলঘর বড় হওয়ায় পান্ডুয়া ঘোষ ব্রাদার্সের মাইক ঠিক করা হয়েছে। ঘোষ ব্রাদার্স প্রেরিত মাইকম্যানটির ময়লা জামা এবং লুঙ্গি পরিবেশের সঙ্গে মানানসই না হওয়ায়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হোল।

মহম্মদ ইব্রাহিম ঘোষণা করলেন, 'আমাদের সমিতির সাধারণ সভার কাজ আমরা আরম্ভ করছি ; আজকের সভায় ডাঃ ব্যানার্জীকে সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন প্রস্তাব করছি।'

সেখ ইসলাম প্রস্তাব সমর্থন করার পর—মহম্মদ ইব্রাহিম ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ—চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান মাননীয় ডঃ এম. চৌধুরী তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে দয়া করে আজকের এই সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং মনোবল বাড়িয়েছেন। আজকের এই সভায় তাঁকে আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে বরণ করছি।'

উক্ত প্রস্তাব শম্ভু শেঠ মহাশয় সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের সমবেত করতালিতে কিছুক্ষণের জন্য হলঘর গমগম করে উঠল।

কুমারী চন্দনা দাস সভাপতির গলায় রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল। সভাপতি বরণ শেষ হতেই আবার করতালি।

কুমারী চন্দনা দাসের বয়স ষোল-সতের বছর হবে। সুশ্রী—পরণে লালপাড় শাড়ী।

মহম্মদ ইব্রাহিম ঘোষণা করলেন—'এইবার প্রধান অতিথিকে মাল্যদান করছে কুমারী চন্দনা দাস।'

রজনীগন্ধা, বেল এবং গোলাপ ফুলে গাঁথা একটি মোটা মালা ডঃ এম. চৌধুরীর গলায় পরিয়ে দেওয়া হোল। প্রায় এক মিনিট

ধরে বিপুল করতালির মধ্যে মিঃ চৌধুরী মালাটি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। দেখাদেখি ডাঃ ব্যানার্জীও তাঁর মালা খুলে রেখে দিলেন।

মহম্মদ ইব্রাহিম ঘোষণা করলেন—'এবার উদ্বোধনী সংগীত গাইবে—কুমারী চন্দনা দাস।'

উদ্বোধনী সংগীত গাইবার জন্য কোলকাতা থেকে রেডিও আর্টিস্ট আনার কথা ছিল; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না আসায়, ইব্রাহিম চন্দনাকেই রাজী করিয়েছে। তবলা সংগতের জন্য স্থানীয় একটি ছেলেকে ধরে এনেছে। হারমোনিয়াম এবং ডুগি-তবলা টেবিলের ওপর রাখা হোল।

কুমারী চন্দনা দাস হারমোনিয়াম বাজিয়ে জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম' গানটি গাইতে শুরু করলেন। গলা বেসুরো। গান একদিকে, তবলার তাল অন্যদিকে। গায়িকা এবং বাদক দুজনেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কোনরকমে দায়সারা উদ্বোধনী সংগীত শেষ হোল।

মহম্মদ ইব্রাহিম সভাপতিকে, সম্পাদকের একটি প্রতিবেদন, প্রধান অতিথির হাতে তুলে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। ডাঃ ব্যানার্জী একটি ছেলে মারফৎ প্রতিবেদন পত্রটি পেয়ে, তা মিঃ চৌধুরীর হাতে দিলেন। ইব্রাহিমের আদেশে উপস্থিত সকল সদস্য এবং অতিথিবৃন্দের প্রত্যেককে একটি করে প্রতিবেদন পত্র বিলি করা হোল।

মহম্মদ ইব্রাহিম বললেন—'আপনারা নিশ্চয়ই পিপাসার্ত, সামান্য একটু শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা আছে। যদি অনুমতি করেন।—'

সকলে সমস্বরে বললেন—'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

ছেলেরা সকলকে একটি করে কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর বোতল দিল!

পরনে ফুলপ্যান্ট, বুশশার্ট, পায়ে কাবুলি স্যান্ডেল, কাঁধে ক্যামেরা—একটি যুবক ডায়াসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইব্রাহিম সাহেবকে সেলাম জানাল।

ইব্রাহিম হেসে বললো—'ও, আলিম ভাই! তুমি এসে গেছ?

ঠিক সময়েই এসেছ। একটা স্ন্যাপ নিয়ে নাও।'

সকলে পোজ নিয়ে বসল। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের সাদা ঝলক্ বার কয়েক হলঘরের মধ্যে খেলে গেল।

মঞ্চ থেকে নেমে, ইব্রাহিম নিজে সকলে কোল্ড ড্রিঙ্কস পেয়েছেন কিনা তা তদারক করতে লাগলেন। বিশেষ মনোযোগ দিলেন—পিছনের চেয়ারে বসে থাকা সাংবাদিকদের দিকে। পকেট থেকে দামী সিগারেট বার করে তাঁদের অফার করলেন।

ডাঃ ব্যানার্জী বললেন—'এবার তাহলে আমাদের সভার কাজ শুরু করতে পারি ?'

সকলে সমস্বরে—'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

ডাঃ ব্যানার্জী, মহম্মদ ইব্রাহিমকে মঞ্চে ডেকে আনলেন। তিনি প্রকাশিত রিপোর্টটি হাতে নিয়ে, অ্যাডভারটাইজমেন্টগুলি বাদ দিয়ে, সম্পাদকের প্রতিবেদন লেখাটি বার করে পড়তে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ।

'মাননীয় সভাপতি, এবং প্রতিনিধিবৃন্দ! আপনাদের কাছে আমার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন দেওয়া আছে। আপনারা অবশ্যই তা পড়ে নিয়েছেন। আমি শুধু কয়েকটি সমস্যার কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আপনারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। প্রথমত আমি মনে করি যে, আমাদের বালিখাদ ব্যবসা একটা ইনডাস্ট্রি। আমরা বহু লোককে কাজ দিচ্ছি, তাদের পরিবারের অন্নসংস্থান করে দিচ্ছি। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম থেকে কত মজুর এসে কাজ করে। যে সব জায়গায় বালিখাদ করা হয়েছে—সেই জায়গার মালিকরা তাদের কল্পনাতীত জমির দাম পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বর্তমান সরকার এবং অফিসাররা—রয়েলটির নামে আমাদের ফাঁক করছে। জমির রেকর্ড 'ডাঙ্গা' না হলে—বালির খাদের পারমিশন পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার মনে যা এল, আজকের সভায় সেই প্রশ্নগুলি তুলে ধরলাম। মাননীয় প্রবীণ অতিথি যদি এই সমস্যাগুলি সমাধানের দিকে আলোকপাত করেন, তাহলে আমরা পরম উপকৃত হই।'

বিপুল করতালির সঙ্গে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সমর্থন জানালেন।

ক্যামেরাম্যানের ফ্লাশ লাইটে ঘর আবার আলোকিত হোল।

ডাঃ ব্যানার্জী দাঁড়িয়ে বললেন—'প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আবেদন, আপনারা প্রতিবেদন পড়েছেন এবং সম্পাদকের ভাষণ শুনেছেন। যাঁরা এই বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে চান—তাঁরা তাঁদের নাম পাঠান ; তাঁদের বক্তব্য রাখবার জন্য একে একে ডাকা হবে।'

মঞ্চের ডানদিকে বসা প্রতিনিধিবৃন্দের কাছ থেকে বহু চিরকুট সভাপতির কাছে জমা পড়লো।

একটি চিরকুট তুলে নিয়ে ডাকলেন - 'কে. মল্লিক !'

চেয়ার ছেড়ে মাঝবয়সী, মাথায় টাক, পরনে ধুতি ও ফুলশার্ট, পায়ে রাবারের পা ঢাকা জুতো এক ভদ্রলোক মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।

মাইকে দুবার ফুঁ দিয়ে মিঃ মল্লিক বললেন—'আমি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। শম্ভু শেঠ এবং ইদ্রিস সাহেবের সঙ্গে পার্টনার হিসাবে একটি খাদ ব্যবসায়ে নেমেছি, জমি কিনতে এবং পুজো দিতেই তো মূলধন শেষ। তবে ব্যবসা করবো কিসে ?'

ডাঃ ব্যানার্জী পরবর্তী নাম ডাকলেন—'আনোয়ার আলি !'

পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, মুখে দাড়ি, পায়ে চটি জুতো এক ভদ্রলোক মঞ্চে এসে বললেন—'আমি মুর্শিদাবাদ থেকে লেবার এনেছি, তাদের সর্দার রেট বাড়াচ্ছে—কিন্তু লেবাররা পুরা কাজ করছে না।'

এবার ডাক পড়লো—'হায়দার আলি !'

এক তরুণ যুবক মঞ্চের দিকে এল। ম্যাচিং ফুলপ্যাণ্ট, হাওয়াই শার্ট এবং টাইগলায় যুবকটিকে খুব স্মার্ট বলে মনে হোল। তাঁর হাতের দামী হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাইকের সামনে বাজখাঁই গলায় বলতে আরম্ভ করল—'মাননীয় মিঃ প্রেসিডেন্ট এবং জেন্টলমেন্ ; আমি যে জায়গায় খাদ করেছি—সেখানে আর্থ বেশী —তারপর বালি। কিন্তু জে. এল. আর. ও. আর্থসমেত সমগ্র গভীরতাকেই বালি ঘোষণা করে রয়েলটি দাবী করছে। এতে আমার পুঁজিপাটা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কায়দা করতে গেলেও—পড়তায় আসছে না।'

এরপর ডাঃ ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন, 'কিছু টিফিনের ব্যবস্থা আছে। আপনারা কেউ চেয়ার থেকে উঠবেন না। টিফিন এবং চা আপনাদের কাছে পেঁছে দেওয়া হবে! টিফিনের পর প্রধান অতিথি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

সভার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হোল।

টিফিন শেষে, ডাঃ ব্যানার্জী আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—'আজকের প্রধান অতিথি মাননীয় ডঃ এম. চৌধুরী একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্। অর্থনীতিতে তিনি ডক্টরেট। লন্ডন, কেমব্রিজ প্রভৃতি স্থানের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন।'

সহর্ষধ্বনি ও করতালিতে হলঘর মুখরিত হোল।

ডঃ চৌধুরী মাইকের সামনে দাঁড়াতেই—ক্যামেরাম্যান দুটি স্ন্যাপ নিল। সভায় আওয়াজ উঠল—ডঃ চৌধুরী লং-লিভ-লং-লিভ। ডঃ চৌধুরী বলতে আরম্ভ করলেন—'মাইডিয়ার প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী অ্যান্ড ডেলিগেটস্ অব দি অ্যাসোসিয়েশন্! আই কনগ্রাচুলেট্ অল অফ্ ইউ—'এই পর্যন্ত বলেই ডঃ চৌধুরীকে থামতে হোল। কারণ সদস্যদের মধ্যে দু-একজন চিৎকার করে বলল, 'বাংলায় বল্লে—একটু ভাল হয়।'

ডঃ চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন—'আই অ্যাম ভেরি স্যরি।'

একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—'প্রথমেই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। গ্রামাঞ্চলের মানুষ আপনারা। অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য আমাকে আপনাদের মধ্যে আসার এবং ঐ বিষয়ে কিছু বলার যে সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আবার আপনাদের শত শত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ব্যবসায়ী, দেশ তথা জাতির সেবা করাই আমাদের ধর্ম। আমরা নিজেরা বাঁচতে চাই—তার সঙ্গে চাই বাঁচাতে দেশ ও জাতিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালিধ্বনি।

একটু থেমে ডঃ চৌধুরী বললেন—'এই প্রচারটা জনগণের মধ্যে আপনাদের ব্যাপকহারে চালাতে হবে।'

সভামধ্যে আবার করতালি।

ডঃ চৌধুরী বলে চলেছেন—'ব্যবসায় কৌশল আছে, পলিসি আছে। মন্ত্রগুপ্তি আছে। প্রকাশ্য জনসভায় সব কথা বলা উচিত হবে না। দেওয়ালেরও কান আছে, আশপাশে নানা চর থাকা স্বাভাবিক। ইনকামট্যাক্স, রয়েলটি এবং এনফোর্সমেন্ট স্টাফ্ চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার একটি থিসিস, অফিস থেকে নিয়ে আসবেন। তখন দেখবেন রয়্যালটির জন্য আপনাদের আর কোন চিন্তা করতে হবে না। সরকার আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না। খাদের জন্য কেনা জমির ব্যবহার, কৌশলে এমনভাবে করতে হবে, যাতে আশপাশের জমির মালিকরা বাধ্য হয় তাদের জমি বিক্রী করে দিতে। জমি হলেই হল। পারমিশনের অভাব হবে না। কৌশল অবলম্বন করলে, রেকর্ড সংশোধন করতে হবে না।

এটা পাবলিসিটির যুগ। ভুত হোক আর ভগবানই হোক, যার পাবলিসিটি আছে চলবে, না হলে অচল।'

প্রবল করতালিতে হলঘর ফেটে যাবার যোগাড়।

একটু দম নিয়ে, মিঃ চৌধুরী আবার বলতে আরম্ভ করলেন—'অতীতে একসময়ে এই এলাকার বেশীর ভাগ জায়গা জলমগ্ন ছিল। দামোদরের একটা শাখানদী প্রবাহিত হোত এই অঞ্চল দিয়ে, ঐ শাখানদী কালক্রমে, কুন্তল, কেদারমতী, সোয়াখাল, রোসনাই, ধুসি এবং বেহুলা নদীর সৃষ্টি করেছে। দামোদর নদীর অববাহিকা অঞ্চল হওয়ায় মাটির নীচে বালি থেকে গেছে, সেজন্য এই থানার প্রায় সর্বত্র উৎকৃষ্টমানের বালি পাওয়া যায়।

বালিখাদ কাটার জন্য বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মধ্যবিত্ত বেকাররা কাজ পাবে। লোডিং-আনলোডিংয়ের জন্য ব্যাপকহারে ট্রাক-লরির ব্যবহার হবে—যাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে, কৃষি ছাড়াও এই শিল্পে মানুষের জীবনধারণে স্বচ্ছলতা আসবে।'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—'আমি গ্রেটব্রিটেনে দেখেছি শিল্পের প্রসারে ওখানকার সম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি প্রার্থনা করি, দেশ ও দশের স্বার্থে আপনাদের এই শিল্পপ্রচেষ্টা সার্থক হোক। আর একবার

আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।' বক্তৃতা শেষ করে মিঃ চৌধুরী বিপুল করতালির মধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

ডাঃ ব্যানার্জী দাঁড়িয়ে বললেন—'মিঃ চৌধুরী আমাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় থেকে সদুপদেশ দিয়ে তাঁর যে অমূল্য সময় নষ্ট করলেন, তার জন্য বালিখাদ সমিতির পক্ষ থেকে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

মিঃ চৌধুরী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতি ও সম্পাদকের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আমাকে এখনই কোলকাতা ফিরে যেতে হবে। আর একটি প্রোগ্রাম আছে।'

মিঃ চৌধুরী পকেট থেকে তাঁর নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকটা সুদৃশ্য কার্ড সভাপতির হাতে দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন।

ইব্রাহিম ছুটে এসে মিঃ চৌধুরীর হাত ধরে অনুনয় করে বললেন—'সবাই একসঙ্গে বসে আনন্দ করে লাঞ্চ করার ব্যবস্থা আছে। আপনি এতে যোগদান না করলে, সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে এবং আমরা কেউ খাব্যো না।'

মিঃ চৌধুরী নিমরাজী হয়ে বললেন, 'তাহলে কি আর করা যায় ? বেশ ; তাই হোক ! কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।'

মিঃ চৌধুরীকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনে বসিয়ে দেওয়া হোল। সভ্য এবং অতিথিগণ নিজ নিজ চেয়ারে বসে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাঞ্চের প্লেট বিতরণ শুরু হোল। দেখা গেল —তাতে আছে, বিরিয়ানী, চিকেনকারী, ফিস্‌ফ্রাই এবং চার রকমের মিষ্টি। সকলে ভোজন শুরু করলেন। ভোজনদৃশ্যের কয়েকটা ছবি ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরায় ধরা পড়ল। রাজুর প্লেট গাড়ীতে পেঁছে দিতে কেউ ভোলেনি।

করমর্দন করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, মিঃ চৌধুরী বললেন, 'আবার আমরা এখানেই একত্রিত হব। ইলেক্‌শান্‌ পর্বটা মিটতে যা দেরী। আচ্ছা নমস্কার।' এরপর তাঁর গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। রাজু তৈরীই ছিল। জি. টি. রোড ধরে কোলকাতা অভি-

মুখে গাড়ী চলতে আরম্ভ করল, সকলে হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগলো, শেষে অদৃশ্য হয়ে গেলে, সভ্য ও অতিথি-বৃন্দ যে যাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

দুই

ইংরেজী উনিশশো বাহাত্তর সাল এই এলাকায় মনে রাখার মত বছর। সারা পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেছে আগে থেকেই।

একটি বিশেষ ঘটনার জন্য লোকসভার সদস্য শ্রীদীনেন ভট্টাচার্য *বৈঁচি এলাকায়* এলেন।

দিনটা হচ্ছে, জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ। সময় দুপুর। একটা জিপ এসে বৈঁচি-বৈদ্যপুর রাস্তায়, ডি· ভি· সি. ক্যানেল গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। জিপের আগে, পেছনে এবং আশেপাশে বহু মানুষের ভিড়। জিপের মধ্যে বসে আছেন লোকসভার সদস্য শ্রীদীনেন ভট্টাচার্য। জনতা সমাবেশ ঐ জন্যই।

গোয়েন্দাসূত্রে খবর পেয়ে এস· পি· ইন্দ্র চৌধুরী এবং পাণ্ডুয়া থানার ও· সি. মোহন লাহা পুলিশ ফোর্স নিয়ে আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন।

এস. পি. মিঃ চৌধুরীর বয়স মাঝারি, গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারায় ধোপদুরস্ত পুলিশী ইউনিফর্মে তাঁকে মানিয়েছেও বেশ। জিপের দিকে এগিয়ে এসে, জুতোয় জুতোয় ঠক্কর তুলে, স্যালিউট্ জানিয়ে শ্রীদীনেন ভট্টাচার্যকে তাঁর পরিচয় দিলেন।

পিছনেই ছিলেন, ও· সি· মোহন লাহা। বয়স মাঝারি, রং ফরসা —বেঁটে এবং মোটা। স্ফীতোদর—নেমে যাওয়া প্যান্টের মোকাবিলা করে তিনিও জিপের কাছে গিয়ে মিঃ চৌধুরীর অনুকরণ করলেন, পরিচয়ও দিলেন।

শ্রীদীনেন ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাঁদের প্রত্যভিবাদন করে, জীপ থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ালেন। বয়স ছয়ের কোঠায়, লম্বা, শ্যামবর্ণ, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চটি জুতো।

তিনি এস· পি· মিঃ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার? আপনারা তাহলে আমার সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন?'

মিঃ ইন্দ্র চৌধুরী যেন একটু কুণ্ঠিত হয়েছেন বলে মনে হল। বললেন—'না, স্যার! চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে আপনাকে ফিরে যেতে হবে।'

দীনেন ভট্টাচার্য উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'হোয়াটস দি ম্যাটার? কি সব উল্টো পাল্টা কথা বলছেন? আসার আগে আমি নিজে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কথা জানালাম। এর মধ্যেই মত পালটে গেল? হাউ পসিবল? দেখি, কি খবর আছে?'

মিঃ চৌধুরীর হুকুমে, ও. সি· মিঃ লাহা রেডিওগ্রামটি সাংসদ দীনেন ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—'স্যার! সামনে এবং পিছন থেকে প্রচুর লোক আসছে। আপনার আগে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধারোপ করা হয়েছে।'

একবার চোখ বুলিয়ে রেডিওগ্রামটি ও. সির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দীনেন ভট্টাচার্য গম্ভীরভাবে বললেন—'এখনই রাইটার্স চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিন যে, এটা পার্লামেন্টের কাজ; আমাকে আজ যেতেই হবে। পুলিশ আমার পথ রোধ করতে পারবে না।'

মিঃ চৌধুরী, ও. সিকে আর. টি-তে কমিউনিকেট করতে বলায়, তিনি আর. টি. অপারেটর শ্রীকান্তকে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার হুকুম করলেন।

একটি আর. টি. মেশিন জীপের মধ্যেই ছিল। দেখা গেল একটা লম্বা তার জীপের মাথা থেকে শূন্যে ঝুলছে।

শ্রীকান্তের বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। তার বাবার মৃত্যুতে তাঁর জায়গায় কিছুদিন আগে সহানুভূতির চাকরি পেয়েছে। পরনে তার পুলিশী পোশাক।

মেশিনের সুইচ অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র আওয়াজের সঙ্গে লাল-সবুজ আলো মেশিনে জ্বলে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাইটার্সের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে মনে হল। মাঝে মাঝে

ওভার-ওভার শব্দ করে শ্রীকান্ত কাগজে কিছু নোট করে নিল, তারপর ও. সি পান্ডুয়াকে ডেকে বলল—'মিঃ লাহা। হেড কোয়ার্টার থেকে আপনাকে ডাকছে আর. টি.তে কথা বলুন।'

মিঃ লাহা আর. টি.র ফোন রিসিভার কানে লাগিয়ে কথা বলতে ও শুনতে লাগলেন এবং কাগজে কিছু নোট করে, রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে এসে মেসেজটি মিঃ ইন্দ্র চৌধুরীর হাতে দিলেন।

মিঃ চৌধুরী মেসেজটি পড়লেন ;—লেখা আছে—মিঃ ভট্টাচার্য ! ডোণ্ট প্রসিড, প্লিজ রিটার্ন ব্যাক।'

তিনি দীনেন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে গিয়ে স্যালিউট্ করে, মেসেজটি তাঁর হাত দিয়ে মুখে বললেন—'স্যার ! ওঁরা আপনাকে যেতে নিষেধ করছেন।'

মেসেজটি পড়ে দীনেন ভট্টাচার্য চিৎকার করে বলতে লাগলেন —'না, এ হয় না। আমি ওখানে যাবই ! আমি লোকসভার সদস্য। দেশের যে কোন জায়গায় পরিদর্শন করতে চাইলে, অ্যাড্মিনিসট্রেশন্ আমাকে বাধা দিতে পারে না। আপনারা যদি জোর করে আমাকে আটকান, তাহলে আমি এখানেই মিটিং শুরু করে দিচ্ছি।'

এই কথা বলে তিনি ডি. ভি. সি-র নেভিগেশ্ন ক্যানেলের পাড়ে উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

পুলিশ ফোর্স তাদের রাইফেল এবং হোমগার্ডরা তাদের লাঠি হাতে জামনাগ্রাম যাবার রাস্তা অবরোধ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল।

জনতার ভিড় তো ছিলই, চারপাশের গ্রাম থেকে মিছিল করে, প্রচুর লোক জমা হোল।

মিছিলের সঙ্গে মাইকও ছিল। সেই হাত মাইকে, দীনেন ভট্টাচার্য বলতে শুরু করলেন—'বন্ধুগণ ! আমরা বুঝে নিয়েছি যে—দেশের গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। লোকসভার সদস্যকে যেতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। এই এলাকায় আমাদের কর্মী নির্ঝর ব্যানার্জী খুন হয়েছে, খুন হয়েছে আব্দুল মান্নান এবং শম্ভুসাধন কুমার। রাস্তা-ঘাটে, এমনকি বাড়ীর মধ্যেও মা-বোনেদের ইজ্জত লুট করা হচ্ছে। কোথাও না কোথাও প্রতিদিন তাদের ওপর অত্যাচারের খবর

শোনা যাচ্ছে। যাদের প্রাপ্ত ভোটে আমি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত, সেই জনসাধারণের কাছে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত ; কিন্তু প্রশাসন তাতে বাধা দিচ্ছে।'

সমবেত জনতা থেকে আওয়াজ উঠলো—'খুনীরা বাইরে কেন ? পুলিশ তুমি জবাব দাও !'

শ্রীভট্টাচার্য আবার বলতে শুরু করলেন—'যারা খুনী—তাদের নাম আমরা জেনেছি—জেনেশুনেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।'

আবার আওয়াজ—'খুনীদের গ্রেপ্তার করতে হবে- করতে হবে।' হঠাৎ, পুলিশের উপস্থিতিতেই জনতার মধ্যে ক্র্যাকার ফাটার আওয়াজ, পর পর হতে লাগলো। একদল ছেলে এসে দীনেন ভট্টাচার্যের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিল।

দীনেন ভট্টাচার্য খালি গলাতেই চিৎকার করে বললেন—'মিঃ চৌধুরী! এস. পি. আপনি—আপনার পুলিশ ফোর্স নিয়ে এ ঘটনা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছেন ? এখনই দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করুন।'

মিঃ চৌধুরী উত্তেজিতভাবে বললেন—'আমি এস. পি হুগলী ঘোষণা করছি—এই জনতা বে-আইনী। আপনারা যাঁরা এখানে জমায়েত হয়েছেন, অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করুন। নইলে—শান্তি রক্ষার জন্য গুলি চালাবার হুকুম দিতে বাধ্য হব।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও. সি.-কে হুকুম দিলেন—'চার্জ।'

ও. সি. তাঁর হোমগার্ড এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আক্রমণকারীরা পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ-হোমগার্ডরা তাদের চোখে দেখেও দেখতে পেল না। মিছিলে সামিল হওয়া জনতাকে লাঠি হাতে বেধড়ক পেটাতে শুরু করল। মার খেয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল।

এস. পি. ধমক দিয়ে দীনেন ভট্টাচার্যের ড্রাইভারকে গাড়ী ঘোরাতে বললেন। অগত্যা ভট্টাচার্য তাঁর গাড়ীতে উঠলেন। পুলিশ প্রহরায় জি. টি. রোড পর্যন্ত তাঁর গাড়ী এল। তারপর

পুলিশ জীপ চলে গেল। পুলিশ 'জুতো মেরে গরু দান' করার সৌজন্য দেখাল।

মানুষের মনোবল একবার ভেঙে গেলে, তা ফিরে পাওয়া খুবই শক্ত। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রুখে দাঁড়ানো দরকার—আর তার জন্য চাই গ্রামে গ্রামে মজবুত সংগঠন। কিন্তু তারা একত্রিত হবার সুযোগই পাচ্ছে না। কারণ এই ঘটনার পর মস্তান বাহিনী গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। হিট্‌লারের নাৎসী বাহিনীর মত ক্লাবের নাম দিয়েছে—'ঝান্সি ক্লাব'। ঝান্সি ক্লাবের আতঙ্কে ঐ এলাকার জনসাধারণ ভীত, সংত্রস্ত-তটস্থ। তাদের ভয়ে অত্যাচারিত জনসাধারণ একত্রিত হবার কথা ভাবতে পারছে না—তাদের চর চারিদিকে, গোপনে মিলিত হবার চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। নির্মম অত্যাচার চলেছে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের ওপর। 'বর্গী এল দেশের' মত ঝান্সি ক্লাবের ভয় দেখিয়ে মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াচ্ছে।

ভোটের দিন। সময় দুপুর। স্থান—বৈঁচি পার হয়ে গোকুলডাঙা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভোটপর্ব চলেছে। রাইফেল ঘাড়ে দুজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

একখানা অ্যামবাসাডার গাড়ী স্কুলের সামনে নাটমন্দিরের পাশে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে এলেন। বেঁটে, ফর্সা, মাথায় টাক, পরনে ধুতি—গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার ওপর সোনালী রঙের জহর কোট। হাতে ঘড়ি—পায়ে স্যান্ডেল।

বুথের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন - গুটি কয়েক যুবক—ঘাড়ে লম্বা লম্বা চুল, পরণে চোস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি,—গোছা গোছা ব্যালট পেপার নিচ্ছে, ছাপ দিচ্ছে এবং ব্যালট বাক্সে ঢোকাচ্ছে।

আরও দেখলেন প্রকৃত যারা ভোটার, তারা কেউ ভয়ে বুথে আসতে পারছে না। চারিপাশে মোতায়েন করা মস্তান বাহিনী

তাদের কাউকে আসতে দিচ্ছে না।

মস্তানবাহিনী—যারা আশেপাশে পাহারায় ছিল, গাড়ী দেখে সবাই সেখানে ছুটে চলে এল। প্রত্যেকের হাতে দেশী পিস্তল।

ওরা চিৎকার করে বলতে লাগলো—'গুরু এসেছে! গুরু এসেছে!'

একটি ছেলে বললো—'এবার আমরা ভোট আপনাকেই দিচ্ছি। জেনে রাখুন আপনার জয় সুনিশ্চিত।'

বাকি ছেলেরা সমস্বরে বললো—'কোন শালাকে আমরা বুথে ঢুকতে দিইনি।'

পিস্তলধারী হৃষ্টপুষ্ট একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে একজন বললো—

'মদন দা! এবার আমাদের মালের পয়সা দিতে বলো।'

মদন নামধারী যুবকটি বললো—'কেন? বিশে দেয়নি? যদি আরও খেতে চাস্—তাহলে কেল্লা ফতে করে ক্লাব ঘরে চলে যা—ওখানে টুটু আছে, তোদের সব ব্যবস্থা করা আছে।'

দাঁড়িয়ে থাকা অ্যামবাসাডার গাড়ীর চারপাশে ভীড় দেখে, ঘাড়ে লম্বা লম্বা চুল, পরনে চোস্ত পাজামা-পাঞ্জাবী, পায়ে চটি, হাতে খোলা ছোরা একটি যুবককে আসতে দেখা গেল। এরই নাম টুটু। দূর থেকেই চীৎকার করে বললে, 'কিরে মদনা? কি ব্যাপার? এ আবার কে এলো?'

'আমি তো শালা এম. এল. এ.-কে জামার কলার ধরে বুকে রিভলভার চেপে মায়ের ভোগে পাঠাচ্ছিলাম; শালা! কুমারদা এসে বাগড়া দিল, বললে, করছিস কি? ক্যানডিডেট্ মারিস না, মারলে ডাক্তারবাবুর ভোট পচে যাবে, শালার খুব ভাগ্যি ভাল, বেঁচে গেল।'

মদন বললে, 'জানেন ডাক্তারবাবু! শালার বরাত বরাবরই ভাল। একবার বৈঁচিতে শালাকে খুব বাগে পেয়েছিলাম; যতগুলো বোম ঝেড়েছি, একটাও ফাটলো না। শেষে গান্ আনিয়ে পাঁচিলে বুক দিয়ে ফায়ার করলাম—কিন্তু শালার বরাত বটে, কি কারণে হাত কেঁপে গুলি ফসকে গিয়ে গাছের ডালে লেগে পাতা

ঝরে গেল। কথায় বলে—'রাখে কেষ্ট মারে কে?' শালার এমনই তগদির—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ দারোগা লাহাবাবু জীপে করে স্পটে হাজির। শালার কি উপস্থিত বুদ্ধি! দারোগাকে বললে—'ঐ দেখুন—কারা আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে?'

আর যায় কোথায়? সঙ্গে আনা সি. আর. পি.-দের হুকুম করলেন—'ফায়ার!' আমরা পালাতে পথ পেলাম না।'

টুটু বললে, 'দারোগাকেও টের পাইয়ে দিলাম। ঐ রাতেই বদ্যিপুর থেকে দু-লরি লোক নিয়ে গিয়ে পাণ্ডুয়া থানা ঘেরাও করলাম। ও. সি.-কে বদলি করিয়ে তবে ছেড়েছি।'

একটু থেমে ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললো, 'স্যার! এখানকার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি বরঞ্চ অন্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখুন!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক বললেন—'সে তো দেখতেই পাচ্ছি ভাই! তোমরাই তো আমার ভরসা, আমি তাহলে বৈঁচির দিকটা একটু ঘুরে দেখি।'

এই বলে গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠে ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বললেন। ড্রাইভার তৈরিই ছিল। রাস্তায় নেমে ক্রমশ গাড়ীটি চোখের আড়াল হয়ে গেল।

'গাড়ী রোখো গাড়ী রোখো' চীৎকার করতে করতে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোককে ছুটে আসতে দেখা গেল, গায়ের রং ফরসা। পরনে ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবী, পায়ে চটি। ইনি হচ্ছেন কুমারবাবু।

গাড়ী তখন চলে গেছে। মদনা, টুটু, কেষ্টা, বিশে সকলে হতভম্ব হয়ে এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। কুমারবাবুর হাবভাব দেখে সকলের চোখেই একটা জিজ্ঞাসা—যেন কিছু একটা অঘটন ঘটছে।

মদন বলল, 'কুমারদা, গাড়ী থামাতে বলছিলে কেন? গুরু এসেছিল, চলে গেল।'

কুমারবাবু বললেন, 'ঠিক জানিস গুরু এসেছিল? তুই চিনিস তাকে?'

মদন বললো, 'বাঃ! না চেনার কি আছে? চেহারা দেখলেই

তো চেনা যায়।'

কুমারবাবু—'কি রকম দেখতে বল দেখি?'

মদন—'ফর্সা মতন—বেঁটে পারা।'

টুটু—'দূর শালা! ফর্সা কি রে? কালো—লম্বা।'

কেষ্ট—'আমি আসতে না আসতেই শালা টুটু বললো, এখানকার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি অন্য জায়গুলো ঘুরে দেখুন। শালা ওস্তাদি মারিয়ে—'

কুমারবাবু—'বিদেয় করে দিয়েছো।'

সকলেই ভাবতে লাগল, কি ভুলই না করেছে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে অপরাধীর মত মুখ নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কেষ্ট—'কুমারদা! মোটর সাইকেলে গেলে নিশ্চয়ই গাড়ী ধরে ফেলব। গাড়ীসমেত ভদ্রলোককে কি তোমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসব?'

কুমারবাবু—'আমার খোঁজ করেছিল?'

মদন—'না।'

কুমারবাবু—'ও কিছুতেই ডাঃ ব্যানার্জী নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোনও লোক।'

কেষ্টা বললো, 'আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া? মজা দেখাচ্ছি, বেটা জানে না—কত ধানে কত চাল!' এই বলে স্ট্যান্ড করা একটা বুলেট গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

কুমারবাবু বললেন—'কেষ্টা তোর একলা যাওয়া ঠিক হবে না। আর একজনকে সঙ্গে নে।' মদনাকে বললেন—'তোর এখন কি কাজ আছে?'

মদন—'এখনো অনেক কাজ বাকি। ছেলে, বুড়ো সব লোককে এনে তাদের ডান-বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ নিয়ে ছাপ-কল করতে হচ্ছে। তবে কুমারদা! একটু ভুল হয়ে গেছে।'

কুমারবাবু—'কি আবার ভুল হোল রে?'

মদন—'যামনার মান্নান ব্যাটা তো মরেছে। তার নামে ভোটও হয়েছে, টিপও নেওয়া হয়েছে।'

কুমারবাবু—'ওসব তোদের ভাবতে হবে না। যা করার হাই-

কমান্ড করবে। তবে দেখিস্—ওরা যেন পাল্টা শোধ না নেয়।’

মদনা,—‘ইস্ মাইরি নাকি! লাশ ফেলে দেব না?’

মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেওয়াই ছিল। কেষ্টা চীৎকার করে বললো ‘কুমারদা দেরী হয়ে যাচ্ছে।’

কুমারদা বললো, ‘মদনা! তুই কেষ্টার সঙ্গে যা। একবার খোঁজটা নে। তবে বেশী দেরি করিস না।’

মদনা গিয়ে মোটর বাইকের পেছনে চাপতেই, কেষ্টা তীব্রবেগে বৈঁচির দিকে মোটর সাইকেল চালিয়ে দিল এবং চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৈঁচি জি. টি. রোডের চৌমাথা। গাড়ী ও লোক চলাচলে জায়গাটা জমজমাট্। কাছেই জি. টি. রোডের দুপাশে দুটি পেট্রোল পাম্প। মাঝে একটা বিরাট বটগাছ তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছের তলায়, বর্ধমানের দিকে মুখ করে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। জীপের সামনের কাঁচে ইংরাজীতে ‘প্রেস’ লেখাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জীপের আরোহী বটতলায় দাঁড়িয়ে একটি ছোট প্যাডে কি সব নোট করছেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুন্দর স্বাস্থ্য, গায়ের রং কালো—মাথার চুল কোঁকড়ানো। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী।

বদ্যিপুরের দিক থেকে আসা অ্যামবাসাডর গাড়ীটি জীপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আরোহী বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোককে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন—‘ও কুঞ্জদা! তুমি এখানে?’

কুঞ্জবাবু হচ্ছেন ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক, নোট লেখা বন্ধ করে, বক্তার দিকে তাকিয়ে কুঞ্জবাবু বললেন—‘আরে শান্তিদা যে, তুমি এখানে কেন?’

কুঞ্জবাবুর স্মৃতিতে ভেসে উঠল—ইনিই সেই জেলখাটা বিপ্লবী, পাণ্ডুয়া থানা এলাকায় সাধারণ মানুষদের অতি পরিচিত এজন্য পার্টির জয়মাল্য সেখানে সুনিশ্চিত, তিনি একজন সুসাহিত্যিক এবং বক্তাও বটে। গাড়ী থেকে নেমে, শান্তি চ্যাটার্জী তাঁর

ড্রাইভারকে বললেন—'সাবাস্ জগদীশ্' যে অবস্থায় তুমি গাড়ী চালিয়ে নিয়ে এলে—তোমার জুড়ি মেলা ভার।

জগদীশের জামা, গেঞ্জি সব ঘামে ভিজে গেছে। কপাল, মুখ, হাত-পা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

কপাল-মুখের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে জগদীশ বললো—'এম. পি. সাব. উ লোক তো খতরনক্ আদমী হ্যায়, তগ্-দির জোর হ্যায়—জান বাঁচাকে হামলোক চলা আয়া। আউর থোড়া-দের ঠার্নেসে, জানকে সাথে সাথ গাড্ডি ভি উ বদমাশ্ লোক জ্বালা দেতে।'

শান্তিবাবু সস্নেহে জগদীশের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—'চল একটু চা খাওয়া যাক।'

জগদীশের মুখে ফুটে উঠলো এক উজ্জ্বল হাসি। নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে বিপদমুক্ত এলাকায় চলে এসেছে এবং সেজন্য সে মনিবের প্রশংসা পেয়েছে, ড্রাইভার হিসেবে তার সুনাম বাড়বে। তাই মনে তার আনন্দ।

জগদীশ গাড়ীটাকে জি. টি রোডের উত্তরদিকের পেট্রোল পাম্পের গায়ে কোলকাতার দিকে মুখ করিয়ে রাখল।

শান্তিবাবু ধীর পদক্ষেপে কুঞ্জবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁরও গেঞ্জি, জামা, জহরকোট ঘামে ভিজে গেছে।

কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'ভোট দেখতে বেরিয়েছেন মনে হচ্ছে? কোন্ দিকে গিয়েছিলেন? কি রকম ভোট হচ্ছে?'

শান্তিবাবু বহু পোড় খাওয়া মানুষ। বললেন—'আসুন, ঐ বটতলার চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে সব বলছি।' চীৎকার করে জগদীশকেও চা খাবার জন্য ডাকলেন।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম সুনীল পাল, চা ছাড়াও দোকানে নানারকমের মিষ্টি, সিঙাড়া, নিমকিও পাওয়া যায়। পুঁজি কম বলে, স্থানীয় নামকরা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের মত সে পাকা ঘর করে, চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ, শোকেস দিয়ে দোকান সাজাতে পারেনি। কিন্তু ভাল পজিশনে দোকান করায় তার বিক্রি যে বেশ ভালই তা তার চেহারাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। গায়ের কালো রং আবলুস কাঠের মত

চক্‌চকে, ভুঁড়ি নেমে গেছে, খালি গা, গলায় একটা সরু সোনার চেন। পরিপাটি সাজানো গোঁফ দেখে মনে হয়, গোঁফের পেছনেই তার কিছু সময় চলে যায়। তার চেহারা দেখে 'ময়রা সন্দেশ খায় না' একথা বিশ্বাস হয় না। আর্থিক সচ্ছলতার লক্ষণ তার চেহারায় ফুটে উঠেছে।

দুজন বাবুকে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে গোঁফের ফাঁকে মিষ্টি হেসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আসুন! আসুন!' চীৎকার করে বল্‌লে 'এই লালু! বেঞ্চটা ছায়ায় বার করে দে, তোয়ালে দিয়ে ভাল্‌ করে মুছে দে।'

কুঞ্জবাবু ও শান্তিবাবু বহুদিন পরে দুজনের দেখা। দুজনেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেল খেটেছেন। বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর, কুঞ্জ দাসগুপ্ত পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা হয়ে এদেশে এসে, 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় চাকরী করলেও, আনন্দবাজার তাঁর মনে আনন্দ দিতে পারেনি। শান্তিবাবু স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই থেকে গেছেন।

দোকানের ঝাঁপ খুলেই, একটা পুরানো কাঠের বেঞ্চি বার করে পেতে রাখে দোকানের সামনে বটগাছের তলায়। সাধারণ খদ্দের যারা আসে, তার ওপরই বসে. খায়।

সানমাইকা ফিট্‌ করা একটা ভাল বেঞ্চিও ঘরে আছে, তা কেবল ঐরকম ভদ্রলোকদের জন্য।

সুনীল পালের হুকুমে, লালু নামধারী এগার-বার বছরের একটি ছোট ছেলে, অনেক কষ্টে বেঞ্চটাকে বার করে গাছতলায় পাতল এবং হাঁফাতে লাগল। লালুর চেহারা রোগাটে, দেহের তুলনায় পেটটির ওজন বেশী, শরীরে ভিটামিনের অভাব স্পষ্ট। পরনে হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি। অঙ্গে ওঠার পর থেকে সেগুলো আর পরিষ্কার করা হয়েছে বলে মনে হয় না এবং সেজন্য সেগুলোর আসল রং ধরার উপায় নেই। প্রকৃতির ডাকে যাবার সময় এবং স্নান করার সময় ছাড়া সবসময় গায়েই থাকে।

যেদিন সে দোকানে কাজে ঢুকেছে, দোকানের মালিক তাকে কিনে দিয়েছে। ভদ্রলোকদের চা, সিঙ্গাড়া, মিষ্টি ইত্যাদি পরিবেশন করতে

হবে, দোকানের বয় একটু ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে যে খদ্দেররা নাক্ সিঁটকোবে, ঘেন্না করবে যার তার হাতে খেতে, অন্য দোকানে চলে যাবে। সেদিকে দোকানদারের লক্ষ্য নেই।

কোন খরিদ্দার কালো প্যান্ট-গেঞ্জির কথা বললে,—সুনীল পাল নতুন বলে দাবী করে, আর না পরিষ্কার করার জন্য লালুকেই দায়ী করে। কথায় কথায় পাঁচটা খদ্দেরকে বলে 'দৈনিক পাঁচ টাকা করে মজুরী দিচ্ছি, দুবেলা ভাত খাচ্ছে—সকাল-সন্ধ্যায় দুকাপ চা তো আছেই, এরকম কে দেয়? কাজের মধ্যে তো কাপ-ডিস্ ধোওয়া, চা-সিঙ্গাড়া পরিবেশন করা।'

লালুর মুখে হাসিটা সবসময় লেগেই আছে। ঝাড়নের বদলে একটা আধভেজা থলে ছেঁড়া দিয়ে সে বেঞ্চিটা মুছে দিয়ে বাবুদের বসতে বলে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

অনেকদিন পরে শান্তিবাবু এবং কুঞ্জবাবু একসঙ্গে বসার সুযোগ পেলেন। বসে কুঞ্জবাবু বললেন 'বেশ ভাল করে দু কাপ চা করেন তো।' পরক্ষণই ড্রাইভারদের দিকে নজর পড়ায়, ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললেন 'না-না দুটো নয় চারটে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুনীল পাল জিজ্ঞাসা করল—'চায়ের সঙ্গে আর কি দেব বাবু? হাতে গরম সিঙ্গাড়া, নিম্‌কি আছে, টাটকা সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিগেনি আছে।

কুঞ্জবাবু বললেন—'চার জায়গায় দুটো করে সিঙ্গাড়া দিন।'

ড্রাইভার দুজন সিঙ্গাড়া-চা নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসে খেতে খেতে গল্প করতে লাগলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে শান্তিবাবু বললেন—'স্বাধীনতা লাভের পর আমি তো সব ভোটই দেখেছি। কিন্তু বাহাত্তর সালের ভোট সবাইকে ছাপিয়ে গেল। ভোটদাতারা যে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, এটা আমার স্বপ্নের অগোচরে ছিল। মাসল্‌ম্যানের দাপটে, অশুভশক্তি ক্ষমতায় আসছে। গণতন্ত্রের পতাকা ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে।'

কুঞ্জবাবু সবে মাত্র গরম সিঙ্গাড়া চিবিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন, গলা থেকে সিঙ্গাড়া-চা নামেনি। শান্তিবাবুর কথা শুনেই

বিষম খেলেন, ভ্রু-চোখ কপালে উঠে গেল। কোন রকমে সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললেন—'আমার মনে হয়, এর মাসুল—আমাদের অনেককেই দিতে হবে। জানেন, পাঁচগড়া গ্রাম থেকে ফেরার পথে, বিজয়দার গাড়ীতে বোম্ মেরেছিল?'

শোনামাত্র শান্তিবাবুর হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে পড়ে গেল। বিস্মিত হয়ে, অতিশয় মনের দুঃখে বললেন—'বিজয়দার গাড়ীতে বোম্? এরা কোথায় চলেছে? স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে যে জীবনের বেশ কিছু সময় ইংরেজ কারাগারে কাটালেন; যার আদর্শ নীতির জন্য অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনও স্নেহ করতেন, সেই অজাতশত্রু বীর নেতার গাড়ীতে বোমা মারলো?'

চিন্তান্বিত মনে পকেট থেকে সিগারেট বার করতেই, কুঞ্জবাবু বললেন—'শান্তিদা ওটা রেখে দিন' একটি বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট পকেট থেকে বার করে শান্তিবাবুকে একটা দিয়ে, নিজে একটা নিলেন—বললেন—'আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছে, নূতন ব্র্যান্ড খেয়ে দেখুন।'

কুঞ্জবাবু লাইটার দিয়ে শান্তিবাবুর সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরালেন।

সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শান্তিবাবু বললেন—'আনন্দবাজার তো আর এইসব খবর বার করবে না, তোমার শুভেচ্ছা ভালবাসার প্রতীক এই সিগারেট আমাদের আন্তরিকতার পরিচয় বহন করুক।' এই কথা বলে তিনি একটু মৃদু হাসলেন।

কুঞ্জবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'শান্তি তুমি তো সবই বোঝ। ইচ্ছে থাকলেও আমার কিছু করার নেই। এই সিট্‌টার ব্যাপার কি বুঝছ?'

—'ভোটারদের ভোট দিতে দিলে, আমাদের ক্যানডিডেট্ নিশ্চয়ই ভোট পেত। জেতার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে ভূত চতুর্দশী ছাড়া আর কি হবে?'

যে জি. টি. রোড যান চলাচলে সবসময়ই ব্যস্ত থাকে, সেই রোড দিয়ে গাড়ী চলাচল খুবই কম আজ। সি. আর পি-র গাড়ী মাঝে-মাঝে টহল দিচ্ছে। দেখা গেল একদল লোক একটি বুথে ভোট

দিতে গিয়ে মস্তানদের তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটছে, উল্টে আবার সি. আর. পি. বাহিনী তাদেরই রাইফেল হাতে তাড়া করছে। ভয় পেয়ে তারা পরিত্রাহি চীৎকার করছে।

সম্ভাব্য একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে, সুনীল পাল হাঁকার দিল—'লালু ! বেঞ্চি ভেতরে তুলে শিগগির দোকানের ঝাঁপ ফেলে দে।'

অগত্যা কুঞ্জবাবু ও শান্তিবাবুকে উঠে পড়তে হোল।

কুঞ্জবাবু—'তাহলে এখন কি করবে ভাবছো ?'

'স্বচক্ষে এই সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার দেখে, চুপ করে থাকাটা তো সামাজিক অপরাধ। গিয়ে এখনই ইলেকশন্ কমিশনারকে একটা টেলিগ্রাম করবো, রিটার্নিং অফিসারের কাছেও একটা অভিযোগ পত্র দিয়ে রাখবো।'

কুঞ্জ—'আচ্ছা শান্তিদা ! আজ তাহলে আসি। বর্ধমানের দিকে যেতে হবে।' এই বলে নিজ জীপের দিকে এগিয়ে গেলেন।

শান্তিবাবুও নিজের গাড়ীতে চেপে, ড্রাইভারকে গাড়ী ছাড়তে বললেন। কোলকাতার দিকে গাড়ী যেতে আরম্ভ করলো। তাঁকে খুবই বিমর্ষ এবং চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিল। ভাবছেন, তিনি তো প্রতিটি নির্বাচনে লড়িয়ে বহু প্রার্থীকে জয়ী করিয়েছেন। কিন্তু সে লড়াই তো বন্দুক, ছোরা, বোমার লড়াই নয় ! শান্তিপূর্ণভাবে সর্বত্র ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। তাঁর সবচেয়ে বেশী চিন্তা হচ্ছে—ঐসব অল্পবয়সী মস্তানদের কার্যকলাপে। ওরা লড়ছে কিন্তু কার জন্য ? যার জন্য লড়ছে, তাকে তো দেখলাম ওরা চেনেই না। কার নির্দেশে তারা ভাড়া খাটছে ? পশ্চিমবঙ্গে ফেয়ার নির্বাচনের যে সুনাম ছিল, এতে যে নিজ প্রদেশের লোকের মুখে চুনকালি পড়বে, তা কি তারা জানে না ? কবি কালিদাসের হেঁয়ালিটা তাঁর মনে পড়ে গেল 'নেইকো তাই খাচ্ছো তাই, থাকলে কোথায় পেতে ?' মনে কিছুটা শান্তিও পেলেন এই ভেবে যে—খুব ভাগ্য ভালো—ওরা নিজের দলের ক্যানডিডেট্‌কেও চেনে না। চিনলে, পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসাই মুস্কিল হোত। গাড়ী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো।

কিছুক্ষণ পরেই কেষ্ট এবং মদনা জি. টি. রোড মোড়ে এসে মোটর সাইকেল থেকে নেমে, এদিক ওদিক তাকিয়ে অ্যামবাসাডার গাড়ীটির সন্ধান করতে লাগল। দেখতে না পেয়ে, পেট্রোল পাম্পে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে গাড়ীটি কোলকাতার দিকে অনেক-ক্ষণ আগে চলে গেছে।

ধাওয়া করা বৃথা ভেবে, তারা আবার বৈদ্যপুরের দিকে ফিরে গেল। মদনা বললে, 'শালা! পেট্রোল ছিল না, আগে চেক্ করে নিস্‌নি? বরাবরই তো রিজার্ভে চলেছে, অন্য মোটর সাইকেল যোগাড় করতে দেরী হয়ে গেল। তাই শালা পালাবার সুযোগ পেল। একেই বলে বরাত! রাখে কেষ্ট মারে কে? এখন কুমার-দাকে কি জবাব দিবি?'

কেষ্টার মুখে কোন কথা নেই। তাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

তিন

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশে যাবার মুখে, পড়ন্ত বেলায়, সূর্যের লাল আভায়, বাড়ীঘর গাছ-পালা রক্তরাগে রঞ্জিত। সন্ধ্যা সুযোগ খুঁজছে তার হেঁয়ালি প্রকাশের। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার আলো তখনও জ্বলেনি।

চুঁচুড়া ডি. এম. অফিসের দক্ষিণ মাঠ। সেখানে বহু লোকের সমাগম। উত্তরে পাকা রাস্তাতেও লোকের ভিড়। ডি. এম. বিল্ডিংয়ের মধ্যে যে রাস্তা গেছে, তারই লোহার গেটের কাছে একজন তরুণ যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তার পরনে কাপড়, গায়ে হাফশার্ট এবং পায়ে হাওয়াই চপ্পল। একদিকের কাপড় যে একটু বেশী উঠে গেছে এবং অন্যদিকেরটি মাটিতে লুটোচ্ছে, সেদিকে তার নজর নেই।

তিন চারজন যুবক ঐ তরুণটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে একটা রিক্সায় চাপিয়ে দিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একদল যুবক যুবতীর মধ্যে থেকে একজন মহিলা ছুটে এসে ঐ তরুণের গলায় একটি গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিল। মহিলাটিকে রাজনৈতিক নেত্রী বলেই মনে হোল।

আরোহী রিক্সাওয়ালাকে রিক্সা চালাতে হুকুম করলো। ততক্ষণে রিক্সার চারপাশে রাস্তায় ভীড় জমে গেছে। কেঁচোকে ডেয়ো পিঁপড়ে ছেঁকে ধরার মত অবস্থা। চাকা গড়াবার উপায় নেই। জনতার মধ্য থেকে নানা মন্তব্যের আওয়াজ ভেসে অসেছে।

যারা তরুণটিকে রিক্সায় চাপিয়েছিল, তারাই অনুরোধ এবং গুঁতোগুঁতি করে কোনরকমে যাবার রাস্তা করে দিতে রিক্সাটি বেরিয়ে গেল। তারপরই পিছনে পটকা ফাটার আওয়াজ শোনা গেল বেশ কয়েকবার।

পিছনে দিকে না তাকিয়ে আরোহীর হুকুমে রিক্সাটি মল্লিক কাসিমের হাটের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

মল্লিক কাসিমের হাটের কাছে একটা গলিতে এসে রিক্সা দাঁড়াল। আরোহী প্রাপ্য ভাড়া মিটিয়ে দিলেও রিক্সাওয়ালা খুশী নয়, সে বকশিস্ চায়।

তরুণটি জিজ্ঞাসা করল, 'বকশিস্ কিসের ?'

রিক্সাওয়ালা, 'বাবু ! আপনি ভোটে জিতলেন, আব্দার করে বক্শিস্ চাইছি, দেবেন না ?'

তরুণ—'না ভাই ! ভোটে আমি জিততে পারিনি।'

রিক্সাওয়ালা, 'কি বলছেন বাবু ? মাইজী এসে আপনার গলায় মালা পরালো, প্রণাম করলো, কত ফটকা ফাটলো, তবুও বলছেন— আপনি জেতেননি ? বাবু ! আমরা মুখ্যু, গরীব আদমি হলেও, থোড়া থোড়া সব বুঝি। কিছু দেন না বাবু ! একটা দিন একটু আনন্দ করবো।'

আরোহী ভদ্রলোকের ভোটের ফলাফল জেনে মন খুবই ভারাক্রান্ত। নির্বাচনে কারচুপির জন্যই যে ফলাফল তার বিপক্ষে গেছে, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত। অশুভ শক্তি ক্ষমতায় এলো, দেশের গরীব জনসাধারণের আগামী দিনের দুর্দশার কথা সে এতক্ষণ ধরে চিন্তা করছিল। রিক্সাওয়ালাকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না।

ঐ সময় সামনের বাড়ীর দোতলা থেকে একজন মধ্যবয়স্ক সুপুরুষ ভদ্রলোক, চেঁচিয়ে বললেন—'ও কাল্লু ! ভদ্রলোক যা ভাড়া দিচ্ছে—ঐ নাও ! ও আমাদের লোক, জিততে পারেনি, হেরে

গেছে।'

তখন রিকসাওয়ালা লজ্জায় জোড় হাত করে বল্‌লে 'বাবু! মাফ্‌ কিজিয়ে। হাম নেহি সমঝা। সোচে থে কি আপ জিত গিয়া' এই বলে সে রিকসা ঘুরিয়ে চলে গেল।

রাস্তার আলো জ্বলে উঠলো। মৃদু বাতাসে পাতা নড়ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার নাচনের সাথে সাথে, বাজনার তালে তালে জয়ী প্রার্থী দলের বিজয় উৎসবের তাণ্ডব নৃত্য ও বোমা, পটকার আওয়াজও সমানে চলেছে।

'নিশিবাস' ভবন থেকে ভদ্রলোক পরাজিত প্রার্থীকে ওপরে উঠে আসতে বলায়, তিনি ধীর পদক্ষেপে সিঁড়িতে পা রাখলেন এবং অনুরোধ এড়াতে না পেরে, রাতটা সেখানেই কাটালেন।

বাহাত্তরের এই বিজয় ছিল তাদের স্বপ্নাতীত। বিপক্ষ দলের সংগঠন দেখে তারা রীতিমত ভয়ই পেয়েছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে হাইকমাণ্ডের নির্দেশমত কাজ করে তারা আজ সফল। তাদের প্রাণে এখন জীবনের সঞ্চার, মরা গাঙে আবার জোয়ার। তাই তারা এখন যথেচ্ছাচারী। তাদের মদতে জিতেছে—সুতরাং তাদের সাতখুন মাফ। যা কিছু করুক না কেন,—শাসক শ্রেণী নীরব থাকবে।

মদনা, টুটু, বিশে, ইস্‌লাম, মহম্মদ ইব্রাহিম সকলে তাদের দল-বল নিয়ে রাস্তায় বিজয় উৎসবে বেরিয়ে পরেছে। চন্দনা দাস গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে এবং সবুজ আবীর মাথায় মাখিয়ে দিয়ে প্রাক্তন বিধায়ককে বিদায় জানাল। তারপর তাদের প্রার্থীকে নিয়ে রাত্রিতেই চল্‌ল তাণ্ডব বিজয় উৎসব।

বিজয় উৎসব গিয়ে আছড়ে পড়লো 'মহানাদ'—'বেজপাড়া' গ্রামেও। পুষা লোহারের কোলের ছেলেটাকে টেনে ছুঁড়ে দিল। দুগ্ধপোষ্য-শিশুর কি অপরাধ, জানা নেই। গজিনা দাসপুরের ভীম লোহার আর আবুসইদকে গ্রাম ছাড়া করলো। ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ প্রকাশ। বিরোধীদের স্থান নেই।

একটার পর একটা গ্রামে তাদের অত্যাচার রইল অব্যাহত। যে সব গ্রামে গরীবেরা সংগঠিত হয়ে বর্গাজমি রক্ষা করছে এবং মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করছে, বেছে বেছে সেসব গ্রামে বিজয় উৎসব

ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের ওপর আরম্ভ হোল অকথ্য অত্যাচার। তাদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হোল, ঘরবাড়ী ভেঙে দেওয়া হোল। ভয়ে বাড়ীর পুরুষরা, রাতে ঘরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে, ধান এবং গম জমিতে রাতের পর রাত কাটাতে লাগলো।

সুযোগের সদ্ব্যবহার কে না করতে চায়! এই তো সুবর্ণ সুযোগ! বালিখাদ অ্যাসোসিয়েশন সমগ্র থানার মৌজাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ব্যবসা জোরদার করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

পাণ্ডুয়াতে একটি দ্বিতল বাড়ীর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় কর্ম সমিতির সভা আহ্বান করা হয়েছে গোপনে রাত্রিবেলা। ঘরের বৈদ্যুতিক আলো দিনকেও হার মানিয়েছে।

কর্ম সমিতির সভায় উপস্থিত আছেন মিঃ এম. চৌধুরী, ডাঃ ব্যানার্জী, মহম্মদ ইব্রাহিম, শম্ভু শেঠ, মহম্মদ ইস্মাইল এবং আরও অনেকে।

সকলে নিজ নিজ চেয়ারে বসে বসেই বয় পরিবেশিত নানা-রকমের খাবার এবং চা খাবার ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথনে ব্যস্ত।

মিঃ এম. চৌধুরী সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, মৃদু টান দিয়ে সকলকে চুপ করতে বলে, বলতে আরম্ভ করলেন, 'নাউ অর নেভার। চুটিয়ে ব্যবসা করে নেবার এই হচ্ছে আপনাদের উপযুক্ত সময়। আপনাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য সঠিক উপদেশ দিতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। সে সমস্যা সমাধানের পথ আমি আজই দেখাব। আপনাদের সকল মুস্কিলের আসান হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, এর আগের সভায় আমি বলেছিলাম, বালিখাদ করার জন্য একটা জমি পেলে, সেই জমিকে আপনারা এমন ভাবে ব্যবহার করুন, যাতে চারপাশের অন্য জমির মালিকরা বাধ্য হয় —অল্প দামে জমি বিক্রী করতে।'

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলো—'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে আছে! আপনি বলতে থাকুন।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, এ্যাশট্রেতে ফেলে মিঃ চৌধুরী আবার বলতে আরম্ভ করলেন—'আমাদের অরগ্যানাইজেশন যে বন্ড তৈরী করে দিয়েছে, সেই চুক্তিনামার কাগজে আপনাদের সই না হলে, আমি

কাজ আরম্ভ করতে পারছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে সভার মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হোল। এ ওর কানে কানে বলতে লাগল, 'সে আবার কি রকম? তাহলে আমাদের কি রইল?'

ডাঃ ব্যানার্জী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'স্যার, আমাদের সভ্যেরা আপনার দেওয়া বন্ড বারবার পড়েছেন, অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন। এ*ঁরা অধিকাংশই দরিদ্র ব্যক্তি, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে, পৈতৃক জমি বিক্রী করে—'

বাকি বক্তব্য শেষ করার আগেই মদনা উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললো—'খেটে মরবে হাঁস, আর ডিম খাবে দারোগাবাবু!'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহঃ ইব্রাহিম বললো—'আপনার রিসার্চের খবর কতদূর?'

মিঃ চৌধুরী বললেন—'আপনাদের যা কিছু বলার বা জানার থাকে, বলুন বা প্রশ্ন করুন।'

কিন্তু কেউ অগ্রণী হয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো না। সকলে নীরব থেকে পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে—বলবে না বলবে না।

সকলকে নীরব দেখে মিঃ চৌধুরী নিজেই বললেন—'লাভ করার জন্যই নিশ্চয় আপনারা ব্যবসায় নেমেছেন? তা, টাকায় কত লাভ চান আপনারা? চার আনা?'

ইসলাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'ব্যাঙ্কের ইনটারেস্ট আছে, লোক-জনের মজুরী দিতে হবে। তাছাড়া চারদিকে অন্যান্য খরচ পত্র রয়েছে। আমাদের তাহলে কি থাকবে?'

মিঃ চৌধুরী, 'বেশ! তাহলে আট আনাই ধরুন।'

ইসমাইল, 'জমির মালিকদের কাঠা হিসাবে দাম দিতে হবে। রয়েলটি, পারমিশন, অফিসার ইত্যাদির—'

মিঃ চৌধুরী—'সব বুঝেছি। আপনারা চুক্তিতে সই করে দিন।'

মদনা, বিশে, টুটু উঠে দাঁড়িয়ে 'হে' মেরে উঠল।

মদনা—'আমি ওসব মার-প্যাঁচ বুঝি না, সোজা কথার মানুষ। দস্তুরমত মেহনত করে, গায়ের রক্ত ঝরিয়ে এই জমানা এনেছি।'

বিশে—'ওসব বাহানা চলবে না। আমার বখরা চাই।'

টুটু—'ওসব কথার কচ্‌কচানিতে কি হবে? আমার রুপেয়া চাই। রুপেয়া লে আও, রুপেয়া!'

মিঃ চৌধুরী—'ঠিক আছে, বিনা মূলধনে, আপনাদেরও টাকায় এক পয়সা অংশ থাকবে। তাছাড়া খাদের নানা কাজ করার জন্য কর্মী হিসাবে আপনারা মাইনেও পাবেন।'

'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌', উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মিঃ চৌধুরীর দেওয়া প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বলে মনে হল। মদনা, বিশে, টুটুর মুখে হাসি, তারা ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে গিয়ে সই করাতে লাগল।

ইব্রাহিম—'সভার কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাক। এই ফাঁকে আপনারা একটু করে কফি খেয়ে নিন।'

কে. মল্লিক এবং শম্ভু শেঠের হুকুমে দুটি ছেলে কাগজের কাপে সকলকে কফি পরিবেশন করতে লাগলো।

ইব্রাহিমের তদারকিতে, ভাল কাপ ডিশে মিঃ চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কফি পরিবেশন করা হোল।

সকলের কফি খাওয়া শেষ হলে, ইব্রাহিম বলল—'আবার আমাদের সভার কাজ শুরু হচ্ছে। আপনারা নিজ নিজ জায়গায় বসুন, মিঃ চৌধুরী এবার আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

সকলে মিঃ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে—তিনি কি বলেন তা শোনার জন্য।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা সকলে বন্ডে সই করেছেন তো?'

সভাস্থল থেকে সমস্বরে উত্তর এলো—'হ্যাঁ'।

মিঃ চৌধুরী—'আজ থেকে আমাদের কোম্পানী প্রতিটি বালির খাদে যা আয় হবে তার আট আনা অংশ গ্রহণ করবে। কোম্পানী নিযুক্ত তার নিজস্ব প্রতিনিধি প্রতিদিন নিজস্ব গাড়ি করে প্রত্যেক খাদে গিয়ে, বালি বিক্রীর হিসাব দেখবে এবং নিজ আট আনা অংশ হিসেবে যত যা পাওনা হয়, তা নিয়ে যাবে।'

সভাস্থলে আবার গুঞ্জন আরম্ভ হোল।

মৃদু হেসে, মিঃ চৌধুরী বললেন—'তার বদলে, খাদ মালিকদের কোন রয়্যালটি দিতে হবে না।'

সভায় আবার উচ্ছ্বাস।

মিঃ চৌধুরী—'কতকগুলো ফরমুলা আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইমত কাজ করবেন। যেমন—আপনারা কেউ পারমিশন পিটিশনে সই করবেন না। একজন ফকির বা যার কোন চালচুলো নেই এই ধরনের যেদো—মেদো—সেদোদের দিয়ে পারমিশন পিটিশনে সই করিয়ে দরখাস্ত জমা দেবেন।'

শম্ভু শেঠ—'তার মানে যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই! ফকিররাই তো শেষে আমীর হয়ে যাবে।'

মিঃ চৌধুরী—'সন্দেহ করে কোন ব্যাখ্যা চাইবেন না। আমি যা বলছি, সেইভাবে চলুন। চাষীদের জমির পাশে বালির খাদ খুঁড়ুন। চাষের জমিতে জল দাঁড়াবে না। নামমাত্র যা ফসল ফলবে, তাতে চাষ খরচা উঠবে না। চাষীরা বাধ্য হয়ে, খুব কম দামে আপনাদের কাছে জমি বিক্রী করে দেবে। আর একটা কথা—যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনারা ব্যবসাদার। রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের কখনও জড়িয়ে ফেলবেন না। কাউকে চটাবেন না। ক্ষমতা বুঝে সব পার্টিকেই কম-বেশী চাঁদা দিতে কার্পণ্য করবেন না। যে পার্টিই হোক না কেন—সকলকেই বলতে হবে কারবারের অবস্থা খুব খারাপ, লোকসান হচ্ছে। এই বলে টিপে টিপে চাঁদা ছাড়বেন। গ্রামের মানুষদের অঢেল প্রতিশ্রুতি দেবেন। অল্প টাকা খরচ করে, কিছু জনহিতকর কাজ করবেন। তারপর হচ্ছে হবে করে সময় কাটিয়ে সব বেচে কিনে হাওয়া দেবেন। মনে রাখবেন, এটা হোল আপনাদের স্বর্ণযুগ। তবে খুব হুঁশিয়ার! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। নিজেদের বিপদমুক্ত রেখে কাজ করবেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'এক্ষুনি আমাকে কোলকাতা ফিরে যেতে হবে।'

সকলে সমস্বরে বললো—'তা হয় না। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা আছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে খেতেই হবে।'

অগত্যা মিঃ চৌধুরী বসে পড়ে, নিজ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে

বললেন—'দশটা বেজে গেছে, অতদূর রাস্তা আমাকে যেতে হবে, বেশী দেরী করলে খুবই মুস্কিল হবে, একটু তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু আমায় দিয়ে দিন।'

মহম্মদ ইব্রাহিমের তদারকিতে প্রত্যেককে প্লেটে করে বিরিয়ানী মাংস মিষ্টি পরিবেশন করা হল।

সকলে খাচ্ছে, তবে অন্যমনস্ক হয়ে। তাদের মন চলে গেছে কারবারের হিসাব নিকাশের দিকে। অনেকে বুঝতেই পারছে না —হিসাবটা কি রকমের হল? এতে লাভ না লোকসান হবে? মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, মিঃ চৌধুরীর দেওয়া ফরমুলায় লাভের অংশটা তাদের দিকে ভারী হবে কিনা?

মিঃ চৌধুরী তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে, গ্লাসেই হাত ধুয়ে, রুমালে মুখ মুছে, উঠে দাঁড়িয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। কর্ম-কর্তারা তাঁর পিছু পিছু গেল।

সকলের সঙ্গে করমর্দন করে, তিনি গাড়ীতে চাপতেই, রাজু হেডলাইট জ্বালিয়ে স্টার্ট দিল এবং চোখের নিমেষে গাড়ী জি. টি. রোডের পথে মিলিয়ে গেল।

চার

তখন সূর্য অস্ত যাবার মুখে। একখানি জীপ গাড়ী ছুটে চলেছে শিখিরা গ্রামের দিকে।

শিখিরা গ্রামের বারোয়ারীতলায় বেশ ভিড় জমেছে। একটি মানুষকে ঘিরে ঐ ভিড়। লোকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভীতির চিহ্ন চোখেমুখে প্রকট। নির্বিকার বসে সে তার চোখের সামনেই খাঁড়া-তরবারিতে শান দেওয়া দেখছে।

এমন সময় জীপ গাড়িটি এসে বারোয়ারীতলার একপাশে দাঁড়ালো। জীপ দেখে ভীড় পাতলা হতে আরম্ভ করল। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি ভীত-সন্ত্রস্ত লোকটার মুখে পড়েছে।

জীপের আরোহী হলেন ডাঃ ব্যানার্জী। তিনি জীপ থেকে নেমে অতি দ্রুত ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কি করতে চলেছেন আপনারা? এর পরিণতি কি—তা

আপনারা জানেন? এই রকম অসামাজিক কাজ আপনাদের বন্ধ করতে হবে।'

বসে থাকা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—'এখনি উঠে আসুন আমার সঙ্গে।' লোকটি, পড়ে থাকা খাঁড়া, তলোয়ার এবং ভিড়ের দিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকিয়ে অতিক্ষীণ স্বরে বললো, 'এরা আমাকে উঠে যেতে দেবে না।'

ডাঃ ব্যানার্জী আবার হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আমি এসে গেছি। কোন ভয় নেই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। ওদের আমি ঐ রকম কাজ আর করতে দেব না।' কানু সর্দার চীৎকার করে বলল—'না, আজ পেয়েছি, ছাড়ব না। খাদ বন্ধ করতে এসেছে? বাছাধনকে আর ফিরতে দিচ্ছি না।'

ডাঃ ব্যানার্জী দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'একে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবই। ও আমার ভাই।'

মদনা বিদ্রূপ করে বলল, 'বিপদের সময়—ভাই কেন? অনেকে জামাইও বলে।' 'ভাই কেন? ভায়রা ভাইও বলতে পারত' —টুটু টিট্কারী কাটল। সমবেত জনতা দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল। একটি গ্রুপ লোকটিকে চ্যাংদোলা করে তুলে জীপের দিকে অগ্রসর হতেই, কাল্লু, মদনা, টুটুর গ্রুপ 'খবরদার' বলে চিৎকার করে বাধা দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ডাঃ ব্যানার্জী গাড়ীতে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে বললেন। উভয়-পক্ষের টানা-হেঁচড়ানির মধ্যে কোনরকমে লোকটিকে জীপের মধ্যে ঢোকানো গেল। তখনও বাইরে বেরিয়ে থাকা পা ধরে টানাটানি চলছে। ডাঃ ব্যানার্জীর হুকুমে গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। রাস্তায় শুয়ে পড়েও গাড়ী আটকানো গেল না। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, টানাটানিতে শুধু হাওয়াই চপ্পল দুটো তাদের হাতে রয়ে গেল। আর চলল আস্ফলনের ঝলক, 'আচ্ছা এক মাঘে শীত যায় না—আবার মাঘ আসবে, তখন দেখে নেব—তোর কোন্ বাবা আছে।'

কালু, মদনা, টুটু চিৎকার করে বলল—'ডাক্তার! আমাদের হাত থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেলে—তোমাকেও দেখে নেব। যে অস্ত্রে আমরা শান দিয়েছি; সে অস্ত্রে মায়ের ভোগ দেবই। তা না

হ'লে আমাদের কাউকে না কাউকে ভোগে যেতে হবে।'

কানু সর্দার বলল—'বাদল মোড়ল হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ঐ তো খবর দিয়ে ডাক্তারকে আনাল।'

মদনা চিৎকার করে বলল, 'চল্ সবাই বাদল মোড়লের বাড়ী। ওকেই আজ মায়ের ভোগে পাঠাব।'

আকাশে সরু একফালি চাঁদ, অগুণতি তারা এবং শাঁখের আওয়াজ, মস্‌জিদের আজান ধ্বনি গ্রামবাংলায় সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা করল।

বাদল মোড়লের ছেলে তাদের দুটো হেলে গরু চরিয়ে মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছে। হাতে একটা আঁকড়ো—সাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

বাদল মোড়ল তখনও মাঠ থেকে বাড়ী ফেরেনি। ছেলের মুখে খবর পেয়ে কালু, মদন, টুটু দলবল নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে মাঠের দিকে ছুটল।

বাদলকে মাঠে দেখতে পেয়ে, সকলে জল কাদা ভেঙে তার দিকে তেড়ে গেল।

বাদলের বয়স ষাটের ওপর হলে কি হবে, সে এ বয়সেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যৌবনে তার লাঠি খেলায় সুনাম ছিল। তেল মাখানো পাকা লাঠিটি তার নিত্যসংগী।

বাদল দেখল ওরা সংখ্যায় অনেক, তাকে একাই ওদের মোকাবিলা করতে হবে। সে ঘাবড়ে না গিয়ে, যৌবনের লাঠি খেলার স্বভাবসিদ্ধ হুংকার দিল।

সেই হুংকার শুনে আক্রমণকারীর দল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা বুঝে নিল সহজে ওকে কব্জা করা যাবে না।

আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য বাদল মালকোঁচা মেরে কাপড়টা পরছে, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে ছোঁড়া একটা বর্শা এসে তার দাবনায় আঘাত করল।

একটানে বর্শাটা খুলে নিয়ে আহত বাদল মোড়ল সেই ক্ষত পা নিয়েই মাজা ভাঙা সাপের মতো ফণা তুলে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পাল্টা আক্রমণের জন্য তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আক্রমণকারীরা তখন অন্ধকারে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। জলকাদায় পড়ে, কাদা মাখামাখি হয়ে সকলে ছুটে পালাল। মাঠ একদম ফাঁকা।

ডাঃ ব্যানার্জীর জীপ গাড়ী খন্যান স্টেশনে এসে দাঁড়াল, ভদ্রলোকটি নেমে রাস্তায় দাঁড়াল। ডাঃ ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করলেন— 'আপনার কোথাও লাগেনি তো?'

উত্তরে ভদ্রলোকটি বল্লেন, 'তেমন কিছু নয়, ডান হাতের কয়েকটা জায়গা দিয়ে অল্প অল্প রক্ত বের হচ্ছে।'

ডাঃ ব্যানার্জী বল্লেন, 'আপনার প্রাথমিক চিকিৎসা হয়ত আমার ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে করতে পারতাম, কিন্তু ওখানে গেলে আবার হাঙ্গামা হতে পারে।'

ভদ্রলোকের জামা কাপড় ছিল পুরনো। অত্যাচারের ধকল সহ্য করতে না পেরে শতছিন্ন হয়ে গেছে, সৌভাগ্যবশত লোডশেডিংয়ের অন্ধকার তার লজ্জা ঢেকে দিতে সাহায্য করল।

ডাঃ ব্যানার্জী তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'খবর পেয়েই, আমি দেরী না করে গাড়ি নিয়ে ওখানে পেঁছে গিয়েছিলাম, না গেলে কি হত বলুন দেখি?' ভদ্রলোক ম্লান হেসে উত্তর দিলেন —নির্ঝর ব্যানার্জীর অবস্থা হত।

ডাঃ ব্যানার্জী শুনেও শোনেননি ভাব দেখিয়ে জীপ ঘুরিয়ে তাঁর চেম্বারের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

ট্রেন আসছে ঘোষণা হল। ভদ্রলোক ছেঁড়া কাপড় কোনরকম গুছিয়ে পরে, প্লাটফর্মে এসে গাড়ী ধরে চলে গেলেন।

প্রশাসন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এলাকার চেহারা বদলে গেল। চাষীদের ওপর অত্যাচার শুরু হল। এই অত্যাচার ইংরেজ আমলের নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়, নীলকর সাহেবরা যেমন চাষীদের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত, তেমনি চাষের জমি নষ্ট করে বালিখাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একাধিক বালিখাদ খোঁড়া শুরু হোল। কার জমি কে খুঁড়ছে?

কার নামে লাইসেন্স ? সব মিলিয়ে এ যেন মগের মুল্লুক।

দ্বারবাসিনী গ্রামের শম্ভু হাঁসদা তার বাস্তুভিটার কাছে বালি-খাদ করতে আপত্তি জানাল: যারা বালির খাদ খুঁড়ছিল, তারা মুর্শিদাবাদ জেলার মজুর। নিজেদের এলাকায় কাজ না পেয়ে, পেটের দায়ে এখানে কম মজুরীতে কাজ করতে এসেছে।

শম্ভু হাঁসদা জাতিতে সাঁওতাল। বালিখাদ মালিকরা তার প্রতি-বাদে কান না দেওয়ায়, তার ডাকে আশপাশের গ্রামের সাঁওতাল এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষরা জড়ো হল।

সেদিন পুবের আকাশ লাল করে সূর্য সবেমাত্র উঠেছে। মজুরদের দল মাথায় ঝুড়ি, কোদাল এবং বেলচা নিয়ে খাদে নেমে সবেমাত্র মাটি কাটা শুরু করবে।

ঠিক সেই সময় শম্ভু হাঁসদার নেতৃত্বে দ্বারবাসিনী-সাটিথান রাস্তা দিয়ে তীরধনুক-লাঠি হাতে আদিবাসী ও ক্ষেতমজুরের দল খাদের পাড়ে জমা হতে লাগল।

শম্ভু হাঁসদা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'কাজ বন্ধ কর। আমরা গরীব ক্ষেতমজুর। ভিটেটুকুই আমাদের একমাত্র মাথাগোঁজার ঠাঁই। তোমরাও তো শ্রমিক। তোমাদেরও ভিটে আছে, বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমরা যদি গিয়ে তোমাদের ভিটে ভাঙতাম তাহলে তোমরা কি করতে ?'

বালিখাদের মজুরদের সর্দারের নাম রিয়াজউদ্দীন, খাগড়াঘাটে তার বাড়ী। সে চারপাশের গ্রামের মজুরদের চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে এখানে এনে বালিখাদের কাজে লাগিয়েছে।

থাকা-খাওয়ার আসবাব হিসেবে, আসবার সময় বাড়ী থেকে ওরা কাঁথা, ছেঁড়া চেটাই, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, থালা, গেলাস, লোটা এবং লম্ফ নিয়ে এসেছে একটা বস্তায় বেঁধে। খাদমালিক হোগলার চালাঘর করে দিয়েছে সারি সারি খাদের পাড়ে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, কোনরকমে দুটো চাল ফুটিয়ে খেয়ে, তারা সারি সারি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মাথার গোড়ায় নিজেদের সাজ সরঞ্জাম থাকে। ভোর হতে না হতেই প্রাতঃকৃত্য সেরে, পিঁয়াজ কামড়ে পান্তাভাত খেয়ে কাজে

বেরিয়ে পড়ে।

রিয়াজউদ্দীন সর্দার দেখল—তার মজুরের সংখ্যা একশোর মধ্যে, আর যারা বাধা দিতে এসেছে, তাদের সংখ্যা আড়াইশোর মতো, এবং হাতে তীর, ধনুক, লাঠি।

রিয়াজউদ্দীন চিৎকার করে তার মজুরদের কাজ বন্ধ করতে বলল। দমকলের বিকট শব্দের জন্য প্রথমে তারা কিছু শুনতে পায়নি। রিয়াজউদ্দীন আরও জোরে চীৎকার করে বলাতে এবং খাদের পাড়ে লোক জমায়েত দেখে ওরা কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল।

শম্ভু হাঁসদা পাল্টা হাঁকার দিয়ে বলল, 'তোমাদের এখানে থাকা বা কাজ করা হবে না। আজ, এখনই সবাইকে চলে যেতে হবে।'

রিয়াজউদ্দীন বহুদিন ধরে খাদমালিকদের দফাদারী কাজ করে আসছে। মালিক এবং মজুর—দুতরফেই সে দালালি খায়। সে বলল, 'সে কি করে হয়? মজুররা দুদিন মজুরি পায়নি। মালিক এখানে নেই। চলে যাও বললেই কি যাওয়া যায়? মালিকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, এরা পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নেবে, তারপর চলে যাওয়ার প্রশ্ন। তাছাড়া দেশে সেরকম কিছু কাজ নেই বলেই তো এরা এতদূরে এসেছে। কাজ বন্ধ করে দিলে এরা সপরিবারে না খেয়ে মরবে। আপনারা কি সেইটাই চান?'

শম্ভু বলল, 'বাঃ! আপনি তো বেশ মজার কথা বলছেন? আপনি আপনার মজুরদের স্বার্থটাই দেখছেন, আমাদের দিকে একবার তাকান। খাদ করার জন্য, সব চাষের জমি একে একে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরাও তো শ্রমজীবী মানুষ। জমিতে মজুর খেটেই সংসার চালাই। আমাদেরও তো পরিবার আছে। জমিতে কাজ না পেলে, আমরা খাব কি? আপনাদের তবুও দেশে মাথা গোঁজার জায়গা আছে। আর আমাদের? কিছুদিন পরেই ধ্বস নেমে, পাড়ের সমস্ত বাড়ীই খাদের গর্ভে চলে যাবে। তাই বলছি ভাই সকলকে নিয়ে আপনি দেশে ফিরে যান। গরীবে গরীবে মারামারি হয়, এমন কাজ নাই বা করলেন।'

বেগতিক দেখে, রিয়াজউদ্দীন শেষ চাল চালল। বলল, 'এদের হাতে একটাও পয়সাও নেই। বাড়ী যাবার গাড়ীভাড়া পাবে কোথায় ?'

শম্ভু একটু চিন্তান্বিত হোল। পরক্ষণেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বালি কিনতে খাদে লরী এসেছে। এখানকার ডানপিটে ছেলে ক্যাংলাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'ক্যাংলা যা এখনই সব লরী রুখে দে।' শম্ভু দেখলো, লরীতে মজুর এবং তাদের মালপত্র তুলে দিতে পারলে, গাড়ীভাড়ার কোন প্রশ্ন আসবে না এবং তাদের জিনিসপত্রগুলোও ভাঙবে না, নিরাপদ হবে। লরী ড্রাইভাররাও 'না' বলতে সাহস করবে না।

ক্যাংলার কেরামতিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই লরীগুলো সব মজুর এবং তাদের জিনিসপত্রে ভর্তি হয়ে গেল। ঝামেলা এড়াবার জন্য ড্রাইভাররাও তখনই সব গাড়ী ছেড়ে দিল। হোগলার ঘরগুলো এখন পরিত্যক্ত, ফাঁকা।

অতি উৎসাহী কে বা কারা পরিত্যক্ত হোগলা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা চারপাশের আকাশ-বাতাস উত্তপ্ত করে দিল।

এইরকম হঠকারিতা শম্ভুর ভাল লাগল না। সে চিৎকার করে সকলকে বলল, 'জানি, আপনাদের রাগ, দুঃখ বা ক্ষোভ আছে। কিন্তু ফাঁকা ঘরে আগুন লাগানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আসুন, সকলে মিলে আগুন নিভিয়ে দি, নইলে আমাদের মতো গরীব লোকদের ঘরে আগুন জ্বলবে।'

সকলের সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিভে গেল।

এই ঘটনায় শম্ভু খুবই মর্মাহত। সে ভাবছে—জনগণের জমাট ক্রোধেরই প্রকাশ এই আগুন। ক্ষেতমজুর খাটার জমির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, মাথা গোঁজার ঘরও কিছুদিনের মধ্যে খাদের তলায় চলে যাবে। গায়ের চামড়ায় নুনছাল বার হওয়ার মতো, লরী চলে চলে রাস্তার একদিকের পিচ উঠে গেছে। অন্যদিকে রাস্তার গা ঘেঁষে খাদ, রাস্তার ভাঙন শুরু হয়েছে। মানুষ সব মরিয়া। আজকের ঘটনা তারই ফলশ্রুতি।

আশেপাশের মানুষ যারা প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল, সব চলে গেল। দিনের বেলা আর কোনও ঘটনা ঘটল না।

এই ঘটনায় খাদ মালিকদের প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সামান্য শ্রমজীবী মানুষ এরা, সে আগুন নেভাবার ক্ষমতা এদের নেই।

রাত তখন বারোটা। এলাকা একেবারে নিঃঝুম। পাড়ার সকলে গভীর ঘুমে অচেতন। একটা জীপ গাড়ী এসে শম্ভু হাঁসদার বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। পুলিশের পোশাক গায়ে কতিপয় লোক জীপ থেকে নেমে শম্ভুর দরজায় টোকা মেরে, শম্ভুর নাম ধরে ডাকল।

শম্ভু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তন্দ্রাঘোরে ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করল 'কে ?'

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, 'কপাট খোল, আমরা থানা থেকে আসছি।' শম্ভু ভাবল এমন একটা ঘটনার পর খাদ মালিকরা সহজে ছাড়বে না—থানা পুলিশ হবেই। আইন মেনে চলতে হবে, পুলিশের সঙ্গে তো আর লড়াই করা চলবে না। বৌ ছেলে মেয়েদের জাগিয়ে দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে লম্ফটা ধরাল।

ঘরের দরজা খুলে দেখল—সত্যই পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। শম্ভু ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই, ওরা শম্ভুর মুখ বেঁধে ফেলে পাঁজাকোলা করে জীপে তুলে গাড়ী ছেড়ে দিল।

বাড়ীর সকলে ভীত হয়ে চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিয়ে ছুটে এসে ফাঁকা মাঠে দাঁড়াল। দেখল—জীপটা আলো নিভিয়ে বিষহরির বাগানতলায় দাঁড়াল। তারপরই শম্ভুর গলার আওয়াজ শুনল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলল।' আলো জ্বেলে জীপটা চলে গেল।

পাড়ার লোক তীর, ধনুক, লাঠি, কাটারী, কুড়ুল যে যা হাতের কাছে পেয়েছে—নিয়ে শম্ভুর বাড়ীর কাছে এসে, সব শুনেই বিষহরি তলার দিকে ছুটল। দেখা গেল ক্যাংলা একটা টর্চ হাতে বিশহরি তলার দিক থেকে ছুটে আসছে চিৎকার করতে করতে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'শম্ভুদাকে ওরা বিষহরিতলায় বলি দিয়ে পালিয়ে

গেল। পুলিশের পোশাকে খাদমালিকদের লোক ওরা। মাছ ধরার তিন ব্যাটারীর টর্চের আলোয় আমি সব দেখেছি।'

রাস্তার পশ্চিমে একটা উঁচু জায়গায় বিষহরির মন্দির। সকলে সেখানে পেঁছে ক্যাংলার টর্চের আলোয় দেখল, পশ্চিম দিকের মাঠের একটা নিচু জায়গায় শম্ভুকে বলি দেওয়া হয়েছে। ধড় একদিকে, তখনও মুণ্ডহীন দেহ বেঁকে পাঁঠা কাটার মতো ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

সে দৃশ্য দেখে শম্ভুর বৌ কাটা দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। ছেলেমেয়েরাও তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। উপস্থিত সকলেরই চোখে জল।

আশপাশের গ্রামের লোকও টর্চ, হ্যারিকেন, লাঠি হাতে নিয়ে জড় হল সেখানে।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই হতবুদ্ধি। কে একজন বলল, 'থানায় খবর দেওয়া দরকার।'

সকলে তখন বাস্তবেয় ফিরে এল। ক্যাংলার সঙ্গে কিছু লোক চলে গেল থানায় খবর দিতে।

সারা দেশে এমারজেন্সী আইন চালু হয়েছে। জমায়েত, জনসমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করেন যে নেতারা তাঁদের অধিকাংশই বিনা বিচারে মিসা আইনে জেলে।

জলের কোন বর্ণ নেই, যে রং মেশানো হয় তাই গ্রহণ করে। গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বেশী তাপ দিলে ফুটন্ত জলে রূপান্তরিত হয়। জনগণের মনের অবস্থাও এই সময় ঐ জলেব মতো। সাধারণত তারা শান্ত-শিষ্ট, লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঐ ফুটন্ত জলের মতই ফেটে পড়েছে।

নিম্নচাপের সময় কেন্দ্রস্থলে যেমন চারপাশের বাতাস কেন্দ্রীভূত হয়, তেমনি জীবন্ত শম্ভুর চেয়ে, মৃত শম্ভুর শক্তি যে কত বেশী তা প্রমাণিত হল মানুষের জমায়েত দেখে। দ্বারবাসিনী গ্রামে ঢোকা চারদিকের রাস্তায় অগণিত মানুষের ভীড়। কেবল মাথা আর মাথা।

বাজার, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল।

কোন লীডার নেই, ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নেই, তবুও মিছিলে সামিল মেয়ে-পুরুষ ছেলে-মেয়েদের মুখে শ্লোগান—'শম্ভু হাঁসদাকে মারা হল কেন? জবাব চাই—জবাব দাও। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে—করতে হবে।'

ঘটনাস্থলের চারপাশ পুলিশবাহিনী ঘিরে রেখেছে। স্বয়ং এস. পি. এবং ডি. এম ঘটনাস্থলে উপস্থিত। ডেড বডি পোস্টমর্টেমের জন্য সদরে চালান করা হল। সমগ্র এলাকা জুড়ে জারী হল একশো চুয়াল্লিশ ধারা।

জনগণের চাপে পুলিশ খাদমালিকদের বিরুদ্ধে এই প্রথম খুনী আসামী হিসেবে এফ. আই. আর. করতে বাধ্য হল। আবার খাদ-মালিকদের খুশী করতে, দ্বারবাসিনী এবং আশেপাশের গ্রামের মানুষ যারা প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বালিখাদ শ্রমিকদের ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটের মিথ্যা মামলা সাজিয়ে অভিযুক্ত করল এবং শম্ভুর ব্যাপারে যারা সক্রিয় অংশ নেবার চেষ্টা করে, তাদের ওই মোকর্দমায় জুড়ে গ্রেপ্তার করে চালান করতে লাগল।

এই সুযোগে বালিখাদের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকল—বেড়ালা, গোয়াড়া, সিমলাগড়, তিন্না, চাঁপাহাটি, খন্যান প্রভৃতি গ্রামে। দেখতে দেখতে গ্রামগুলি শ্রীহীন হয়ে গেল।

পাঁচ

রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থার অবসান হয়েছে। বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেয়েছে। যাদের নামে একাধিক ফৌজদারী মামলা ছিল, তারা মুক্তি পেয়েছে। বর্ষার নতুন জলে যেমন মাছেরা নতুন জীবন ও শক্তি পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জলাশয় থেকে মাঠ ঘাট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জরুরী অবস্থার অবসানে সেইরকম প্রকাশ্যে সভা-সমিতি-সমাবেশ ঘটতে আরম্ভ করল। বালিখাদ বিরোধী কনভেনশন্ চলছে। চাষের জমি রক্ষার আন্দোলনে, জমির মালিক, ক্ষেতমজুর এবং গ্রামের সাধারণ

মানুষ গ্রামের পরিবেশ রক্ষার জন্য জমায়েত হচ্ছেন।

বৈঁচি জি. টি. রোডের ধারে চৌমাথায় জেলার কৃষকনেতা অনন্ত দাস বক্তৃতা দিচ্ছেন।

তিনি বলছেন, 'আপনারা জানেন কিনা জানি না, পাণ্ডুয়া থানার মোট একশো আটাশ্নটি মৌজার মধ্যে, আটান্নটি মৌজায় পুরো বালিখাদ হয়ে গেছে। অন্যান্য গ্রামে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কম করে দু' হাজার বিঘে দু ফসলী চাষের জমি, ডিপ টিউবওয়েলের ইরিগেটেড্ জমি আজ বালিখাদের কবলে। ঐ সমস্ত জমিতে আর কোনদিন চাষ হবে না। আমাদের দেশে কৃষকরা জমিহারা হচ্ছে। ঋণের দায়ে জমি চলে যাচ্ছে মহাজন, জোতদার আর বালিখাদ মালিকদের হাতে। ওরা দোফসলী চাষের জমি নষ্ট করে দিচ্ছে। বিঘেতে কুড়ি জন শ্রমিকের শ্রম দিবস। পাণ্ডুয়া থানার মোট দুলাখ জনসংখ্যার মধ্যে আশি হাজার ক্ষেতমজুর। এরা কোথায় কাজ পাবে? ভিন্ন গ্রামে কাজ করতে গেলে, সেখানকার ক্ষেতমজুররা তাদের কাজ করতে দেবে না। তাই আমাদের এখন প্রথম কাজ হবে, চাষের জমি রক্ষা করা, ক্ষেতমজুরদের বারোমাস কাজ সৃষ্টি করা এবং নায্য মজুরীর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে অসেচ জমিতে সেচের ব্যবস্থা এবং কৃষিজাত পণ্যের লাভজনক দর কৃষকদের পাইয়ে দেবার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।'

সমগ্র জনতার মধ্যে বিপুল করতালি ধ্বনি। হঠাৎ জি টি রোডের ওপর গোটা কয়েক ক্র্যাকার ফাটার আওয়াজ হল। চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মানুষের মন থেকে বিগত ভয়ঙ্কর দিনগুলোর ছবি এখনও মুছে যায়নি। তাই প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল পুলিশ বাহিনী। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—ওরা এসে সভার উদ্যোক্তাদেরই শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দায়ী করল। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। সভার উদ্যোক্তারা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে জামানা পাল্টে গেছে। উল্টে, দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। জনতা, যারা আশেপাশে সরে গিয়েছিল, তারা আবার সভায় জমা হতে লাগল ভয়ে ভয়ে।

ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

পাড়ার গরীবরা গভীর রাতে চুপিচুপি মিলিত হয়ে পরামর্শ করছে, কিছুতেই আর বাহাত্তর সাল ফিরে আসতে দিচ্ছি না—দেব না, রুটি উল্টে খাব।

মস্তান বাহিনী পাড়ায় গেলে তাদের বলছে, বাবু! আমরা তো তোমাদেরই, এ পাড়া নিয়ে নিশ্চিন্ত থাক, সময় নষ্ট না করে—অন্য পাড়া দেখ।

মস্তান বাহিনী গ্রামের মোড়ে মোড়ে পাহারা বসিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেউ প্রচারে নেমেছে কিনা? কোনও জনসভা বা মাইক প্রচার না দেখে তারা নিশ্চিন্ত। তাদের ধারণা, তারাই ক্ষমতায় থাকবে।

সেদিন বেলা দশটা। ভোঁপুর গ্রামে কমলাক্ষ কুমার দুজন যুবককে তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ীতে ঢুকিয়ে নিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দুজনের একজন আইন কলেজ থেকে পাশ করে উকিল হয়েছে। তার বাবা তাকে ওকালতির জন্য কোর্টে পাঠায়। সে কালো কোট চেয়ারে রেখে কেবল খবরের কাগজ পড়ে। আবার বিকেলে বাড়ী ফেরে। অন্যজন গরীব মানুষদের জামিন, জেরা সওয়াল করে লড়ে যায়।

কমলাক্ষবাবু ভয়ে ভীত। সবাইকে বলে দিল, বাইরের কোনও লোক যেন না ঢোকে। ওদের মৃদু ভৎর্সনা করল, 'কেন তোমরা এসেছ? ফিরে যেতে পারবে না, ওরা দেখলে তোমাদের খুন হতে হবে।' তাদের আশ্বাস দিলেন 'দুর্দিনের অবসান আসন্নপ্রায়, মানুষ বুঝতে শিখেছে, তাদের ওপর বিশ্বাস রাখো।'

যুবকদ্বয় জানাল, পাড়ার লোকেদের সঙ্গে দেখা করে এখুনি তারা চলে যাবে। কমলাক্ষবাবু তাদের তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিতে বললেন। হাত মুখ ধোয়া হলে গরম রুটি আর আলুর তরকারী খেতে দিয়ে বললেন—'খাওয়া হলেই খিড়কি দরজা দিয়ে মাঠের আল ধরে চলে যাবে। কখনো পাকা রাস্তায় উঠবে না এবং ভদ্রলোকদের পাড়ায় মোটেই যাবে না।'

তাদের খাওয়া শেষ হলে কমলাক্ষবাবু খিড়কি দরজা খুলে,

ইঙ্গিতে যাত্রাপথ বুঝিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে, বৈঠকখানার ঘরের ইজিচেয়ারে সবেমাত্র বসেছেন, বাইরে থেকে দরজায় ঘা পড়তে লাগল এবং চিৎকার—'দরজা খুলে দিন।' কমলাক্ষ দরজা খুলে দিয়ে দেখল পনের-কুড়িটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কমলাক্ষের জ্ঞাতি ভাই এই দলের সর্দার, চিৎকার করে বললো—'কমলদা! কেউ এসেছে?' বলে ভিতর বাড়ীর দিকে চলে গেল। রুটি খাওয়া থালা দুটি তখনও মেঝেয় পড়ে রয়েছে, সরাবার সময় হয়নি। কমলাক্ষবাবু ইঙ্গিতে তাঁর গৃহিণীকে তা সরাতে বললেন। জ্ঞাতি ভাই ভিতর থেকে ফিরে এসে দলের লোকদের বললেন—'কৈ না; কেউ তো আসেনি।'

ওদের একজন বলল, 'কিছুক্ষণ আগে দুজন ছোকরা বাড়ীতে ঢুকল বলে মনে হোল।'

কমলাক্ষ বললেন, 'তোমরা অরুণ-বরুণকে দেখনি তো?'

অরুণ-বরুণ হল তাঁর দুই ছেলে।

তিনি বললেন, 'তোমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে বোসো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয়?'

ওরা বলল, 'না না আমরা অবিশ্বাস করছি না—আচ্ছা ঠিক আছে' বলে সবাই চলে গেল।

ধানক্ষেতে ধান পেকে উঠেছে। সোনালী রোদে, সোনালী ধান সারা মাঠে সোনা ছড়াচ্ছে। দুই যুবক আলপথে কাপড় মালকোচা মেরে খালি গায়ে চলেছে, মাঠের মজুরদের সঙ্গে মিশে গেছে।

জামনা গ্রামে শহীদ মান্নানের বাড়ি হাজির হতেই শহীদের স্ত্রী সফুরা খাতুন তাদের দেখেই মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় চুপ করে থাকার কথা বললেন এবং তখনই মাঠপথে চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। খুব নিচু গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে তাদের জানিয়ে দিলেন, 'মানুষ কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে, কৌশল অবলম্বন করে জিততে হবে। প্রকাশ্যে তেড়েফুঁড়ে লড়াই করার মতো শক্তি ও সাহস এখন নেই, তবে শক্তির প্রকাশ ঘটবেই।'

মাঠপথে রাত দশটায় তারা বৈঁচিগ্রামে এসে পেঁছাল। তারা ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন। তাদের প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয় এবং

কিছু খাবার।

শুনল ঝান্সি ক্লাবের ছেলেরা ফিস্ট্ করছে ঐ গ্রামেই। নিরাপদ নয় ভেবে, বৈঁচিগ্রাম রেলষ্টেশনে এল, রাতের ডাউন ট্রেন ধরে ফিরে যাবে বলে।

গ্রামের মধ্য থেকে রক্ অ্যান্ড রোল বাজনার আওয়াজ, গান, চিৎকার, উন্মত্ততার আওয়াজ ভেসে আসছে। তাদের মনে হল যেন আওয়াজ তুলে কারা স্টেশনের দিকেই আসছে। কাল বিলম্ব না করে তারা জি. টি. রোড ধরে বৈঁচি স্টেশনের দিকে আবার হাঁটা শুরু করলো।

তাদের অনুমান সত্য। দূর থেকে তারা দেখতে পেল বৈঁচিগ্রাম স্টেশনের প্লাটফর্ম ছেলের দলে ভর্তি। খুন করার আগে ঝান্সি ক্লাব যে আওয়াজ তোলে, অবিকল সেই আওয়াজ ভেসে এলো তাদের কানে। তারা নিশ্চিত হলো যে এরা সব ঝান্সি ক্লাবের ছেলে। অনেকগুলো টর্চলাইটের তীব্র আলো এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখল, তারা চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল, কিছুক্ষণ পরে চিৎকার এবং টর্চের আলো শোনা বা দেখা গেল না।

ওরা ভাবতেই পারছে না—কি করে ওদের অবস্থান জানল: ঝান্সি ক্লাবের ছেলেরাও ভুল খবর ভেবে ফিরে গেল, ওরা যে জি. টি. রোড ধরে বৈঁচির দিকেই আবার যাবে, তা ভাবতেই পারল না।

জুন মাসে নির্বাচনের দিনে দেখা গেল, সাধারণ মানুষ ক্ষমতাশীল দলের বুথে গিয়ে নাম বলে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী শ্লিপ নিয়ে হেসে ভোট দিতে গেল, বিরোধী বামপন্থীরা সাহসে ভর করে ভোর থেকেই শ্রমজীবী মানুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পালা বদলের পালা শুরু হল। নিজ মতো প্রকাশের স্বাধীন অধিকার, আবার মানুষ নিজের হাতে ছিনিয়ে নিল। পশ্চিমবাংলায় এ হল এক ঐতিহাসিক বিজয়। বামফ্রন্ট সরকারের জয়যাত্রার সূচনা হল।

গ্রামের গরীব মানুষ, যারা বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুরোনো ওয়ারেণ্ট জারী করার জন্য কায়েমী স্বার্থের মানুষরা শোষক শ্রেণীর যন্ত্র থানা, পুলিশ এবং আদালতকে

ব্যবহার করতে শুরু করল।

জোতদারদের খুশী করতে, গভীর রাতে পুলিশের গাড়ী হানা দিল গাঁয়ের পথে, পুরানো ওয়ারেন্ট জারী করে, আদালতের আদেশ কার্যকর করতে।

বারো বছরের ওপর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। গাঁয়ের রাস্তাগুলো এত ভয়াবহ হয়েছে যে, গরুর গাড়ীর চাকার হাঁড়ি পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, গরু টানতে পারছে না—ভাল মোষ ছাড়া গাড়ী চলে না, পুলিশের জীপও সব গ্রামে যেতে পারছে না। গাঁয়ে গরীবদের নামে একাধিক মোকদ্দমা। কত আর জামিন নেবে? তাই তারা আত্মগোপন করে রইল।

গ্রামে স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে আনার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন হল। নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এল আটাত্তরের ভয়াবহ বন্যা। ঐ বন্যার মোকাবিলায় নতুন উদ্যোগ নেওয়া হল, এক নতুন যুগের যাত্রা শুরু হল, 'গ্রাম গঠনে পঞ্চায়েত'।

বালির খাদের জল উপচে পড়েছে, রাস্তা ডুবে গেছে, একটি ছইওয়ালা গাড়ী আসছে রাস্তা দিয়ে, গন্তব্যস্থল সিমলাগড় স্টেশন, আব্রু রক্ষার জন্য ছইয়ের সামনের দিক কাপড় দিয়ে ঢাকা, ভেতরে মহিলা এবং শিশু। জলের মধ্যে রাস্তা ঠিক করতে না পেরে, খাদের মধ্যে চলে গেল।

দুপাশে বালির খাদ, মাঝে সীমানা চিহ্নিত মোটা আল রাস্তা। বাগাটি কলেজের ছাত্রী সন্ধ্যা শর্মা ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরার সময় রাস্তা ধ্বসে গিয়ে বালির খাদে তলিয়ে গেল।

নিয়ালায় কর্মরত শ্রমিক বালির ধ্বস চাপা পড়ে মারা গেল। বালিখাদ মালিক তার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দিল, মৃত শ্রমিকের নিজ দেশে।

খাদের পাড় ধ্বসার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ঘরবাড়ী ভাঙছে। খুঁটি ঠেকান দিয়ে ঘর বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করছে।

পঞ্চায়েত অফিসে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড় হয়েছে। সর্বত্র বালিখাদ মালিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে, বর্ষাকাল. তাই শ্রমিকরা বাড়ী চলে গেছে। খাদের পাম্প মেশিন এখনও রয়েছে।

বালি বিক্রীর কাউণ্টার অফিসও খোলা আছে, মালিকেরা তোলা বালি তাড়াতাড়ি বিক্রী করে পাততাড়ি গোটাবার চেষ্টা করছে।

সিমলাগড়-ভিটাসীন গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে বহু লোকের ভিড়, দমকল বাহিনী জল সেচ করে, খাদ থেকে মৃতা সন্ধ্যা শর্মার মৃতদেহ উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। দেহ বালির মধ্যে পুঁতে গিয়েছিল সাদা হয়ে যাওয়া বীভৎস মৃতদেহ যখন উদ্ধার হোল, তা দেখে জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। অবস্থা বুঝতে পেরে, খাদ মালিকরা সেল কাউন্টার বন্ধ করে অনেক আগেই পালিয়ে গেছে।

অঞ্চলপ্রধান ভট্টাচার্য মশাই পেশায় পুরোহিত। যজমানদের পুজা পাঠ ছেড়ে 'ঠাকুর' মাথায় রেখে, পঞ্চায়েতের কাজ করে চলেছেন।

খন্যানের জনসাধারণ নেয়ালা বালিখাদ চত্বরে জড় হয়েছে। অতি উৎসাহী কে বা কারা খাদের পাম্প মেশিনটি উল্টে ফেলে দেওয়ায়, ইব্রাহিম ইসমাইলকে বলল—'বন্দুকটা কি শুধু লাইসেন্স ফি দিয়ে তুলে রাখার জন্য এখানে আনা হয়েছে ?'

নেয়ালা খাদে ঘটনা ঘটে যাবার পর, মালিকপক্ষের অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

শম্ভু শেঠ বললো—'এইসব জুলুমবাজির মোকাবিলা করা হোক, তাতে যা হয় হবে।'

ইসমাইল লোড করা দোনলা বন্দুকটি ইব্রাহিমের হাতে তুলে দিল।

হীরু বাগ, তরুণ যুবক সে হোগলা দিয়ে ছাওয়া অফিস ঘরের মাথার ওপর উঠে, হোগলাগুলো টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে এবং চেঁচিয়ে বলছে—'চাষের জমি নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে, জমি নষ্ট করে বালি খাদ করতে দেব না।'

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে উপস্থিত আরো অনেকে শ্লোগান দেওয়া শুরু করল। প্রিয়নাথ, রনজান, শর্মা, হরিপদ, চিন্তা ব্যানার্জী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল এবং আওয়াজ দিচ্ছিল।

হঠাৎ ইব্রাহিমের হাতের বন্দুক গর্জে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হীরু আর্তনাদ করে ছাউনী থেকে নীচে পড়ে গেল।

চিৎকার উঠল, গুলি চলছে, গুলি চলছে।

প্রিয়নাথ দে একজন তরুণ যুবক। শিকারী বাঘের মত লাফ দিয়ে, ইব্রাহিমের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

ইব্রাহিমের একবার ইচ্ছে হল, কাছে রাখা রিভলবার বার করে প্রিয়নাথকে গুলি করে, কিন্তু প্রিয় তার ক্লাসমেট হওয়ায় সে ইচ্ছে সামলে নিয়ে বলল, 'প্রিয়! তুই এর মধ্যে কেন? এই দলে কেন এলি?'

প্রিয়নাথ—'আসবো না? তোরা দেশটাকে শেষ করে দিচ্ছিস। চাষের জমি বাড়ীঘর রাস্তা সবই যেতে বসেছে, প্রতিবাদ করতে গেলে —স্বচক্ষে দেখলাম মানুষ মারছিস।'

শম্ভু শেঠ গোলমালের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো হোগলার মধ্যে গুঁজে দিয়ে ইব্রাহিমের কাছে ফিরে এসে বললো, 'ইব্রাহিম! ঝগড়া কোরো না, সবই যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই।'

দেখতে দেখতে শুকনো হোগলা পাতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। হীরুকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য সকলে ব্যস্ত তখন।

ইব্রাহিম প্রিয়কে উদ্দেশ্য করে গলা ফাটাল, 'আমার মেসিনপত্র সব জ্বেলে ফেলে দিয়েছে, ওর দাম কয়েক লাখ টাকা। অফিস ঘরে আগুন দিয়েছে, অনেক মূল্যবান কাগজপত্র দলিল পুড়ে যাচ্ছে: এইসব কি তুমি সমর্থন কর?'

প্রিয়—'আমি কোনটাই সমর্থন করি না।'

ইব্রাহিম 'তা হলে তুমি এই দলে এলে কেন?'

প্রিয়—'সন্ধ্যা শর্মা বলে যে মেয়েটি বাগাটি কলেজে পড়তো, এবার বি. এ পরীক্ষা দিত, তোমাদের বালিখাদের ধ্বসে চাপা পড়ে মারা গেছে, তার মা-বাবাকে কি জবাব দেবে? ফিরিয়ে দিতে পারবে তার জীবন? শম্ভু সাঁওতালকে খুন করলে তোমরা, তার পরিবারবর্গ আজ অনাথ, তার কি জবাব দেবে? আমার চোখের সামনে আজ তুমি হীরুকে গুলি করলে। লোকদের বললেই তোমার

মেসিন তুলে দেবে বা তোমরা নিজেরাও তুলে নিতে পারবে; কিন্তু জীবনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারবে কি?' এই বলে প্রিয় ইব্রাহিমের হাতে বন্দুকটা ফেরৎ দিল।

ইব্রাহিম, শম্ভু শেঠ, ইসমাইল সমস্বরে চিৎকার করে বললো— 'তোমরা বলতে চাও আমরা এর জন্য দায়ী! আমরা খুন করেছি?'

জনতা চিৎকার করে বললো—'হীরুকে গুলি করেছে তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে।' একদল চিৎকার করে বললো—'খুনকা বদলা খুন চাই।'

ইব্রাহিম, শম্ভু শেঠ ও ইসমাইল বেগতিক দেখে, ছুটে গিয়ে দাঁড় করানো মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে বললো—'দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জি. টি. রোড ধরে কলকাতার দিকে রওনা হল।

প্রিয়নাথ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো—'হীরুকে বাঁচাবার জন্য এখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে, আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে।' একটা রিক্সাভ্যানে হীরুকে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হল। বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভাবার জন্য একদল লোক সক্রিয় হল। সকলের সামনে প্রিয়নাথ দাবী তুললো—'আমাদের চলে গেলে হবে না, এখানে অবস্থান করে, এস. পি, ডি এম.-কে এনে দেখাতে হবে কার রাজত্ব চলছে।'

হরি, ঘোষদা, ভোঁদা উপস্থিত সকলেই প্রিয়নাথের বক্তব্যকে সমর্থন করলো।

রমজান চিৎকার করে বললো, 'যারা হাসপাতালে যাচ্ছে, তারা যেন থানায় ফোন করে এই খবর জানিয়ে দেয়। যদি চিকিৎসার জন্য হীরুকে চুঁচুড়া নিয়ে যেতে হয়, তাও নিয়ে যেতে হবে। টাকাপয়সা যা লাগবে তার জন্য চাঁদা তোলা হোক।'

দেখতে দেখতে আরও মানুষ জড়ো হয়ে সমবেত চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলল।

ক্ষিপ্ত হয়ে একজন লোক লাঠি হাতে খাদ কর্মচারীদের মারতে আসছে জনতা তাদের ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে।

প্রিয়র চিৎকারে তারা শান্ত হল। প্রিয় বজ্রকঠোর কণ্ঠে

বললো—'আমাদের এখনই এখান থেকে মিছিল বার করে শ্লোগান দিয়ে, জনসাধারণকে সত্য ঘটনা জানিয়ে দিতে হবে। তা না হলে মালিক শ্রেণীর মিথ্যা প্রচারকেই তারা সত্য বলে ধরে নেবে। আগুন নিভে গেছে, খাদ কর্মচারীরা পাহারায় আছে, সুতরাং আমাদের আর এখানে বসে থাকার দরকার নেই, দল বেঁধে এখানে থাকলে, নিজদলের লোকজন দিয়ে নতুন কোনও গোলমাল পাকিয়ে, সবটাই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে। এস. পি, ডি. এম. এলে তাঁদের সামনেই আবার আমরা আসবো।'

রমজান মৃদু আপত্তি করল—'মিছিল চলে যাবার পরই যদি ডি. এম, এস. পি. বা থানার পুলিশ আসে? তাহলে প্রকৃত ঘটনা কে তাঁদের কাছে তুলে ধরবে?' প্রিয়নাথ বললো—'তাঁরা এলে কাউকে দেখতে না পেয়ে পঞ্চায়েতের কাছে আসবে। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করবে। অহেতুক সাধারণ মানুষকে জড়ানো ঠিক হবে না।'

বিরাট মিছিল বার হল। দাবী উঠছে 'বালিখাদ বন্ধ করতে হবে, চাষের জমি নষ্ট করা চলবে না। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে'। লোকবহুল জায়গা, চৌমাথা বা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে—আজকের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানান হল। শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল পাণ্ডুয়ার দিকে এগিয়ে চলল।

ছয়

পাণ্ডুয়া থানার বটগাছতলায়, থানা অফিসার মহাদেব ব্যানার্জী, অঞ্চলপ্রধান, বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এবং বালিখাদ অ্যাসোসিয়েশনের কতিপয় ব্যক্তিদের আলোচনা সভা বসেছে, সি. আই. এবং ডি. এস. পি সাহেব সভায় উপস্থিত থাকবেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ শর্মা—'বড়বাবু! আপনাদের বড়কর্তাদের কি টাইমের ঠিক নেই?'

মহাদেববাবু—'আমরা আর টি-তে খবর পেয়েছি, ওনারা হেড কোয়ার্টার থেকে রওনা হয়েছেন।'

মিঃ শর্মা—'আমি প্রধানের কাজ আর একটু করে আসতে

পারতাম, কে জানে এমন দেরী হবে ?'

হরিপদ ঘোষ—'আমিও রাজনৈতিক দলের নানা কাজ ছেড়ে চলে এলাম। কি হবে ? কিছুই হবে না—শুধু ধামাচাপা দেবার চেষ্টা, আসলে এটা বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। চিন্তা ব্যানার্জী—'বাহাত্তরে যা হয়েছে এটা তেমন নয়।'

হরিপদ—'আপনাদের একটাই বুলি, বাহাত্তর আর বাহাত্তর। এটা ওটাকে ছাপিয়ে গেছে।'

সামনে আলোর ফোকাস পড়লো। একটি অ্যামবাসাডার ও একটি জীপ থানার সামনে এসে দাঁড়াল। সেন্ট্রি চিৎকার করে রাইফেলটা হাত থেকে তুলে, আবার হাতের তালুতে রেখে পায়ে জুতোর টক্কর তুলে আওয়াজ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্যালিউট।

অ্যামবাসাডার থেকে নামলেন ডি. এস. পি. সাহেব। কাশ্মীরী, টকটকে গায়ের রং। পরনে পুলিশ অফিসারের পোশাক, মাথায় টুপি, কোমরে বুকে আঁটা ক্রশ বেল্ট থেকে খাপে রিভলবার ঝুলছে।

সি. আই. সাহেবের গায়ের রং কালো, আধাবয়সী, মাথায় অল্প টাক, তাঁরও পরনে পুলিশী পোশাক, ক্রশ বেল্টের খাপে রিভলবার। সকলে উঠে দাঁড়াল। মহাদেববাবু নিজের আসনে ডি. এস. পি. সাহেবকে বসালেন; সি. আই. সাহেব পাশের চেয়ারে বসলেন, তারপর যে যার আসনে বসে পড়লেন।

ডি. এস. পি—'আপনাদের এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের প্রশ্নে আজ এই আলোচনা সভা, আইনশৃঙ্খলা রাখার দায়িত্বে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি যে আইনশৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।'

হরিপদ—'এখানে সেখানে আগুন লাগানো হচ্ছে, বালিখাদ শ্রমিকদের মারপিট করা হচ্ছে, টাকাপয়সা লুট হচ্ছে, জিনিসপত্র নষ্ট করা হচ্ছে, এগুলো কি সমাজবিরোধী কাজ নয় ? তা যদি হয়, তা হলে পুলিশ আজ পর্যন্ত কি অ্যাকশন্ নিয়েছে ?'

চিন্তা ব্যানার্জী—'সরকার বহু টাকা ব্যয় করে ডিপ টিউব্‌ওয়েল করেছে। যেসব জমিতে মোটেই ফসল হত না, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হত, সেসব জমিতে এখন দুটো তিনটে ফসল হচ্ছে। মাইনর মিনারেল রুলস্ না মেনে যেখানে সেখানে বালি

খাদ হচ্ছে। রাস্তার ধার ছাড় না দিয়ে খাড়া কাটা হচ্ছে, কার নামে লাইসেন্স—কে কাটছে তার ঠিক নেই, একদাগ জমিতে পারমিশন্ নিয়ে বহুদাগ জমিতে খাদ কাটা হচ্ছে। সরকারের রয়েলটি ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছে। কৃষকদের জমিতে জল দাঁড়াচ্ছে না, চাষ করে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। কৃষক দেনার দায়ে কম টাকায় জমি বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। এইসব অত্যাচার কি সমাজকল্যাণের কর্মসূচী? বলুন হরিপদবাবু! আপনারা তো একটা সর্বভারতীয় বৃহৎ দল, আপনারা কেন ঐ বালি খাদ মালিকদের হয়ে ওকালতি করছেন?'

ডি. এস. পি.—'আপনারা নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করবেন না। আলোচনা মানে পরস্পরের কথা শুনতে হবে এবং সকলকে একটা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।'

মিঃ শর্মা—'নেয়ালায় হীরুকে গুলি করা হয়েছে, দ্বারবাসিনীতে শম্ভু হাঁসদাকে বিষহরিতলায় নির্মমভাবে বলি দেওয়া হয়েছে, চাঁপাহাটিতে বালি খাদের ধ্বসে সন্ধ্যা শর্মার মৃত্যু হয়েছে, সাধারণ মানুষ কি আমরা এইভাবে মরবো? ল অ্যান্ড অর্ডার আপনার পুলিশ দেখছে না।'

ডি. এস. পি.—'অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কারা আছেন? আপনাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তো শুনলেন, এবার আপনাদের এ ব্যাপারে কি বক্তব্য বলুন।'

শম্ভু শেঠ—'আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পরিবর্তন হয়েছে, সেক্রেটারী এবং অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী কঠিন অসুখের জন্য নার্সিং হোমে ভর্তি আছে, কাজেই এইসব অভিযোগের জবাব ওঁরা ছাড়া আমরা কেউ দিতে পারব না।' ডি. এস পি—গুলি করলেন কেন? দেশের সাধারণ মানুষকে যখন খুশী গুলি করার জন্যই কি আপনাদের বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে?' ও. সি. মহাদেববাবুর দিকে ফিরে বললেন বলুন—'বন্দুক সীজ করা হয়েছে কিনা? আসামী অ্যারেস্ট হোল না কেন?'

মহাদেববাবু—'আসামী নার্সিং হোমে ভর্তি। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এখনও আনকনসাস্, তাছাড়া হাইকোর্ট থেকে

অ্যান্টিসিপেটারি বেল নিয়ে আছে।'

ডি. এস. পি.—'তাহলে তো মুস্কিল, অ্যারেস্ট করা যাবে না, বন্দুক সীজ করেছেন ?'

মহাদেববাবু—'স্যার ! ঐ নম্বরের বন্দুকটি ঘটনার তিনমাস আগে 'দাঁ' কোম্পানীর বন্দুকের দোকানে মেরামতের জন্য জমা দেওয়া আছে, এই মর্মে আসামী একটি রসিদ জমা দিয়েছে। এই বন্দুক সীজ করে, এক্সপার্ট এগ্‌জামিন করিয়ে কি ফল হবে, সবই তো পরিষ্কার।' ডি. এস. পি—'বুলেটের খালি কভার সীজ করেছেন ?'

মহাদেব বাবু—'হঁ্যা, করেছি, ওটা ১২ বোরের গুলির কভার। ঐ গুলি আসামীর বন্দুকে ব্যবহার করা যাবে না। রাইফেলে ব্যবহৃত হয়, এখন আমি কি করবো ? অ্যাডভাইস দিন।'

ডি. এস. পি—'আপনার ওসব দেখার দরকার নেই, ল অ্যান্ড অর্ডারের যখন প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, আপনাকে আর্মস এ্যাক্ট অনুযায়ী সীজ করতেই হবে এবং এক্সপার্টের ওপিনিয়নের জন্য পাঠাতেও হবে।'

মহাদেব বাবু—'হঁ্যা স্যার আমি তাই করবো।'

হরিপদ—'স্যার ! সব একতরফা হচ্ছে, ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে, জিনিসপত্র সব লুট হয়েছে, মেসিনপত্র ভেঙে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

ডি. এস. পি.—'এইসব অভিযোগ কোথায় ?'

শম্ভু শেঠ—'স্যার, ঐ তারিখেই থানায় অভিযোগ আছে এবং চুঁচুড়া আদালত থেকে এস. ডি. জে. এম, ও. সি পাণ্ডুয়াকে কক্‌নিজেন্স নেবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও অ্যাকশন নেয়নি।' মহাদেব বাবু—'হঁ্যা স্যার ! ডায়েরীও আছে, কক্‌নিজেন্স নেবার আদেশও পেয়েছি।'

ডি. এস. পি—'পুলিশ আইন অনুসারে চলবে। বোথ সাইডস্‌ মোকর্দমা চালু করুন। আসামীকে অ্যারেস্ট করুন গোলমালের জায়গাগুলিতে পুলিশ পিকেট থাকবে।'

চিন্তামণি—'এ যে মুড়ি মিছরীর একদর হয়ে গেলো !'

ডি. এস. পি—'আমাদের তো কোর্টের অর্ডার মানতে হবে! আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি এইসব ব্যাপার নিয়ে নিজেদের হাতে আইন নেবেন না। উভয়পক্ষের যার যা অভিযোগ থানায় জানাবেন, যা করবার তা পুলিশই করবে।'

চিন্তামণি—'দ্বারবাসিনীর শম্ভু মার্ডারের কেসটার কতদূর কি হল?'

মহাদেববাবু—'আমরা ৩০২ ধারায় মোকর্দমা চালু করেছি, মোকর্দমা কোর্টে চলে গেছে, আসামীরা বেলে আছে। সেসন মোকর্দমা হবে। ইনভেস্টিগেশন চলছে।'

ডি. এস. পি—'তা হলে ঠিকই আছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, এবার তাহলে আপনারা আসুন।'

নমস্কার জানিয়ে সকলে থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডি. এস. পি, সি. আই, ও. সি এবং পুলিশ স্টাফ্ রইলেন।

ডি. এস. পি—'কোথায় যাবেন? বড় কর্তাদের হুকুম সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, কিন্তু কি করে হব? কোর্টের অর্ডার তো আমাদের মানতে হবে।'

সি. আই—'স্যার আমি এতক্ষণ ধরে সব কিছুই শুনলাম। বর্তমান সরকার আগের সরকার নয়। আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে, কোন শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলনে পুলিশ যাবে না। সত্যি কথা বলতে কি স্যার ওরা সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা রয়েলটি আত্মসাৎ করেছে, পারমিট একটাও ঠিক নয়। জে এল. আর. ও. অফিসগুলো ওদের হাতে। পুলিশ কি করবে? খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, যাদের নামে লাইসেন্স তারা সকলেই অত্যন্ত গরীব, চালচুলো কিছু নেই, একেবারে ফকির শ্রেণীর। ওদের খাড়া করে আসল ম্যাগনেটরা ফায়দা লুটছে। এ ঠেকানো যাবে না স্যার। ঐ পারমিট বা লাইসেন্স প্রাপ্ত গরীব শ্রেণীদের যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে বিক্ষোভ আরও প্রচণ্ড হবে। তার চেয়ে হেড কোয়ার্টার থেকে কালো গাড়ী আনিয়ে বালিখাদ এলাকার সব গ্রাম ঘুরিয়ে আবার ফেরৎ পাঠাব। বলবো, আসামীদের পেলাম না, সবাই স্বচক্ষে তাই দেখবে। তাতে আমাদের চাকরীও বজায় থাকবে, আদালতের অর্ডারও তামিল করা হবে এবং

আমাদের পাওনা গণ্ডা থেকে কেউ বঞ্চিত হব না।'

মহাদেববাবু—'আমি স্যার, ঘটনার দিন ওদের ধরার চেষ্টা করি। ঐদিন ওরা মোটরবাইকে সরাসরি চুঁচুড়ায় চলে গিয়ে ব্যাকডেট্ দিয়ে হুগলী নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে যায়। নিজেদের বন্দুক ব্যবহার না করে, অপরের বন্দুক ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের বন্দুক মেরামতের নামে কোম্পানীর ঘরে জমা দিয়েছে। আর্মস অ্যাক্ট বা ৩০৭-এর কেস্ তো ফাঁসিয়ে রেখে দিয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই।'

সি. আই—'স্যার! ওদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা কিছু করতেই হবে, নাহলে জনমত আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। ওদের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে, বড় বড় মামলার জায়গায়, কায়দা করে ছোট ছোট মামলা সাজাতে হবে। যাতে সাপও না মরে আবার লাঠিও না ভাঙে, তা আমাদের দেখতে হবে।'

দুজন কনস্টেবল কয়েকটা ডিশে করে সিঙ্গাড়া এবং সন্দেশ নিয়ে এলো, আর একজনের হাতে চায়ের কেটলি এবং কাপ।

ওসি-র ইঙ্গিতে সেগুলো টেবিলের ওপর রাখা হল।

মহাদেববাবু, ডি. এস. পি. এবং সি. আই. সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার একটু খেয়ে নিন স্যার! কখন বেরিয়েছেন।'

জলযোগ এবং চা পর্ব শেষ করে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

ডি. এস. পি. ও সি. আই. নিজের গাড়ীতে এবং নিজ জিপে উঠলেন। সেন্ট্রিরা যথারীতি পুলিশী স্যালিউট্ করলো। গাড়ী দুটি থানা থেকে চলে গেল।

সাত

স্থান পাণ্ডুয়া নিয়ন্ত্রিত বাজার। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সব মানুষ দল বেঁধে সেখানে উপস্থিত থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বেলা দশটা বেজে গেছে। শরৎকালীন রোদের কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে উপ-আইন কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব আসবেন। তাঁকে রিসিভ করার জন্য

জেলার অফিসাররা এবং স্থানীয় অফিসারবৃন্দ উপস্থিত।

নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে, ক্রমশ সমবেত জনসাধারণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বি. ডি. ও. সাহেব ও. সি.কে স্ট্যান্ড বাই আর. টি. ভ্যান থেকে ওঁদের একটু খোঁজ নিতে অনুরোধ করলেন।

আর. টি. অফিসার নিরঞ্জনবাবু চুঁচুড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, যে তাঁরা রওনা হয়েছেন, কিন্তু বালি ব্রীজে একটি গাড়ী অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায়, ওয়ান ওয়ে হয়েছে। তাই আসতে দেরী হচ্ছে।

খবর পেয়ে বি. ডি. ও. সাহেব মাইকে উপস্থিত সকলকে ঘটনা জানিয়ে দিলেন। হরিপদ, শম্ভু শেঠ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ডঃ এম. চৌধুরী এবং বালিখাদ ব্যবসায়ীবৃন্দ প্রায় সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে ওখানে একসঙ্গে বসে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছেন সম্ভাব্য যেসব প্রশ্নের তাঁদের সম্মুখীন হতে হবে, তার কি জবাব দেবেন।

পুরানো দিনের ধারণা ও চিন্তা নিয়ে, নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে বিরাট অকশন প্ল্যাটফর্ম তৈরী হয়েছে। কৃষক তার পাটজাত দ্রব্য এই বাজারে নিয়ে আসবে, বিক্রী করে ন্যায্য মূল্য পাবে, মহাজনী শোষণ থাকবে না। আগে ফসল ওঠার আগেই মহাজনেরা একটা সুবিধাজনক দর বেঁধে চাষীদের কাছ থেকে কিনে নিত বা উৎপন্ন ফসল বাড়ী নিয়ে যাবার আগেই মাঠে কিনে নিত। চাষীরা যাতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সরকার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় এই নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা।

এইখানেই বিধানসভার উপসমিতি সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিন্তামণি, মিস্টার শর্মা, প্রিয়নাথ, ভোঁদা, মন্টু, ঘোষদা, হরি, রিয়াজ, শান্তিদি সকলেই উপস্থিত আছেন। রোদে ঘেমে তাঁদের পোশাক ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

ভোঁদা চেঁচিয়ে বললো—'কি হোল অ্যাসেম্বলীর টিমের ? বালি ব্রীজের খবর তো অনেক আগের, মাঝপথে ভাদের ব্যাঙে খেল নাকি ?'

হরি ধমক দিয়ে বললো—'আজেবাজে কথা বলে চেঁচাচ্ছিস

কেন ? ঐখানে জটলা হচ্ছে দেখি কি হল ?’

বাজার চত্বরে শেডের মধ্যে একটা লোককে বেশ কয়েকজন ঘিরে ধরেছে, তাকে সকলে ভৎর্সনা করছে। লোকটি নীরব।

চিন্তামণি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললো—‘হীরু! তোর জন্য আজ এতো লোক জড়ো হয়েছে, লড়াই করছে, আর তুই কিনা শেষ-কালে আমাদের মুখে চুনকালি দিলি! তোকে ওরা গুলি করল—চাঁদা তুলে তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হল, আর তুই এমন নিমকহারাম যে, কোর্টে দরখাস্ত দিয়েছিস, বাঁশের খোঁচা লেগে পা কেটে গিয়েছিল!’

প্রিয়নাথের মনে সেদিনকার ছবি ফুটে উঠল। সেদিন সে বাঘের মতো লাফিয়ে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল, কাড়াকাড়িতে গুলি ছুটে গেলে তার মৃত্যুও হতে পারতো।

প্রিয়নাথ হীরুর সামনে গিয়ে বললো—‘ছিঃ, ছিঃ, বেইমান! তোর লজ্জা করছে না! গুলি খেয়ে মরে যাচ্ছিলি, আর তুই কিনা দালালি খেয়ে আমাদের সকলকে ওদের কাছে হেয় করলি!’ এই কথাগুলো রেগে এক নিঃশ্বাসে বলে হঠাৎ হীরুর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল।

চিন্তামণি চেঁচিয়ে বললো—‘প্রিয়দা! অত উত্তেজিত হলে হবে না। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করো! বুঝতে পারছো না যে এটা বালিখাদ মালিকদের কৃষক ঐক্য ভাঙার একটা সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ও গরীব লোক পয়সার লোভে দুর্মনা হয়ে ঐ কাজ করেছে। বিচারশক্তি ওর কোথায় ? বিষয়টা আমার এবং শর্মাদার ওপর ছেড়ে দাও, দেখি কিছু করতে পারি কিনা। তুমি বরং গণ-দরখাস্তগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে সই তোলার ব্যবস্থা কর।’

প্রিয়নাথ নিজ ব্যবহারে লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

চিন্তামণি হীরুকে উদ্দেশ্য করে বলল—‘হীরু! তুই এ কাজ কেন করলি ? সেই গুলি খাওয়া দিনটার কথা তোর মনে পড়ল না ? কিছু করার আগে তো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতিস! তুই ভাবিসনি আমাদের চেয়ে—ওরা তোর বেশী আপনার ? আমরা ভাবতেই পারিনি, তোর মতিগতি এভাবে পাল্টে যাবে। এখন

আমাদের অবস্থা কি হবে বল দেখি ?'

হীরুর চোখে জল এসে গেল। বোঝা গেল সে অনুতপ্ত, ধীরে ধীরে বললো—'আমি তোমাদের কথা কোনদিন অমান্য করেছি ? আমি যখন হাসপাতালে, তখন ওরা গিয়ে আমার বৌকে সংসার খরচের টাকা দিয়েছে। খোঁজখবর করেছে। তোমাদের নামে উল্টো-পাল্টা বুলেছে, হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতেই বৌ আমায় বললো—ওরা ঢের উপকার করেছে, এই কাগজে একটা সই করে দাও, আমি কি ছাই জানতুম যে ওটা এপিট ওপিট! কাগজটা কোর্টে দিয়ে দেবে ? বাবুরা! মাপ চাইছি, গরীব মানুষ, নেকাপড়া জানিনে। নাইট্ ইস্কুলে কদিন গিয়ে নাম সইটা করতে শিখেছিলুম, হাকিমকে ওরা বললো—আমি নাকি নেকাপড়া জানি, যা হবার তো হয়ে গেছে এবার আমি সব সত্যি কতা বলবো।''

চিন্তামণি—'তুই হাকিমকে কি বলেছিলি ?'

হীরু—'বললাম, আমার বৌ সই করে দিতে বললে—আমিও সই করে দিলুম। কি ছাই ওতে নেকা থাকে আমি জানি নে।'

চিন্তামণি—'হাকিম তখন কি বললো ?'

হীরু বলল, 'তুমি তো নেকাপড়া জানো।'

তা শুনে আমি বললুম, শুধু নাম সই ছাড়া কিছু জানি নে, হাকিম কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলো না, আমাকে বললো যে মিছে কতা বলছো—যাও নেবে যাও। আমিও কাটের ঘেরা জায়গা থেকে নেমে বাড়ী চলে এলুম, তারপর কি হল জানি নে।'

চিন্তামণি—'এখন আর বাবুরা টাকা দেয় ?'

হীরু—'না দেয় না। ধারে কাচেও আসে না।'

চিন্তামণি—'এখন তো বুঝতে পারছিস—কেন তোর সই নিয়েছিল ?'

হীরু—'বুঝতে পেরেছি, ঐ মামলা লস্ট করার লেগে, আর আমাদের ঘরে ঘরে ঝগড়া নাগিয়ে দেবার লেগে।'

চিন্তামণি—'তা হলে এখন কি করবি ?

হীরু—'আবার ? যা সত্যি কতা, তাই বলবো।'

ঠিক সেই সময় সাইরেন বাজিয়ে লাল আলো জ্বালিয়ে এবং

লাল ফ্ল্যাগ তুলে একটা পুলিশের জীপ এবং তার পিছনে কয়েকটি প্রাইভেট গাড়ী আসতে দেখা গেল। নিয়ন্ত্রিত বাজারের গেট দিয়ে ঢুকে ফাঁকা জায়গায় সব গাড়ী দাঁড়াল। জীপ থেকে হাইওয়ে পুলিশ নামলো। প্রাইভেট গাড়ীগুলো থেকে বিধানসভার সেক্রেটারী, অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এবং রিপোর্টাররা নামলেন, বি. ডি. ও, এস. ডি. ও এবং জে. এল. আর. ও তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। উপ-আইন সমিতির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের রিসিভ করার জন্য এগিয়ে গেলেন এস. ডি. ও (সদর) এবং নিয়ন্ত্রিত বাজারের সেক্রেটারী। বি. ডি. ও দুই দিকই সামলালেন। সকলকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আয়োজিত মণ্ডপের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। নির্দিষ্ট চেয়ারে সকলে উপবেশন করলেন।

দুপুর হয়ে গেছে। অনেকে কিছু না খেয়েই এসেছে। তাদের মধ্যে গুঞ্জন হতে লাগল। চেয়ারম্যান সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন—'আমাদের আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। বালি ব্রীজে একটা লোডেড লরী অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তার ফলে রাস্তা জ্যাম হয়ে যায়। ওয়ান ওয়ে হয়ে যাওয়ায় ওখান থেকে বেরুতে বেশ দেরী হল। তাছাড়া আমরা ঘুররাস্তায় দ্বারবাসিনী, বোরাগড়, গোয়াড়া, সিমলাগড, চাঁপাহাটী, তিন্না প্রভৃতি এলাকার সব বালিখাদগুলো দেখে তবে আসছি। বুঝতে পারছি, আপনাদের খুব কষ্ট দিলাম, অনেকের হয়ত খাওয়া দাওয়াই হয়নি, আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' এস. ডি. ও—'আপনারা ভালোই করেছেন, তবে আগে থেকে জানতে পারলে আমরা ভালো করে দেখাতে পারতাম।'

চেয়ারম্যান—'স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে আমরা ভাল করেই দেখেছি। এই এলাকার বিধানসভার সদস্য,—মোশন তুলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং তারই স্বপক্ষে একটি গণদরখাস্ত বিধান-সভার স্পীকারের কাছ থেকে পেয়েছি।'

উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে ফর্সা রং এবং কাপড় পরা হাফ-শার্ট পরা একটি যুবক দাঁড়িয়ে বললো—'আমি ঐ গণদরখাস্ত-কারিগণের একজন, অনুমতি দিলে কিছু বলতে চাই।'

চেয়ারম্যান—'দরখাস্তের লিখিত অভিযোগ ছাড়া, আর নতুন কোনও বক্তব্য আছে?' যুবক—'আমি শ্রীপরমানন্দ ঘোষ, একজন কৃষক কর্মী, চারিদিকে বালিখাদ খননের ফলে, চাষের বিপুল পরিমাণে জমি, জনবসতি, রাস্তাঘাট এবং যাবতীয় সম্পদের যে বিরাট ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন শুনে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে বিপুল করতলধ্বনি উঠল।

একটু থেমে পরমানন্দ আবার বললো—'মহামান্য বি ডি. ও সাহেবের নেতৃত্বে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, প্রথমেই আমরা নাগরিক সম্বর্ধনা জানাব তার জন্য অনুমতি চাইছি।'

চেয়ারম্যান—'একটু তাড়াতাড়ি করুন। বহু মানুষ দীর্ঘ সময় তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন, তাঁদের কথাও শুনতে হবে।' বি. ডি. ও সাহেবের নির্দেশে, কয়েকটি লালপেড়ে শাড়ী, লাল ব্লাউজ পরা বালিকা, হাতে চন্দনের বাটি এবং পুষ্পস্তবক নিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল, চেয়ারম্যানের কপালে চন্দনের টিপ এবং হাতে গোলাপ ফুলের স্তবক দিল। অনুরূপভাবে বিধানসভার অন্যান্য সদস্যদেরও দিল, শঙ্খধ্বনি করে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান হল।

চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'গণদরখাস্তের বিষয় আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। আপনাদের মধ্যে কারও কিছু বক্তব্য থাকলে একে একে বলুন। আমাদের সেক্রেটারী আছেন, রিপোর্টাররা আছেন, সব বক্তব্য নোট করা হবে। সুতরাং যা কিছু বলবেন, প্রমাণ রেখেই বলবেন।'

পরমানন্দ—'আপনারা নিশ্চয়ই দেখে এসেছেন, বালিখাদ মালিকরা কত দোফসলী, তিনফসলী চাষের জমি নষ্ট করেছে।'

জনতার মধ্য থেকে পাঞ্জাবি, পায়জামা পরা এক যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'আমি ঐ কথার প্রতিবাদ করছি।'

চেয়ারম্যান—'আপনার নাম বলুন।'

যুবক জবাব দিল—'আমার নাম মহম্মদ ইব্রাহিম।' একটু থেমে

আবার বললো—'জমি নষ্ট করা একে বলে না। আমরা বালিখাদ অ্যাসোসিয়েশন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করছি—'

সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—'আরে! বলে কি?'

ইব্রাহিম প্রতিবাদ জানিয়ে বললো—'তাহলে কি আমার বক্তব্য বলতে দেওয়া হবে না?'

চেয়ারম্যান—'প্রত্যেককেই তাঁদের বক্তব্য রাখবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কথা বলার সময় কেউ বাধা দেবেন না। প্রতিবাদ জানাবার থাকলে, তাঁর বক্তব্য শেষ হলে, করবেন, বাধা পেয়ে বারে বারে বললে রিপোর্টারদের রেকর্ড করা অসুবিধে হবে।' ইব্রাহিমকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনি কি আপনাদের সকলের হয়ে বক্তব্য রাখবেন?'

ইব্রাহিম—'আচ্ছা। আমি সকলের মতামত নিয়ে বলছি।'

পরমানন্দ আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো—'ডিপ টিউবওয়েলের জন্য সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছে। সরকারের নিজস্ব ওয়াটার কমান্ড এলাকা আছে। বালিখাদ মালিকরা সেচসেবিত জমির জলের স্পাউট তুলে ফেলে দিয়ে খাদ করেছে। সিমলাগড়, মগরা প্রভৃতি জায়গায় রেললাইনের ধারেই বালিখাদ। মগরা থেকে শুরু করে দেবীপুর পর্যন্ত তামাম জি. টি. রোডের দুধারে বালির খাদ। এতে রেললাইন ও রাস্তা দুটোরই ক্ষতি হয়েছে, হচ্ছে বা আরও ভয়াবহ হবে। সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কায়, খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য ভূগর্ভের জল কাজে লাগিয়ে, উন্নত মানের বীজ এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের মাধ্যমে ফসল বাড়াচ্ছে। গ্রামীণ কৃষি-মজুরদের বারোমাস কাজের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বালি-খাদ মালিকরা সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে; প্রচুর ক্ষেতজমি নষ্ট হওয়ায় ক্ষেতমজুররা নিয়মিত কাজ পাচ্ছে না, বাড়ীতে হাঁড়ি চাপছে না। প্রতিবাদ করতে গেলে নিরীহ ক্ষেত-মজুরদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। একজন ক্ষেতমজুর গুলি খেয়েও প্রাণে বেঁচে গেছে। গুলিবিদ্ধ সেই ক্ষেতমজুর হীরু এখানে উপস্থিত আছে। ও নিজে বলুক—ওকে গুলি করা হয়েছিল কিনা? ওদের জিজ্ঞাসা করুন—কেন ওরা দ্বারবাসিনীর শম্ভু হাঁসদাকে খুন করলো?' ইব্রাহিম, ইসমাইল ও শম্ভু শেঠ একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে

সমস্বরে বললো 'অবজেকশন্—সিরিয়াসলি অবজেকশন্। দয়া করে নোট করা হোক। পরমানন্দ—'আপনাদের আর কিছু বলার আছে ?'

ইব্রাহিম—'বলার অনেক কিছুই আছে, তবে আপাতত অবজেকশন্ দিলাম।'

চেয়ারম্যান—'আপাতত নয়, আপনাদের যা বক্তব্য প্রমাণ রেখে তা এখুনি বলুন। সময় চলে যাচ্ছে, লোক সকাল থেকে ধৈর্য ধরে বসে আছে।' ইব্রাহিম—'আমরা বালিখাদ অ্যাসোসিয়েশন দেশের কোন ক্ষতি তো করছিই না বরং বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছি, একবিঘা কৃষিজমিতে সারা বছরে মাত্র কুড়িটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়, তার জায়গায় বালিখাদে একবিঘা জমিতে আড়াইশো শ্রমদিবস সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু যে পরিমাণ বালি উঠছে, তার জন্য সরকারকে রয়্যালটি দিচ্ছি, জে. এল. আর. ও. এবং সরকারী আমিন যে পরিমাণ জমি গেপে দিচ্ছে নির্ধারিত রেটে সেই পরিমাণে টাকা সরকারের তহবিলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিকের কথা ভাবলে, সরকারের এটা একটা মস্ত আয়। তাছাড়া বালিখাদ খননকালে যে প্রচুর পরিমাণে মাটি উঠছে সেই মাটি আমরা ইঁট-ভাটায় ব্যবহার করছি। এটাও একটা শিল্প। তাতেও বহু লোকের কর্ম সংস্থান হচ্ছে। আবার পুরনো বালিখাদ ভরাট করে, চাষের জমিতে রূপান্তরিত করেছি। তাতে রিসার্চ করে উন্নতমানের বোরো ধানের চাষ করছি।' ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো—'মিথ্যে কথা।' আর একজন চিৎকার করে বল্লো—'শম্ভু হাঁসদাকে খুন করলে কেন ? হীরুকে গুলি করলে কেন জবাব দাও।'

চেয়ারম্যান সাহেব হাত নেড়ে বললেন, 'প্লীজ আপনারা চুপ করুন। ওনাকে বলতে দিন। বাধা দিচ্ছেন কেন ? কিছু বলার থাকলে পরে বলবেন।' ইব্রাহিম—'স্যার ! আর কিছু না বলাই ভালো, অহেতুক উত্তেজনা বাড়বে।' চেয়াম্যান—'না-না, আপনি যা বলতে চান, বলে শেষ করুন। তবে, অহেতুক কাউকে হিট্ করে বক্তব্য রাখবেন না।'

ইব্রাহিম—'স্যার ! ওপিনিয়ন চাইছি, আদালতের সাব জুডিস্

ম্যাটার কি এখানে আলোচনা করা যাবে?'

চেয়ারম্যান—'না-না, কোন সাব জুডিস্ ম্যাটার এখানে রেকর্ড করানো হবে না। আপনার অন্য বক্তব্য থাকলে শেষ করুন।'

ইব্রাহিম—'স্যার! আপনি যদি সময় করে আমার সঙ্গে যান, তাহলে দেখাতে পারি এই নিয়ন্ত্রিত বাজারের কাছেই আমরা ইঁটভাটা করেছি বালিখাদের মাটি ব্যবহার করে, আর বালিখাদ বুজিয়ে ধান চাষও করেছি। খুব ভালো ধান হয়েছে। আমার কিছু বলবার নেই, সব বালিখাদ তো আপনি ঘুরে দেখে এসেছেন, কাছেই এইটুকু যদি দেখেন তাহলে বুঝবো আপনি সকলের।'

চেয়ারম্যান বললেন, 'বেশ! আমি যাবো, এখান থেকে কতদূর? কতটা সময় লাগবে?'

ইব্রাহিম—'গাড়ীতে গেলে পাঁচ থেকে সাত মিনিট, হেঁটে গেলে একটু সময় লাগবে।'

চেয়ারম্যান সাহেব জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা কি দেখতে যেতে চান?'

জনতার মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল—'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বালির খাদে কেমন করে ধান চাষ হয়েছে—তা দেখতে হবে।'

ইব্রাহিম—'স্যার, আমরা খাদ কেটে শুধু বালিই তুলি না, খাদের জল দিয়ে চাষীদের জমি চাষ করতে সাহায্য করি এবং তাতে ক্ষেতমজুররা কাজের সুযোগ পায়।'

মিঃ শর্মা—'থাক থাক্, আপনাকে আর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে হবে না।' চেয়ারম্যান সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের হাতে আর সময় নেই। আপনাদের উভয় পক্ষের বক্তব্য আমি এবং অন্যান্য সদস্যেরা শুনেছি। রিপোর্টাররা তাঁদের রিপোর্ট আমাদের মিটিংয়ে জমা দেবেন। এই বিষয়ে আলোচনা করে, আমরা বিধানসভায় তা পেশ করবো। তবে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি—পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন হয় না। দয়া করে চাষের জমি নষ্ট করবেন না, আমাদের অফিসারদেরও বলেছি, তাঁরা যেন এ বিষয়ে দেখেন। বালিখাদের মধ্যে ধান চাষ হলে তো খুব ভালো ব্যবস্থা। চলুন সকলে মিলে

গিয়ে দেখে আসি।' এই বলে চেয়ারম্যান সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

যে যার গাড়ীতে চেপে বসলেন। জি. টি. রোড ধরে গাড়ীগুলো চলতে আরম্ভ করলো। যাদের গাড়ী নেই তারা হাঁটতে শুরু করলো। কিছু দূর গিয়েই গাড়ীগুলো থেমে গেল।

সবাই গাড়ী থেকে নামলেন। পথপ্রদর্শক হয়ে ইব্রাহিম আগে আগে চলেছে। সকলে তার পিছনে। জনতাও হেঁটে পৌঁছে গেছে। ইব্রাহিম গিয়ে দাঁড়াল একটা বিরাট বালিখাদের সামনে। বালি সব উঠে গেছে। খাদের মধ্যে সবুজ ধান বেশ ঝাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জনসাধারণ তা দেখে হতভম্ব। এ যেন পি. সি. সরকারের ম্যাজিক। চিন্তামণি চিৎকার করে বলল—'শর্মাজী কি দ্যাখ্ছো?'

শর্মা—'এ যে ভানুমতীর খেল ভায়া। বুদ্ধির ঢেঁকি। ওর পেটে এত বুদ্ধি।'

রিপোর্টাররা ক্যামেরা বার করে, খাদের মধ্যে ধান গাছের ফটো তুলে নিলেন।

চেয়ারম্যান ইব্রাহিমকে প্রশ্ন করলেন—'প্রচুর বৃষ্টি হলে জল নিকাশের তো রাস্তা নেই, তাতে ধান নষ্ট হবে না?'

ইব্রাহিম—'না, স্যার হবে না। দু কোণে দুটো দমকল ফিট্ করা আছে, অতিরিক্ত জল আমরা দমকল চালু করে বার করে দেব। লক্ষ্য করুন, সাধারণত জমিতে যে রকম ধান গাছ হয়, তার চেয়েও ভালো ঝাড় হয়েছে, ধানও হবে প্রচুর।' চিন্তামণি—'স্যার, আসল সোনার চেয়ে নকল সোনার রোশনাই বেশী হয়। জহুরীকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দেয়।'

যারা ভণ্ড, ধরিবাজ, তারা সাময়িকভাবে জনগণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, নির্বাক করে দেয়। উপযুক্ত জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। ইব্রাহিমের এই অভিনব কৌশল সকলকে চম্কে দিল: অতি বড় শত্রুরাও তার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না।

চেয়ারম্যান সাহেব শেষে হেসে বললেন—'ইব্রাহিম সাহেব! কত

ধান হয়, আপনার রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেবেন।'

ইব্রাহিম—'স্যার আমাদের একটা মেমোর‍্যানডাম্ আপনাকে দিতে চাই, যদি দয়া করে—'

চেয়ারম্যান—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সেক্রেটারী সাহেব! আপনি ওটা নিয়ে নিন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন আসি।' এই বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে যে যাঁর গাড়ীতে উঠলেন। সব গাড়ী চলে গেল। জনতাও জি. টি. রোড ধরে হাঁটা শুরু করলো। পুলিশের গাড়ীগুলোও চলে গেছে। সবার মনে আশঙ্কা, ওরা আবার না গণ্ডগোল পাকায়, কিন্তু কিছু হল না। এলাকা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু দাঁড়িয়ে রইল ইব্রাহিম, ইসলাম, তারাপদ পাল, এবং শম্ভু শেঠ। ডঃ এম. চৌধুরী ওঁদের সঙ্গেই গাড়ীতে চলে গেছেন।

ইব্রাহিম ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল, অন্যান্যরাও হাসি চেপে রাখতে না পেরে দমফাটা হাসি হাসতে লাগল।

ইসলাম—'গুরু তোমার ভোজবাজি শালাদের একেবারে 'থ' করে দিয়েছে।'

ইব্রাহিম—'এ ব্রেন আমার নয় রে! ডঃ চৌধুরীর, মনে আছে ডঃ চৌধুরী বলেছিলেন, যার ডায়নামিক ফোর্স আছে, সে কখনো মরবে না, এই বুদ্ধি তাঁর।'

শম্ভু—'ওতে ধান হবে? কত খরচ পড়বে?'

ইব্রাহিম বলল, 'দূর বোকা! এখানে লাভ লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই। এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার।'

তারাপদ—'যাই বল বাপু! আমার দু বিঘের চেয়ে ধান জোর লেগেছে, প্রচুর ধান হবে।'

ইস্লাম—'খরচ কত হয়েছে জান?'

তারাপদ—'কত আবার!'

ইস্লাম—'কত আবার নয়, একলাখ টাকা।'

তারাপদ, শম্ভু মাথায় হাত দিয়ে বললো, 'করেছ কি?'

ইব্রাহিম—'আমি ওদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। এটা একটা

স্টান্ট, সংবাদপত্রে এই খবর ছাপা হবে, গভর্নমেন্টের মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরবে। এই সময় ডাঃ ব্যানার্জী কেটে পড়লেন, যাক গে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।'

ইস্‌লাম—'চল, আমরা গদি ঘরে যাই, একটু চা-টা আনার ব্যবস্থা করি, শুক্‌নো আর কতক্ষণ চলবে।'

সকলে গদি ঘরের দিকে রওনা হল।

আট

হুগলী জেলার সব রেলস্টেশনে বড় বড় রাস্তার দু ধারের দেওয়ালে, বাড়ীর গায়ে দেওয়াল লিখন—"পাণ্ডুয়া চলো" ২৬তম রাজ্য কৃষক সম্মেলনে দলে দলে যোগদান করে সম্মেলন সফল করুন। স্থান পাণ্ডুয়া নিয়ন্ত্রিত বাজার।' গোটা পাণ্ডুয়া থানা এলাকা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য গ্রামে শহরেও সাড়া জেগেছে। দেওয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। তাতে লেখা হয়েছে 'প্রকৃত ভূমিসংস্কার করতে হবে, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সেচের ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।'

আবার কোথাও লেখা—'নির্ঝর ব্যানার্জী, তোমায় জানাই লাল সেলাম, আব্দুল মান্নান—তোমাকে আমরা ভুলিনি। বীরের এই রক্তস্রোত, মাতার এই অশ্রুধারা, একি ধূলোয় হবে হারা?'

এই প্রশ্ন, এই দ্বন্দ্ব আজ সবার মনে, তাই এই রাজ্য সম্মেলনকে সফল করে তুলতে তারা আগ্রহী।

খরার বছর, জমিতে চাষ হয়নি, ক্ষেতমজুররা কাজ পায়নি। নিজেরা আধপেটা খেয়েও, শুধু চাষের জমি রক্ষার জন্য একজোট হয়ে তারা সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ। গ্রামে এমন কোন বাড়ী নেই, যারা কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য করেনি।

বলাগড়, পোলবা থানার গ্রামের মানুষরাও এই জোয়ারে চলে এসে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে লেগে গেছে।

শহর, আধা শহর এবং অধিকাংশ গ্রামেই এখন ইলেকট্রিক লাইন চলে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় নতুন করে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি বাক্সের মধ্যে ছোট বাল্ব ফিট

করায়—'বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' প্রভৃতি লেখাগুলো স্পষ্ট ফুটে উঠে রাস্তার শোভা বৃদ্ধি করেছে।

দুদিন ধরে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়ে গেছে। আজ তার প্রকাশ্য সমাবেশ। এই সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য একটার পর একটা মিছিল আসছে, বেলা বারোটা থেকে মিছিল শুরু হয়েছে। সিমলাগড় কালিতলা থেকে তিন্নার মোড় পর্যন্ত জি. টি. রোডে সব যানবাহন দাঁড়িয়ে গেছে, ওদিকে খন্যানের পর জি. টি. রোড দিয়ে কোন যানবাহন আসতে পারছে না। আবার এদিকে মহানাদ, ওদিকে মণ্ডলাই গ্রাম এলাকা পর্যন্ত হেঁটে আসা মানুষের ভিড়ে যানবাহন এগোতে পারছে না। এই যে চারপাশের বিপুল জনস্রোত, সবার লক্ষ্য ঐ পাণ্ডুয়া নিয়ন্ত্রিত বাজার যেখানে আজ প্রকাশ্য অধিবেশন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ভাষণ দেবেন। জ্যোতিবাবু আগেও এখানে এসেছেন, কিন্তু তখন মানুষ এইভাবে আসেনি। কোনও বিশেষ নেতা তাদের আকর্ষণ করতে পারেনি। ভূমি রক্ষার যে সংগ্রাম তারা করছে, তাতে তারা কতটা একজোট হতে পেরেছে—এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। মা ধরিত্রীর রক্ষায় তারা আজ কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। এ এলাকার বালিখাদ মালিকদের তারা বুঝিয়ে দেবে, তারা আজ সঙ্ঘবদ্ধ। প্রবেশপথে শহীদদের নামে তোরণ তৈরি হয়েছে। সমস্ত রাস্তার ধারে সারি সারি লাল পতাকা। চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য জায়গা সঙ্কুলান না হলে, যাতে আগ্রহী জনস্রোত অন্তত বক্তব্য শুনতে পায়। নিয়ন্ত্রিত বাজার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে উত্তরে একটি উঁচু মাটির ঢিবি। সেটাই মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মঞ্চে ওঠার জন্য মাটি কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাইরের দুপাশের জি. টি. রোডে যতদূর নজর যায় শুধু—কালো কালো মাথা। পিছনে ডি. ভি. সি. খালের পাড়ে অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে। চারদিকের পাঁচিলের ওপরেও লোক, গোটা পাণ্ডুয়া এলাকাটাই জনসভার ময়দানে পরিণত। অনেকে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব দেখে মাইকের নিচে রাস্তার ওপরই বসে পড়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী আর. টি-তে মগরা এবং মেমারী থানায় জানিয়ে দিল, পাণ্ডুয়ার দিকে যেন কোন যানবাহনকে আসতে না দেওয়া হয়।

মাইকে নিরাপত্তাবাহিনী এবং ভলেণ্টিয়ারদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হল, পূর্বদিকের গেট দিয়ে যেন কাউকে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ঐ গেট দিয়ে চীফ্ মিনিস্টারের গাড়ী ঢুকবে, জনসাধারণকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানান হল।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি স্টাফ, পূর্বদিকের গেট ফাঁকা করিয়ে লাইন দিয়ে আর্মড ফোর্স সাজিয়ে দিল। এস. পি. এবং ডি. এম. আগেই এসে গেছেন। তাঁরা নিজেরাই সবরকমের নিরাপত্তা দেখে নিচ্ছেন।

জনস্রোতের শ্লোগান মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হচ্ছে—'শহীদ তোমায় ভুলিনি—ভুলবো না—ভুলছি না। তোমার রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। সারা ভারত কৃষকসভা জিন্দাবাদ।'

হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের কনভয় গাড়ী পূর্বদিকের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। পেছনে আরও দু-তিনটি অ্যামবাসাডার গাড়ী একই গতিতে এসে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল।

রোদ পড়ে এলেও তেজ কম নয়, খরা বলেই যেন সূর্য্যি ঠাকুর আরো নির্দয়। মঞ্চ থেকে ঘোষিত হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ভেতরের মাঠ এবং বাইরের জনস্রোত থেকে আওয়াজ উঠল—'কম্‌রেড জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ। বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ।' জ্যোতি বসুকে দেখবার জন্যে জনসমুদ্রের মধ্যে ওঠা বসা শুরু হোল, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের ঢেউ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গাড়ীর ভেতর থেকে নামলেন। পরনে বাঙালীর জাতীয় পোশাক—ধুতি, পাঞ্জাবী। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁকে গালিচা পাতা মাটির সিঁড়ির ওপর দিয়ে মঞ্চে নিয়ে এলো। মাইকে তখন গণসঙ্গীত চলছে—'চাষী দে তোর লাল সেলাম, তোর লাল নিশান রে!' গণসঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহাশয় সভার সভাপতির নাম ঘোষণা করলেন।

সভামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, রাজ্য কৃষকসভার কর্মকর্তা শান্তিময় ঘোষ, বিজয় মোদক এবং পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় একত্রে পাশাপাশি বসায়, জনতা তাদের প্রিয় নেতাদের দেখে উল্লসিত।

কলকাতার বিগ্রেড গ্রাউন্ড ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে যে এরকম জন-সমাগম হয়, তা কারও ধারণায় ছিল না।

সভাপতি হিসাবে ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী বক্তৃতামঞ্চে উঠে বললেন—'আমি রাজ্য কৃষক সভার পক্ষ থেকে উদ্যোক্তা এবং এই বিশাল সমাবেশের প্রত্যেকটি মানুষকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন আর একবার জানাচ্ছি এই গ্রাম্য মাঠকে বিগ্রেডের মাঠের মতো জনসমাবেশে ভরিয়ে তুলেছেন বলে। আমরা দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন বিধানসভায় পাশ করলেও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদন এখনও পাইনি, ফেরতও পাঠায়নি। তাই, আমাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে।'

রাজ্য কমিটির নব নির্বাচিত সম্পাদক, শ্রীশান্তিময় ঘোষ বক্তব্য রাখলেন—'রাজ্য সম্মেলনে, প্রতিনিধিবৃন্দেরা ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, ফসলের দর, সেচ ও নিকাশী, বন্যানিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন, পান্ডুয়া এবং থানার অন্যান্য গ্রামের জনগণ ভূমি রক্ষার জন্য বালিখাদ মালিকদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছেন, রাজ্য সম্মেলন তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাই কৃষকসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুই বা তিন ফসলী চাষের জমি তারা রক্ষা করবে, চাষের জমি নষ্ট করে বালিখাদ খনন করতে দেবে না। নদী থেকে বালি তুলে মজা নদীর সংস্কার করতে হবে। আইন দিয়ে বালিখাদ বন্ধ করা যাবে না। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনই এর প্রতিরোধ করতে পারে।'

সভাপতি ঘোষণা করলেন—'পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীজ্যোতি বসু এবার তাঁর বক্তব্য আপনাদের কাছে পেশ করবেন।'

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ধীর পদক্ষেপে বক্তৃতা মঞ্চে মাইকের সামনে দাঁড়াতেই, জনসমুদ্র থেকে গর্জন উঠল—'কমরেড জ্যোতি বসু তোমায় জানাই লাল সেলাম', বক্তা হাত তুলে সকলকে থামতে অনুরোধ

করতেই আওয়াজ থেমে গেল। তিনি সমবেত জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সারা পশ্চিম বাংলার গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর। জমিদার, জোতদার এবং মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। এই হুগলী জেলায় ডুবিরভেরি গ্রামে আমাদের তিনজন মহিলাকর্মী তেভাগা আন্দোলনের শহীদ হয়েছেন, বড়া কমলাপুরে শহীদ হয়েছেন ফসল রক্ষার সংগ্রামে। আপনাদের থানায় কমরেড নির্ঝর ব্যানার্জী, আব্দুল মান্নান শহীদ হয়েছেন। বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত দেশে কোন গণতন্ত্র ছিল না। আধাফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল। আপনারা গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। আপনাদের কাছে আবেদন, আপনারা আর কোন মায়ের চোখের জল ফেলতে দেবেন না। আর কোন মা-বোন যেন তাঁদের সিঁথির সিঁদুর না মোছে। কোন প্রতিহিংসা ওদের ওপর নেবেন না। কৃষকসভা ভূমি সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করছে। আমরাও দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার বিল বিধানসভায় পাশ করেছি। দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছি কিন্তু ফেলে রেখে দিয়েছে। রাজ্যের বঞ্চনার বিরুদ্ধে, আমাদের নায্য পাওনা টাকা ও খাদ্যের দাবীতে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে তুলব। আমরা গড়ে তুলব হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল ও বক্রেশ্বরে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পশ্চিমবাংলাকে তার দাবী আদায় করে নিতে হবে। এই দাবী আদায় করতে হলে, গ্রামগুলিতে কৃষক ঐক্য গড়ে তুলে এক একটি দুর্গে পরিণত করতে হবে। সারা ভারত কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা কৃষক-সভার কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দিন, তবেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম হবে। সারা ভারত কৃষকসভা জিন্দাবাদ।'

বিপুল করতালির মধ্যে তাঁর বক্তব্য শেষ হল।

হুগলী জেলার প্রাচীনতম বিপ্লবী নেতা, দীর্ঘদিন কারাবাসভোগী গণ আন্দোলনের নেতা হিসাবে সুপরিচিত কমরেড বিজয় মোদক সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন।

দুপাশের সারিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক এবং সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্য দিয়ে প্রথমে জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চ থেকে নেমে

নিজ নিজ গাড়ীগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন। সাংবাদিকদের ক্যামেরা-গুলো বার বার ঝলসে উঠতে লাগলো। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও বিনয় চৌধুরী নিজ নিজ গাড়ীতে উঠলেন। অন্যান্য নেতারাও যে যাঁর গাড়ীতে উঠলেন। সব গাড়ীই পর পর চলতে শুরু করলো, পুলিশের কনভয় গাড়ী এবং সিকিউরিটি ফোর্সের গাড়ী, এবার সকলের বাড়ী ফেরার পালা। সারা রাস্তা জুড়ে আবার সেই জনস্রোত, রেলস্টেশন যাবার রাস্তা, চারপাশের গ্রামের রাস্তা, চারদিকে কেবল মাথা আর মাথা, বাস লরী ও ট্রাক্টারযোগে যারা এসেছে, তারা বহুদূরে গাড়ীগুলোর দিকে হাঁটা শুরু করলো। বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে যারা এসেছিল, তারা আবার একত্রিত হয়ে সেইভাবেই ফেরার রাস্তা ধরলো। রেখে গেল মানুষের মনের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি। এই সমাবেশ অভূতপূর্ব, এরকম সমাবেশ কোনদিন ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা বলা যায় না। তবে স্মৃতি হয়ে যে থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে, চারিদিকে আটকে থাকা যানবাহনগুলো এগোবার রাস্তা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নয়

মাঘ মাসের পহেলা। পাণ্ডুয়া মেলাতলায় মেলা বসেছে। মিনার আর বাইশদুয়ারী সংলগ্ন বিরাট প্রাঙ্গণ সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে, কিন্তু এই সময় সারি সারি চালাঘর করে মনোহারী, পিতল, কাঁসার লৌহজাত সামগ্রী, ময়রা, জুতা, কাঠের আসবাব প্রভৃতির দোকান সাজিয়ে সব বসে। পাশেই তরিতরকারী-মাছের বাজার। এটা চলে একমাসের ওপর। এই মেলাকে ঘিরে বহু মানুষের রোজগার, আশা, ভরসা, মিলন উৎসবের ভাবনা-চিন্তা। পশ্চিমবাংলার সুদূর জেলা-জেলান্তরের আদিবাসী এসেছে এই মেলায়। পৌষ সংক্রান্তির জাগরণ উৎসবে সারারাত্রি নাচগান আর ধামসা-মাদলের বাজনায় রাত কাটিয়ে পরদিন যে যার আত্মীয়দের খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখা সাক্ষাতের জন্য। বছরের একটা দিন সবাই আশা করে থাকে, দূরে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে এখানে ঐ দিন আবার পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ

হবে, সুখ দুঃখের কথা হবে। দেখা হলে ওরা ছোটরা, বয়স্কদের পায়ের কাছে মাটিতে দুটি হাত রেখে সম্মান জানায়। পথে প্রান্তরে উপচে পড়া জাগরণের ভিড়, পথ চলা দায়। যানবাহন চলে মন্থর গতিতে। মোংলা সরেন বেলপাহাড়ি গ্রাম থেকে মেলায় এসেছে, সাঁওতালি কাপড়, হাঁসুলী আর মল নিয়ে। রাস্তায় চট টাঙিয়ে দোকান করে বসেছে। ক'পুরুষ ধরে প্রতি বছরই আসে, মেলার একমাস থেকে আবার চলে যায়। ওর মাসতুতো বোন সুখী সরেন, গুত্রো গাঁয়ে বাড়ী, ওর স্বামী ভোঁদা সরেন, ওরাও এসেছে মেলায়, বড়শরশা, খন্যান, ধামাসীন প্রভৃতি চারপাশের গ্রামের সাঁওতাল সবাই এসেছে। পরস্পরের আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করছে।

মোংলাকে দেখে ভোঁদা বলল—'কি হে মহাজন! জোর দুকান চালাচ্ছো? বোনটা, ভাগনাটা কেমন রইল, একবার ঢুঁ মারতে ইচ্ছে হল না বটে?' সুখীর একটা বছর দুয়েকের ছেলেকে সঙ্গে এনেছে, পরনে লাল গেঞ্জি, লাল ইজের, পায়ে লাল মোজা এবং প্লাস্টিক জাতীয় লাল রংয়ের জুতো, মোংলা একমুখ হেসে বল্লো —'ভাগনে ব্যাটা লায়েক হুইচে। এই ব্যাটা! তুর বাপ যে তুকে এক্‌বারে লাল ফৌজ বান্‌নে দিচে রে!'

মোংলার কথায় ভোঁদা হাসতে থাকে।

দুচারজন সাঁওতাল মেয়ে কেউ হাঁসুলী কেউ মল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, পছন্দ করছে, এদের বাড়ী খন্যান। পাণ্ডুয়া রাধারাণী গার্লস স্কুলের ছাত্রী, আদিবাসী মেয়েদের আবাসিক হোস্টেলের বোর্ডার। পৌষ পার্বণের ছুটীতে বাড়ী এসেছে। সেখান থেকেই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে মেলা দেখতে এসেছে। শুধু সাঁওতাল মেয়েরাই নয়, ওদের বান্ধবী হিন্দু-মুসলমান মেয়েরাও আছে।

সুস্মিতা একটি ফর্সা, ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে, বয়সে কিশোরী, চন্দননগর ইংলিশ মিডিয়াম্ স্কুলের ছাত্রী। তার বাবা প্রিয়নাথ দে, কলকাতায় সরকারী অফিসে কাজ করে। সেও ওদের সঙ্গে মেলায় এসেছে। মেলা দেখে কলবাজারে রজত জয়ন্তী উৎসবে যাবে। সাথী

রাধারাণী স্কুলের ছাত্রী মালতী ও ফুলমণিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

মোংলার ডর লাগে আইবুড়ো মেয়েদের তার দোকানে দেখলে। দল বেঁধে জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে কেউ কেউ কোন জিনিস চুরি করে। তাই কথার ফাঁকে ফাঁকে জিনিসগুলোর দিকে নজর রাখছে। মোংলা তার ভগ্নীপতিকে বল্লো—'তুমি তো বেশ মজায় আছ হে? চাষ কুরছ, সালভোর দুটো-তিনটা ফসল ঘরকে তুল্চ, বিক্রী কুরচ—বেশ মজায় আচো। আর আমাদের বাঁকড়োতে, চাষের জমিনগুলান সব পাথর বটে, জল নেই। বৃষ্টি হলে চাষ হয়, নইলে শুখা।'

ভোঁদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—'সবই তো ভালো গো। তবে বালিখাদের বাবুদের অত্যেচারে আমাদের বাড়ী চুলে গেচে, উরা ঘর বানিয়ে দিবে বুলেছিল, কিন্তুক দেয় নাই। ভাগের জমিনগুলান সব খাদের মুধ্যে চুলে গেল। আমাদের মেয়ে মরদ সুবাইকে খাদে কাজ দিয়েছিল, রোজের টেকাও বেশী দিত, কিন্তুক উদের চরিত্রির খুব খারাপ বটে, লোভ ছিল আমাদের মেয়েগুলানের দিকে।'

মোংলা বলল—'উঃ শালারা লোক খুব খারাপ।' সুস্মিতার দিকে চেয়ে বল্লো—'তুই বেটি লাড়চিস্ চাড়ছিস্, কিছু নিচছিস্ নাই, তোর মনে পছন্দ নাই।'

মোংলার কথা শুনে সুস্মিতা হাসতে লাগল, মালতী আর ফুলমণি ফুল দেওয়া মাথার কাঁটা ওকে পছন্দ করে দিল।

দূর থেকে শ্লোগান ভেসে আস্ছে—'সকলের জন্য শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই। বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ।' সকলের নজর সেই দিকে চলে গেল। সামনে জি. টি. রোডে লরী, বাস প্রভৃতি যানবাহন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাদা পোশাকে এবং বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন রংয়ের ইউনিফর্ম পরে সারিবদ্ধভাবে মেলাতলার দিকে এগিয়ে আসছে। পান্ডুয়া সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসায় রজত জয়ন্তী

উৎসবের শুভ উদ্বোধন হবে, মিছিলের পেছনে কাতারে কাতারে লোক চলেছে কলবাজারের দিকে, যদিও ঐ মৌজার নাম পুরুষোত্তমপুর, তবুও কলবাজার নামটা আজও রয়ে গেছে। সে চালকলও নেই বাজারও নেই, কিছু ভাঙা চাতাল, আর বেকার শ্রমিক ঐ এলাকায় থেকে গেছে, আর থেকে গেছে—প্রাচীনতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বটবৃক্ষের মতো শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সুশীতল পরিবেশ সৃষ্টি করে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে। বছর বছর কত শতশত ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয়ে আসে, শিক্ষান্তে চলে যায়, রেখে যায় শুধু স্মৃতিটুকু।

মিছিল এসে যখন বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে পেঁছাল, তখন মিছিলের শেষ মাথা একমাইল পিছনে তেলিপাড়া মোড়, রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে এই বর্ণাঢ্য মিছিল উপভোগ করছে, জি. টি. রোডের ওপর লরী বাস সব দাঁড়িয়ে গেছে, দেখা গেল সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ী আসছে, আর তার পিছনে এক মহামান্য মন্ত্রীর গাড়ী, মিছিলের দুই সারির মধ্য দিয়ে গাড়ীগুলো গিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো, জনতাও বিদ্যালয় মাঠে ভেঙে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করল, সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসায় বিরাট প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং মান্যবর অতিথিবর্গ এসে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছেন, ডায়াস থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের শুভ আগমন বার্তা ঘোষণা করা হল, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রজতজয়ন্তী উৎসব কমিটির সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক, কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকবৃন্দ এগিয়ে এসে মাননীয় মন্ত্রীবরকে মঞ্চে নিয়ে এলেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসালেন, উৎসব কমিটির সভাপতি ঘোষণা করলেন, "এইবার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শুভ উদ্বোধন করবেন।" সকলকে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অনুরোধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেদীর কাছে সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাদা পায়রা মেঘমুক্ত নির্মল নীল আকাশে উড়িয়ে দিলেন, ডানা মেলে উড়ে গিয়ে শ্বেত কপোত

রোদের ঝিলিকে জীবনের স্পন্দন জাগাল, মনে হল যেন জগৎবাসীকে জানাতে চাইছে—"যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই! 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'' এরপর মন্ত্রী মহাশয় বেদীর ওপর পোঁতা দণ্ডের দড়ি টেনে বিদ্যালয়ের পতাকা আকাশে উড়িয়ে দিলেন। ফুল ঝরে পড়ল, বাতাসে পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগল। উপস্থিত জনতার করতালিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মুখরিত হল। পঞ্চাশটি দীপশিখা জ্বালিয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রকাশ ঘটানো হল। মন্ত্রীমহোদয় এবং কর্মকর্তারা মূল মঞ্চে ফিরে এসে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করলেন। দর্শকরাও নিজ নিজ আসন নিলেন।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচী অনুযায়ী সভাপতি ও সম্পাদক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আহ্বান করলেন, প্রধান শিক্ষক মহাশয় মাইকে ঘোষণা করলেন, "মাননীয় সভাপতি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, আজ বড় আনন্দের দিনে আপনারা যে এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, সেজন্য উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এই সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মরহুম হাজি আতর আলি সাহেব। তিনি নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে এবং জাতিকে শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা। তাঁরই প্রেরণায় এই বিদ্যালয়ে বালিকাদেরও শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তাঁরই নির্দেশে, মাদ্রাসা শিক্ষা হলেও, দরিদ্র হিন্দু ছাত্রছাত্রীরাও এই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, দেখতে দেখতে এই বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর বয়স হল। বিদ্যালয় স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক্‌ সাহেব। আজ যিনি উপস্থিত আছেন, উনি বামফ্রন্ট সরকারের তপশিলী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। নানা কাজের মধ্যেও অনুগ্রহ করে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সভার সভাপতি ঘোষণা করলেন, 'এইবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই শুভ

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন।'

মন্ত্রী মহোদয় তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেই, সাংবাদিকদের ক্যামেরাগুলো ঝলসে উঠল বার বার, ভি· ডি· ও· রেকর্ডিং হতে দেখা গেল।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন—'শিক্ষা মানবিক অধিকার। সংবিধানে আমরা শপথ নিয়েছি, দশ বছরের মধ্যে সমস্ত নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষা দেব, কিন্তু আমরা তা পারিনি। এখনো আমাদের দেশে শতকরা ষাট্ভাগ মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষাই মানুষকে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে সাহায্য করে, পরিপূর্ণ করে তোলে। এখন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে পাশ করলে, মাধ্যমিক পাশ বলে গণ্য হবে। বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষানীতিকে সার্বিক ও মৌলিক অধিকার হিসাবে রূপ দেবার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আপনারা যাঁর যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাই দিয়ে সমগ্র জাতিকে উৎসাহিত ও ঐক্যবন্ধ করে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তুলুন, দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন, আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। এই রজত জয়ন্তী উৎসব সার্থক হোক।'

উপস্থিত জনতার করতালি ধ্বনিত হল। সভাপতি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'সকলকে অনুরোধ করছি—সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্পে শপথ বাক্য পাঠ করার জন্য আপনারা অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ করুন।'

মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হল, 'আমরা ভারতবাসী আজ শপথ নিচ্ছি'—সমস্বরে তা উচ্চারিত হল।

'আমরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করব।'

সমস্বরে ঐ বাক্য উচ্চারিত হল।

'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করব, সকলে মিলে নিরক্ষর ভাই-বোনদের নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেব।'

সমস্বরে উচ্চারিত হল—মুক্তি দেব।

সভাপতি আবার সকলকে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অন্যত্র কর্মসূচী থাকায়, সভার অনুমতি নিয়ে

বিদায় নিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মিঃ এ· সেন, আবৃত্তি প্রতিযোগীদের আবৃত্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি ও সুকান্তের রানার সঙ্গীত মন দিয়ে শুনলেন। এতে সুস্মিতাও অংশগ্রহণ করে নজরুল গীতিটি এমন দরদ এবং আবেগের সঙ্গে গাইল যে, মিঃ সেনের চোখের কোণে জল জমে গেল। তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল, তাদের পুরস্কার দেওয়া হল, তিনি সুস্মিতাকে নিজের থেকে বিশেষ পুরস্কার দিলেন। সুস্মিতা মঞ্চ থেকে নামতেই বহু ছেলেমেয়ে ভিড় করে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

মহম্মদ ইব্রাহিম ও মহম্মদ ইস্‌মাইল আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের নিজস্ব ক্যামেরায় ছবি তুলতে থাকাকালীন সুস্মিতার ছবিও তুলে নিল। সুযোগ বুঝে সুস্মিতার সংগে আলাপ করে তার পরিচয় জেনে নিল। সে বললো, 'তার নাম সুস্মিতা দে, বাবার নাম শ্রীপ্রিয়নাথ দে, বাড়ী খন্যান এবং সে চন্দননগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী।'

তার গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাকে আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা করে দেব বলে জানাল।

কিশোরী বালিকা। জটিল সংসারে কত মারপ্যাঁচ চলছে তার গভীরে যাবার বুদ্ধি বা বোধক্ষমতা এখনও হয়নি। নিজে সরল, তাই সকলকেই সে সরলভাবে আপনজন বলে মনে করে, খোলা মনে কথা বলে, সমাজের ক্ষতিকারক দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা সেই সুযোগের সদব্যবহার করে নিজেদের কাজ হাসিল করে। আবৃত্তি ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের পর, হরবোলা উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য বলতে শুরু করল, 'আমি একজন হরবোলা, এবার আমি করবো। হ্যাঁ, আগে—মেয়েদের করব।'

মেয়েরা যাঁরা বসে আছেন তাঁরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করছেন, এক তরুণী অন্য এক তরুণীকে বলল, 'এই, চল উঠে চল এখান থেকে, লোকটা কি অসভ্য!'

তিনি আবার বললেন, 'সত্যি বলছি, এবার আমি করব, তবে আগে মেয়েদের', উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে তরুণরা হাসতে লাগলো।

তিনি আবার বললেন, 'হ্যাঁ আগে মেয়েদের করব, তারপর বয়োজ্যেষ্ঠদের।' উপস্থিত দর্শকবৃন্দের হাসি থামলে, ধীর ও স্থির-ভাবে করজোড়ে বলল, 'আমি প্রণাম করবো।'

আবার হাসির রোল, প্রধান অতিথি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের পক্ষ থেকে শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শনী শুরু হল। দূরের মানুষরা একে একে চলে যেতে আরম্ভ করলেন, আস্তে আস্তে সমাবেশ পাতলা হয়ে গেল।

দশ

সেদিন ছিল সোমবার। প্রিয়নাথ তাঁর আদরের একমাত্র কন্যা সুস্মিতাকে নিয়ে খন্যান স্টেশন পেঁছালেন ডাউন ট্রেন ধরবার জন্য। প্রতিদিন অফিস যাবার পথে মেয়েকে চন্দননগর স্কুলে পেঁছে দিয়ে আবার অন্যগাড়ী ধরে হাওড়া যান অফিস করতে। সেদিনও সাইকেলটি দোকানে জমা রেখে মেয়েকে সঙ্গে করে প্লাটফর্মের শেষের দিকে দাঁড়ালেন। চন্দননগর স্টেশনের বাইরে যেতে গেলে, পিছনে চাপাই সুবিধা, কারণ গেটটা কাছে হয়।

সুস্মিতার পরনে সাদা ও সবুজ রংয়ের স্কুল ফ্রক, কাঁধে স্কুল ব্যাগ। গায়ে ফুল তোলা খদ্দরের চাদর। পায়ে ছিল হিল্ তোলা জুতো। ডাউন ট্রেন আসার খবর মাইকে ঘোষণা করা হল।

ডেলি প্যাসেঞ্জারদের নির্দিষ্ট বগী ঠিক করা থাকে। আগের বিভিন্ন স্টেশন থেকে উঠে ডেলি প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা জায়গা রেখে দেয়, উদ্দেশ্য একসঙ্গে তাস খেলতে খেলতে যাওয়া, যারা তাস খেলতে জানে না, তারা খবরের কাগজ পড়ে, রাজনৈতিক আলোচনা করে তর্ক করে, সংসারের সুখদুঃখের গল্প করতে করতে যায়। প্রিয়নাথ তাঁর নির্দিষ্ট কামরায় উঠতেই তাঁর বন্ধু শ্যামসুন্দর ডেকে তাঁর পাশে বসালেন, সুস্মিতাকেও বসবার জায়গা করে দিলেন। পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিজে মুখ দিয়ে ধরিয়ে প্রিয়নাথকে

একটা দিতে গেলেন।

প্রিয়নাথ বললেন, 'এখন থাক।'

শ্যামসুন্দর টিপ্পনী কেটে বললেন, 'তোর আবার সিগারেটে অরুচি হল কবে থেকে?'

প্রিয়নাথ ইসারায় মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, 'এখন নয়।'

শ্যামসুন্দর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েকে চন্দননগর স্কুলে পেঁাছে দিয়ে তুই কি করবি?'

প্রিয়নাথ—'স্কুলের গেট পর্যন্ত পেঁাছে দিয়েই, ফিরে এসে যে-কোন ট্রেন ধরে অফিস যাব।'

শ্যামসুন্দর—'খাওয়া দাওয়া?'

প্রিয়নাথ—'মেয়েটার সঙ্গে আমিও গরম ভাত একমুঠো খেয়ে নিয়েছি, সঙ্গে টিফিন থাকে, দুপুরের খাওয়াটা অফিস ক্যান্টিনে সারি।'

চন্দননগর স্টেশন এসে যেতেই প্রিয়নাথ মেয়েকে নিয়ে নেমে গেলেন, গেটে টিকিট কলেক্টার লক্ষ্মীবাবু প্রিয়নাথকে চেনেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েকে স্কুলে পেঁাছে দিতে যাচ্ছেন?'

প্রিয়নাথ হেসে জবাব দিল, 'হঁ্যা।'

গেট থেকে বেরিয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডে হাজির হলেন, স্ট্যান্ডে প্রচুর রিক্সা। অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল টাউনের মতো এখানে বাস সার্ভিস নেই। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি খেটে খাওয়া গরীব লোকদের জায়গাটাতে আধুনিক যন্ত্র চালু করিয়ে ওদের বেকার হতে দেয়নি, তবে রেট বেঁধে দিয়েছে ইউনিয়নের মাধ্যমে, হামড়া হামড়ি কামড়া-কামড়ি করতে দেয় না।

যে যার রিক্সায় চাপবে, সেই তাকে নিয়ে যাবে। সবাই হাত নেড়ে ডাকছে. রিক্সাওয়ালা 'শিবু' প্রিয়নাথকে চেনে, সে বাবু বলে ডাক দিয়ে প্রিয়নাথকে তার অবস্থিতি জানিয়ে দিল, প্রিয়নাথ মেয়েকে নিয়ে তার রিক্সাতে চাপতেই, সে ভিড়ের মধ্য থেকেই গাড়ী বের করে নিয়ে চলল। ফটক পাড়া, বড়বাজার পার হয়ে, গঙ্গার ধার হয়ে সুন্দর পরিষ্কার রাস্তার উপর দিয়ে চলতে লাগলো। রাস্তার দুধারেই চওড়া ফুটপাত। রাস্তার পাশে গঙ্গার ধারে সারি

সারি গাছ, মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যেই সেন্ট পল স্কুলের অবস্থান, শিবু স্কুলের গেটের সামনে রিক্সা দাঁড় করাল, সুস্মিতা রিক্সা থেকে নেমে 'আসছি' বলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল, স্কুলের দারোয়ান রামজীবন গেট খুলে দিল। প্রিয়নাথ রিক্সাতেই বসে ছিল, সে শিবুকে ষ্টেশন যাবার জন্য বলল।

রিক্সাওয়ালাদের যাওয়া আসার ভাড়া একেবারে পেলে সুবিধা, অন্য যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। শিবুও খুব দ্রুতগতিতে চলল, ষ্টেশনে পেঁছালে অন্য ভাড়া পাওয়া যাবে, গতকাল থেকে তার ছেলেটার অসুখ, ডাক্তার দেখাতে হবে বাড়ী থেকে আসার সময় বৌ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ঘরে চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজপাতি কিছু নেই, বেশ কিছু টাকার দরকার। সেজন্যই শিবুর অত তাড়াতাড়ি।

রামজীবন দারোয়ান গেট খুলে দিলে সুস্মিতা ঢুকতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে কে যেন 'সুস্মিতা—ও সুস্মিতা' বলে ডাকল।

সুস্মিতা তার নাম ধরে ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের রং ফরসা, পরনে ফুল প্যাণ্ট, হাওয়াই শার্ট। সুস্মিতার অপরিচিত, দেখে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

সুস্মিতাকে তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে দেখে আবার ডাক দিয়ে বললেন, 'সুস্মিতা ! এদিকে শুনে যাও।'

সুস্মিতা একটু ইতস্তত করে ধীর পদক্ষেপে ভদ্রলোকটির কাছে এগিয়ে গেল, ভদ্রলোক নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমার মলয় দাদা, হাওড়ার অনা মাসিকে তোমার মনে আছে ? আমি তার বড় ছেলে।' এই বলে সুস্মিতার হাতে কতকগুলো ফটো দিল।

ভদ্রলোক আবার বললো, 'তোমার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু, কলকাতার, পদ্মপুকুরের বাড়ীতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, রাস্তায় তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হল, খবরটা পেয়েই তোমার বাবা অফিস না গিয়ে সেখানেই চলে গেলেন, ঠাকুরদাদার খুবই ইচ্ছা

তোমাকে দেখার।' সুস্মিতার হাতে দেওয়া ফটোগুলি একটা একটা করে দেখিয়ে বললেন, 'এইটা তোমার ঠাকুরদার ছবি, এইটা তোমার বাবার, আর এইটা তোমাদের গ্রুপ ফটো।'

ভদ্রলোক আবার ফটোগুলি সুস্মিতার হাতে দিল। ছবিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কি রকম এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ সুস্মিতার নাকে গেল, তারপরই মাথাটা একটু ভার ভার হয়ে শরীরটা মনে হল যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার মনের পর্দায় দাদুর মুখটা ওঠা নামা করে, সে যন্ত্রচালিতের মত দাঁড় করিয়ে রাখা ভদ্রলোকের কালো রংয়ের প্রাইভেট গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

মলয় নামধারী ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার দাদু বার বার আমাকে বলেছেন, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, নাও-নাও, আর দেরী কোরো না, গাড়ীতে উঠে পড়।' এই বলে গাড়ীর পিছনের দরজা খুলে দিলেন। সুস্মিতা পিছনের সিটে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই, ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসে হুকুম দিলেন 'স্টার্ট'।'

কোর্টের মোড় পার হয়ে গাড়ীটি জি. টি. রোড ধরে অতি দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করলো।

পিছনের সিটে বসে দাদুর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে তার নিজের শরীরেও একটা ঝিমুনি ভাব এসে ক্রমশঃ সে সিটে এলিয়ে পড়লো। তার বাক্‌শক্তিও যেন কে কেড়ে নিয়েছে।

স্কুলের দারোয়ান রামজীবনের বাড়ী বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলায়, দেশওয়ালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখানে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। আগে সাজি মাটি নিয়ে ফেরী করেছে, শিল কাটার কাজ করেছে, দেশ থেকে খইনী এনে বিক্রী করেছে, শেষে রামদয়াল মাড়োয়ারীর সুপারিশে, এলিট সাহেব বিশ্বাসী লোক বলে দারোয়ানের চাকুরী দিয়েছেন। দেখতে দেখতে সে প্রৌঢ় হয়ে গেল, বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, মালকোছা মেরে আঁটোসাটোভাবে কাপড় পরে, হাতে লাঠি নিয়ে সবসময় গেট আগলে পড়ে আছে। স্কুল বসার সময় সে ছাত্রীদের ঢুকতে দেয় এবং স্কুল আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করে দেয়, স্পেশাল পারমিশন ছাড়া কাউকে

আর ঢুকতে দেয় না বা বেরোতেও দেয় না।

রামজীবন সুস্মিতাকে একটা কালো গাড়ীতে উঠতে এবং চলে যেতে দেখল, স্কুলের গেটে কত ঐরকম গাড়ী আসে মেয়েদের নামিয়ে দিয়ে আবার চলে যায়, এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষভাবে কোন গাড়ীর দিকে নজর দেবার তার দরকার নেই, তবে সেদিন মেয়েটাকে গেটে ঢুকতে গিয়েও না ঢুকে আবার ফিরে গিয়ে গাড়ীতে ওঠাতে, তার মনে খটকা লাগায়, সে ইঁটের টুকরো দিয়ে গাড়ীর নম্বরটা দেওয়ালের গায়ে লিখল W M T 390.

ক্লাশের সহপাঠিনী চন্দনা, রুপালী, মিতালী গেটের কাছে সুস্মিতাকে আসতে দেখেছে, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে এবং তার সঙ্গে একটা কালো প্রাইভেট গাড়ীতে চলে যেতেও দেখেছে। ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে, নন্দিতা দিদিমণি এরিথমেটিকের ক্লাশ নিচ্ছেন, এই সময় চন্দনা মিতালীকে বলল, 'সুমীর কি ব্যাপার বল তো ?' মিতালী, 'ওর বাবা ওকে রিক্সা থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেই, ও ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে চম্পট দিল।'

রুপালী, 'আগে থেকে নিশ্চয় ঠিক করা ছিল।'

চন্দনা, 'প্রেমের ব্যাপার বুঝছিস না! কিন্তু দেখে, ওকে ওরকম মনে হয় না।'

ওরা ফিক করে হেসে ফেললো। হাসি বড় সংক্রামক, সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত সব বেঞ্চিতেই হাসির ঢেউ বইতে লাগল।

নন্দিতা দিদিমণি বোর্ডে অঙ্ক কষলেও, চোখ এবং কান তাঁর সজাগ, আড়চোখে চন্দনা, মিতালী ও রুপালীকে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে এবং হাসতে দেখেছেন ওদের তিনজনের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বললেন, 'অল অফ্ ইউ, গেট্ আপ অন দি বেঞ্চ।'

ওরা যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে বেদনাভরা মুখগুলোতে দেখা গেল লজ্জার আভাস, তারা চোখ নামিয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল, পিরিয়ড শেষের ঘন্টা পড়লে যাবার সময় দিদিমণি বলে গেলেন, 'বি কেয়ার ফর দি ফিউচার।'

নন্দিতা দিদিমণি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে কমনরুমের দিকে যেতেই,

রেখা, ডলি, কাকলীরা ওদের ঐরকম সাজা পাওয়ার জন্য টিট্‌কারী দিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে, আর হাসবি ? কেমন জব্দ।'

চন্দনা বললো, 'দ্যাখ্‌ ভাই। বেঞ্চিতে দাঁড়াবার জন্য কোন দুঃখ বা লজ্জা হয়নি, আমাদের চিন্তা সুস্মিতার জন্য।'

ডলি, 'কেন, সুস্মিতার আবার কি হোল ?'

কাকলী, 'অসুখ বিসুখ হয়েছে নাকি ?'

চন্দনা—'না-না, ওসব নয়, মনে হচ্ছে আজ ও কোন বিপদে পড়েছে।'

সকলে—'কি বিপদ ?'

রূপালী—'আমাদের মুখ থেকে নাই বা শুনলি। রামজীবন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করগে যা, তার মুখেই শুনতে পারবি, সে সব দেখেছে।'

ডলি—'যদি নাই বলবি, তবে কথাটা তুললি কেন ?'

রূপালী—'মেয়েদের নিয়ে আজকাল যে কাণ্ডকারখানা হচ্ছে ! এই স্কুল তো শুনেছি খুব কড়া, দেখছি বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।'

অন্য ক্লাশটিচার ঢুকতেই তাদের কথাবার্তা থেমে গেল, ক্লাশ আরম্ভ হল কিন্তু মেয়েদের সকলেরই মনে সুস্মিতার জন্য চিন্তা।

এগার

প্রিয়নাথ এবং অন্যান্য ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের অফিস করে বাড়ী ফেরার গাড়ী হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন লোকাল এম ২২৫, অফিস ফেরৎ বাবুদের এ হচ্ছে প্রেমিক গাড়ী, কারণ গ্যালপিং ট্রেন, হাওড়া-ব্যান্ডেলের মধ্যে মাত্র ৩।৪টি স্টপেজ, গাড়ীটি সাধারণত দুনম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে।

প্রিয়নাথ একটু আগেই এসেছে। আজ সে দুনম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সামনের দিকের বগীতে চাপলে সুবিধা, খন্যান স্টেশনে নামতে। বাড়ীর রাস্তাটাও কাছে হয়, আবার ভিড় ঠেলে আসতে হয় না। ধীরেন, কান্ত, সরোজ শ্যামসুন্দর এরাও একে একে এসে হাজির হল।

হঠাৎ মাইকে ঘোষিত হল, 'হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন লোকাল

এম ২২৫, চার নম্বর প্লাটফর্ম থেকে পাঁচটা তিরিশ মিনিটে ছাড়বে।' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারত প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেল, মালপত্র বাচ্ছা ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে তাঁরা কোন রকমে চার নম্বর প্লাটফর্মে হাজির হলেন।

যাত্রীবোঝাই গাড়ীটি প্লাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। যাত্রী নামার আগেই, গাড়ীতে উঠে জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, বহু মহিলা বা বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁদের বাচ্ছা বা মালপত্র নিয়ে নামছেন বা কোনও রোগী নামছেন, সেদিকে কোন হুঁশ নেই, এইভাবে প্রতিদিনই তাঁদের লাঞ্ছিত হতে হয়।

নিজেরা তো ঐভাবে উঠলেনই আবার ব্যাগ, রুমাল, ছাতা ইত্যাদি সিটের ওপর রেখে তাস পার্টির পার্টনারদের জায়গা রেখে দিলেন, তাঁদের হয়তো কেউ অফিস থেকেই বেরোতে পারেননি বা রাস্তা জ্যামে কোথাও আটকে পড়েছেন, অথচ কোন রোগী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ছেলে কোলে কোন ভদ্রমহিলা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যতক্ষণ না কোন সিট খালি হয়, তাঁদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হবে। প্রতিটি গাড়ীতেই একই অবস্থা। প্রতিবাদ করার কেউ নেই, কেউ করলেও তার হেনস্থার অবধি থাকে না।

গাড়ী ছাড়ার নির্দিষ্ট প্লাটফর্মের ঘোষণা যদি আগে থেকে করা হয়, তাহলে আর প্যাসেঞ্জারদের এ প্লাটফর্ম ও প্লাটফর্ম ছোটাছুটি করতে হয় না।

এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের নজরে এনেও কিছু ফল হয়নি।

প্রিয়নাথরাও বসার জায়গা করে নিয়েছে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই ধীরেন, কান্ত, সরোজ ও শ্যামসুন্দর তাস খেলতে বসে গেল। সরোজ 'লেট্ লতিফ', দেরিতে আসায় বসবার জায়গা পায়নি। প্রিয়নাথ অ্যাটাচি থেকে স্টেটস্ম্যান কাগজটা বার করে, সকালে যে জায়গাগুলো পড়া হয়নি, সেগুলোর উপর চোখ বোলাতে লাগল।

তাদের ছোট ব্যাগের মধ্যে কনট্রিবিউট করা তাস, অফিসের ঝাড়ন, ছোটখাতা, ডট্পেন সবসময়ই থাকে। নির্দিষ্ট পার্টনার নিয়ে খেলে। সরোজ-কান্ত, এবং ধীরেন-শ্যামসুন্দর, কোনদিন

চব্বিশ কোনদিন বত্রিশ ডিল খেলা হয়, সকালের অসমাপ্ত ডিলগুলো যাবার সময় পুরা হয়, খাতাতে পুরানো হিসেবেরই হিসাব লেখা হয়। ঐ কামরায় আরও তিন চারটে তাস পার্টি বসেছে। গড়ে উঠেছে চলন্ত রেল গাড়ী ব্যান্ড ক্লাব। ব্যাগ থেকে ঝাড়নটা বার করে, দড়ি দিয়ে বাঁধা তার একটা খুঁট প্রিয়নাথের দাবনায় বেঁধে দিতেই, সে চমকে উঠল, সে একমনে কাগজ পড়ছিল, সুড়সুড়ি লাগতেই তার এই চমকানি। বললে, 'তোদের ঘোড়া রোগ আবার চাগাড় মেরে উঠল ?'

ঝাড়নের বাকি তিনটে খুঁট নিজ নিজ মনোমত জায়গায় বেঁধে নিল। ডিল শেষ হতেই জয়ের উল্লাস, আবার ভুল খেলার জন্য ধমক-সমালোচনা, পাশের বসা যাত্রীরা বিরক্ত। কিন্তু প্রতিবাদ করেও কিছু ফল হবে না ভেবেই, তারাও চুপচাপ।

তারা নিয়ম করে নিয়েছে, যারা হারবে, তারা ব্যাণ্ডেলে এসে চা খাওয়াবে। খেলায় তারা এত মশগুল যে ট্রেনের ঐ কামরার মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে তাদের নজর নেই, কত যাত্রী উঠল, নামল, জায়গা দখলের জন্য ঠেলাঠেলি বচসা এমনকি ছোটখাটো ঘুঁসো-ঘুঁসি হল—ওসব দেখবার তাদের সময় নেই, গাড়ী ব্যাণ্ডেলে একনম্বর প্লাটফর্মে প্রবেশ করতেই, ওদের মধ্যে একজনের তা নজরে পড়ল।

সরোজ চিৎকার করে বললো, 'আজ কাপুরের চা।'

কান্ত বললে, 'না না, কাপুর নয়, আজ আরও ভালো চা খাব আমরা। একই পয়সায় ডবল চা, এবং উৎকৃষ্ট মানের।' এই বলে সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল 'এই রাজু! এখানে পাঁচটা চা পাঠিয়ে দে।' প্লাটফর্মের উপরে ত্রিপল টাঙিয়ে একটি চায়ের দোকান, খুব ভিড় সেখানে, কান্তকে রাজু চেনে, সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে চা পাঠিয়ে দিল। কান্ত জানালার ধার থেকে চায়ের ভাঁড় এক একজনকে দিয়ে বলল—'ভাঁড় ফেলিস না, খাওয়া হয়ে গেলে আবার ভাঁড় পাত।' একে একে এসে, তারা সেরকমই করল।

ব্যান্ডেল ছাড়তেই, শ্যামসুন্দর মন্তব্য করলো, 'সরোজদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দেখে আমাদের হারিয়েছে।'

সরোজ হেসে বলল, 'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ। বসার জায়গা তো হয়েছে। নে—বসেই খেলছি, হারা দেখি।'

আবার খেলতে বসে গেল। তাসের আবার গোঁ আছে। এবার শ্যামসুন্দর এবং তার পার্টনার ভালো ভালো তাস পেয়ে গ্রেট স্লাম্ব এবং লিটিল স্লাম্বের ডাকে বেশ কয়েক ডিল জিতে সরোজদের গো হারান হারিয়ে দিল। ত্যালাণ্ডু স্টেশন পার হতেই, সরোজরা হার মেনে তাস গুটিয়ে প্যাকেটে ভরল, খেলা ভেঙে গেল। সরোজ, কান্ত, ধীরেন এবং শ্যামসুন্দরের সাথে প্রিয়নাথও থন্যান স্টেশনে নামল। তার একহাতে বাজারের থলে, অপর হাতে অফিস ব্যাগ, গেট পেরিয়ে সে ঘোষদার দোকানের দিকে এগিয়ে চলল সাইকেল নেবার জন্য, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলল, 'প্রিয়দা, মেয়ে বাড়ী ফিরেছে?'

প্রিয় পিছন ফিরে দেখে প্রশ্নকর্তা ভোঁদা।

ভোঁদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়ে বাড়ী ফিরেছে মানে?'

ভোঁদা বললে, 'অন্যান্য দিনের মত পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সে আজ ফেরেনি। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বলেছে, ক্লাশে সে আজ যায়নি। স্কুলগেট থেকেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ীতে চাপতে তারা তাকে দেখেছে।'

একথা শোনামাত্র প্রিয়নাথের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। হাতের মুঠো আলগা হয়ে বাজারের থলি এবং অফিস ব্যাগ রাস্তায় পড়ে গেল, সরোজ, কান্তরাও ব্যাপারটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘোষদার দোকান থেকে সাইকেলটা এনে মন্টু প্রিয়নাথের হাতে দিল, সরোজ রাস্তায় পড়ে থাকা ব্যাগগুলো সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিল, প্রিয়নাথ আবার ভোঁদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'রুপালী, চন্দনা, মিতালী এরা সব ফিরেছে?'

ভোঁদা বললে, 'ওদের কাছ থেকেই ঐ খবর পাওয়া গেছে।'

ঐ কথা শুনে প্রিয়নাথ সাইকেল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কান্ত পাশেই ছিল ধরে ফেলল।

সরোজ ভোঁদাকে বলল, 'সাইকেল সমেত প্রিয়কে তুই বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।'

প্রিয়কে বলল, 'আগে বাড়ী যা, বৌমা এবং সঙ্গী মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে, সব ব্যাপারটা জান, রাস্তায় এরকম মন খারাপ করলে কি কিছু সুরাহা হবে?'

কোথা থেকে হরি এসে জুটলো। সে আবার বেশী মাতব্বর, বলল, 'ঠিক হয়েছে। আমাদের যেন ছেলেমেয়ে নেই! আমরা তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি না? দেশে এত স্কুল থাকতে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল! তাও আবার চন্দননগরে!'

ঘোষদা ওরফে বাদল ঘোষ তেড়ে এসে বলল, 'ওরে ব্যাটা জানোয়ার। এই সময় ঐসব কথা বলতে আছে? ছিঃ, বরং সহানুভূতি জানা, খোঁজখবর কর।' প্রিয়নাথকে বলল, 'প্রিয়দা, তুমি এত ভাবছো কেন? সে নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাছে গেছে, তিনি নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবার জন্য কাউকে পাঠিয়েছিলেন, তুমি বাড়ী যাও। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।'

ভোঁদা ও মন্টু দুজনে মিলে প্রিয়নাথকে বাড়ী পেঁাছে দিতে গেল, ঘোষদা হরিকে বলল, 'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? লোকে বলে, আশি বছর না হলে তোদের নাকি আক্কেল হয় না। এখন দেখছি সারা জীবনেও তোর জ্ঞান বুদ্ধি হবে না।'

হরি বলল—'দেখ ঘোষদা। তেল বুলানো কথা আমি বলি না যা সত্যি তা মুখের সামনেই স্পষ্ট বলি।'

ঘোষদা—'অপ্রিয় কথা, তা সত্য অথবা মিথ্যে হোক, সবসময় বলা যায় না, স্থান, কাল-পাত্রের বিচার করতে হয়, দেখছিস প্রিয়র সমূহ বিপদ। এই সময় ঐ রকম কথা বলে?'

হরি, 'তাহলে বলো, আমাকে এখন কি করতে হবে?'

সরোজ, 'ওর দাদুর কাছে যায়নি তো?'

কান্ত, 'তা হতে পারে।'

সরোজ, 'ঘোষদা। ওর দাদুর ঠিকানা তোমার জানা আছে? আমি না হয়, এখনই কলকাতা চলে যাই।'

ঘোষদা, 'হঁ্যা-হঁ্যা! ঠিকানা আমি জানি। দশ নম্বর পদ্মপুকুর রোড।' সরোজ হাতের ব্যাগটা ধীরেনের হাতে দিয়ে বলল, 'তুই

বাড়ীতে গিয়ে খবর দিবি, আমি লাস্ট ট্রেনে ফিরব, আর ঘোষদা তুমি প্রিয়দাকে খবর পাঠাও আমি তার বাবার কাছে গেছি, সুস্মিতার খবর নিতে।' ডাউন ট্রেনের খবর হল, সরোজ ঐ ট্রেন ধরে চলে গেল, ঘোষদা শ্যামসুন্দরকে বলল, 'শ্যামদা। প্রিয়দার তো এখন মাথার ঠিক নেই, তার এই বিপদে আমাদেরই এগিয়ে এসে তাকে সুপরামর্শ দিতে হবে, আমার মনে হয় 'মহাদেবের' সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করা দরকার।'

শ্যামসুন্দর, 'কোন মহাদেব ?'

ঘোষদা, 'মান্দারণের মহাদেব মুখুজ্যে! জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ও এখনও ফেরেনি। রাতে বাড়ী ফেরার পথে, গাড়ী দাঁড় করিয়ে চা খেয়ে সব খোঁজখবর নিয়ে যায়।'

শ্যামসুন্দর—'ঠিকই বলেছ, তাকে জানানো দরকার, তবে থানায় একটা ডায়েরী করাও দরকার।'

কান্ত ও ধীরেন দুজনেই বলল—'শ্যাম! তুইই যা পাণ্ডুয়া থানায় ডায়েরী করতে। সরোজ যদি ভালো খবর নিয়ে আসে, থানায় জানিয়ে দিলেই হবে, খারাপের সম্ভাবনাই বেশী, সুতরাং দেরী করা ঠিক হবে না।'

শ্যাম—'যদি পুলিশ আমাকে বিপদে ফেলে ?'

ঘোষদা—'তোর কোন ভাবনা নেই, মহাদেব আছে না ? তুই নির্ভয়ে চলে যা।' আপ ট্রেন ধরে শ্যামসুন্দর পাণ্ডুয়া চলে গেল।

আপ-ডাউন প্যাসেঞ্জার চলে যেতেই ঘোষদার দোকানে ভীড় লেগে গেল, সবাই সাইকেল নিতে এসেছে, কান্ত ও ধীরেনও চিন্তিত মনে তাদের সাইকেল নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

খন্যান শহর নয়, গ্রাম, এখানকার মানুষরা দরদী এবং পরোপকারী, রাজনৈতিক মতপার্থক্য তাদের মধ্যে কিছু কিছু আছে, কিন্তু পরের বিপদে জান প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শুধু তাস খেলা নয়, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল এবং জিম্‌ন্যাস্টিক প্রভৃতি খেলাধুলায় খন্যান এবং আশপাশের গ্রাম খুবই উৎসাহী, জেলাস্তরে তো বটেই, এমনকি পশ্চিমবাংলার হয়েও এদের অনেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় প্রতিনিধিত্ব

করেছে, অবশ্য এসবই মহাদেব মুখুজ্যের অবদান। জেলাপরিষদ থেকে তিনি খুবই সাহায্য করেছেন, মহাদেব মুখুজ্যের এবিষয়ে মুখ্য ভূমিকার কথা বা অন্যান্য জনহিতকর কাজের কথা খুব বড় গলায় ঘোষদা সকলকে বলে। ঘোষদা 'হরি' 'হরি' করে ডাক দিতেই হরি এল, বলল—'আমাকে কি করতে হবে তা তো কিছু বললে না ?'

ঘোষদা, 'মেয়েগুলো আবার ঘুমিয়ে পড়লো না তো ?'

হরি, 'তোমার মেয়ে তো ছোট। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে ?'

ঘোষদা, 'আমার মেয়ের কথা বলছি না, রায়পাড়ার রুপালী, চন্দনা, মিতালী ওদের চিনিস ?'

হরি, 'তা আর চিনব না কেন ? কি করতে হবে তাই বল না ?'

ঘোষদা, 'ওদের জিজ্ঞাসা করে আয় প্রিয়দার মেয়েকে তারা প্রাইভেট গাড়ী করে চলে যেতে নিজ চোখে দেখেছে কিনা।'

হরি একটা সাইকেল নিয়ে রায়পাড়া চলে গেল।

ভোঁদা ও মন্টু প্রিয়নাথের বাড়ী থেকে ঘোষদার দোকান ফিরে এল। ওদের ফিরতে দেখে আশেপাশের দোকানদার ও অন্যান্য মানুষ তাদের ঘিরে দাঁড়াল কথা শোনার জন্য।

মন্টু বলল, 'অন্যান্য পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সুস্মিতাকে ফিরতে না দেখে, প্রিয়দার স্ত্রী তাদের জিজ্ঞাসা করেছে, 'হ্যাঁরে! তোরা ফিরলি! আমাদের সুমি কোথায় ? সে এল না কেন ?'

মেয়েরা বলেছে—'সে স্কুলেই ঢোকেনি। আমরা স্কুল গেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাকে একটা কালো প্রাইভেট গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি, দারোয়ান বলেছে—'সে ঐ গাড়ীতেই চলে গেছে।' প্রিয়দার স্ত্রী তা শুনে খুব কান্নাকাটি করেছে।

প্রিয়দা যাবার পর কান্নাকাটি আরও বেড়ে গেছে।'

ঐ সময় হরিও সাইকেলে করে ফিরে এল। সাইকেলটা ঘোষদার দোকানের সাইকেল গাদায় ঠেসিয়ে রেখে বলল—'প্রত্যেকটা মেয়েকে আমি আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করেছি। সকলেই একই কথা বলল। তারা সুস্মিতাকে একটা কালো প্রাইভেট গাড়ীতে উঠে চলে

যেতে দেখেছে। যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে সুস্মিতা চলে গেছে, তার পরনে ছিল ফুল প্যাণ্ট, হাওয়াই শার্ট এবং চোখে ছিল চশমা, গায়ের রং ফরসা, তিনি সুস্মিতাকে ফটোও দেখালেন। কি কথাবার্তা হচ্ছিল, দূর থেকে তারা শুনতে পায়নি। তবে রামজীবন দারোয়ানকে দেওয়ালে গাড়ীর নম্বর লিখে রাখতে তারা দেখেছে।'

হরির মুখে সব কথা শুনে ঘোষদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বুঝে নিলেন ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়, বেশ ঘোরালো, মনে মনে ঠিক করলেন, শ্যামসুন্দর থানা থেকে এবং সরোজ কলকাতা থেকে না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। মহাদেব এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে, কি বলে না বলে তা সকালে প্রিয়কে জানাতে হবে। তাই সে দোকান বন্ধ না করে সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বার

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ, প্রিয়নাথের বাবা-মা, চন্দ্রনাথবাবু ও সন্ধ্যাদেবী খন্যান স্টেশনে নামলেন। সরোজ গতকাল রাত্রে ফিরতে পারেনি, আজ ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

চন্দ্রনাথবাবুর বয়স প্রায় সত্তর বছর, কিন্তু দেখে তা বোঝার উপায় নেই। টক্‌টকে গায়ের রং, দাঁত এখনও অটুট, চোখে চশমা লাগে না। মাথার চুলেই কেবল সাদা-কালোর সংমিশ্রণ, ধুতি পাঞ্জাবী পরেছেন, কাঁধে কাশ্মীরী শাল এবং পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি-জুতো।

তিনি পেনশন্‌ভোগী রিটায়ার্ড অফিসার। বরাবর খন্যান স্টেশন থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেছেন। এখন কলকাতায় থাকেন, পেনশন্‌ তোলার সুবিধের জন্য। তাছাড়া তিনি যে জীবিত, তা প্রমাণের জন্য ডাক্তারী সার্টিফিকেট অফিসে জমা দিতে হয় মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যারাণী দেবীর বয়স প্রায় ষাট বছর, বয়সের তুলনায় তাঁকে আরও বৃদ্ধা মনে হয়। থল্‌থলে মাংসের ভারী চেহারা। রং ধবধবে ফর্সা, মাথার চুল সবই সাদা হয়ে গেছে। হাঁটুতে বাতের ব্যথার

জন্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেন, পরনে চওড়া লালপাড় সিল্কের শাড়ি, গায়ে কাশ্মিরী আলোয়ান, সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুরটানা এবং কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা।

তাঁরা প্লাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে যেতেই মন্টু, ভোঁদা, হারু, আশপাশের সব দোকানদার এবং পাড়ার লোকেরা সব ভিড় করে দাঁড়ালো। সুস্মিতাকে তাঁদের সঙ্গে না দেখে, তারা সব চুপ, কারও মুখে কথা নেই।

ওঁদের দেখে রিক্সাওয়ালা 'সুলতান' এগিয়ে এসে বলল 'দাদু, আসুন, বাড়ী পেঁছে দি।'

তাঁরা রিক্সায় চাপলে সুলতান বলল—'ঠাকুমা ভালো করে ধরবেন, মাঝে মাঝে রাস্তা খারাপ আছে, পড়ে যাবেন না যেন!' এই বলে পঁ্যাক্ পঁ্যাক্ আওয়াজ তুলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল।

বাদল সুলতানকে বলল—'আস্তে আস্তে চালা।'

প্রিয়নাথের বাড়ী স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়, মধ্যবিত্ত পাড়ায়, পাড়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় রিক্সার পঁ্যাক পঁ্যাক আওয়াজ শুনে পাড়ার লোকজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়েছে, দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে সুস্মিতাকে না দেখে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। একটা অজানা আশঙ্কায় তাদেরও বুক দুড়দুড় করতে লাগল। সুস্মিতা তাদের সকলেরই স্নেহভাজন।

প্রিয়নাথের বাড়ী আধুনিক ডিজাইনের। দু কুঠুরী পাকা ঘর, সংলগ্ন রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা, সামনে ছোট উঠান। বাড়ীর গেট থেকে, ঘরে যাবার রাস্তার দুধারে—গোলাপ, রজনীগন্ধা এবং নানা ধরনের সিজন ফ্লাওয়ার রুচির পরিচয় বহন করছে। কিন্তু আজ ঐ গোলাপ রজনীগন্ধার গন্ধে আনন্দ নেই, আছে—বিষাদ। ফুলও যেন সব বুঝে তাদের গন্ধ লুকিয়ে রেখেছে।

বাড়ীর গ্রীল গেটের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে সুলতান পঁ্যাক পঁ্যাক আওয়াজ দিতেই পাড়া-প্রতিবেশীরা চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে বাড়ীর মধ্যে পেঁছে দিল।

চন্দ্রনাথবাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে প্রিয়নাথের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া

মরিবাঁচি করে ছুটে ঘর থেকে বাইরে চলে এলো অনেক আশা নিয়ে কিন্তু সুস্মিতা ছাড়া ওঁদের দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল—'বাবা! আমার কি সর্বনাশ হল!' সে ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স বছর ত্রিশ হবে। পাতলা ছিপছিপে চেহারায় দুধে আলতা মেশানো রং আর একমাথা কালো কোঁচকানো চুলে তাকে লক্ষ্মীপ্রতিমার সঙ্গে তুলনা করত পাড়ার লোকে। কিন্তু আজ খোলা চুলে, রঙিন তাঁতের শাড়ী-পরা আলুথালু বেশে তার সৌন্দর্যের সবটুকুই অন্তর্হিত। মেয়ের চিন্তায় সারারাত উপবাসী থেকে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন তার সারা মুখে ফুটে রয়েছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। চোখের জলের দাগ দুই গালে। বিষাদক্লিষ্ট সারা মুখে সর্বহারার চিহ্ন পরিস্ফুট।

সন্ধ্যারাণী এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয় তাঁর একমাত্র ছেলে। তাঁর অতি আদরের নাত্‌নী সুমুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সোনার প্রতিমা বৌমার এহেন অবস্থা। তিনি এসব চিন্তা করতে করতে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। সেটা কিছুক্ষণের জন্য। হুঁশ হতেই, তিনি ভুলুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসাবার চেষ্টা করলেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে তাঁর চোখ দিয়েও ফোঁটাফোঁটা জল পড়তে লাগল।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'বৌমা! ওঠ!' দুফোঁটা চোখের গরম জল বিষ্ণুপ্রিয়ার গায়ের ওপর পড়ল।

সহানুভূতির পরশ পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

প্রিয়নাথ একটা কাপড় দুভাঁজ করে পরে পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল—'তুমি ওভাবে আর কেঁদ না। অসুখবিসুখ করবে যে। মনকে শক্ত কর।' এই বলে নিজেই হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল।

চন্দ্রনাথবাবু জানালার ধারে বাইরে মুক্ত আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে—কাঠপুত্তলিকার মত দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে সমস্যা সমাধানের উপায়ের চিন্তা, এদের সকলকে কাঁদতে দেখে, তিনি

সন্ধ্যারাণীকে বললেন—'তুমি কোথায় ওদের সান্ত্বনা দেবে, তা নয়, তুমিই নিজেই কাঁদতে বসলে!' ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রিয়! কান্না থামা, কান্নার দিন অনেক আছে। বাড়ীর বাইরে গিয়ে খোঁজখবর নে, যোগাযোগ কর। মেয়েটাকে তো খুঁজে বার করতে হবে।'

নতুন করে কান্নার আওয়াজ শুনে পাশের সব বাড়ী থেকে শান্তি, সরলা, যূথিকা, পঞ্চি—সবাই এসেছে এদের প্রবোধ দিতে। শান্তি রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে চা করতে গেল চন্দ্রনাথবাবু ও সন্ধ্যারাণীর জন্য। শান্তির এ ঘরের সব জিনিসই চেনা।

বাড়ীর ঝি 'গণাবুড়ী' ঘাটে বাসন মাজতে গিয়েছিল, ঝুড়িতে মাজা বাসন নিয়ে বাড়ীতে হাজির হল।

উঠান ভর্তি লোক। উঠানে রোদ এসেছে, শীতের রোদ আরামদায়ক কিন্তু সে আরাম উপভোগের অনুভূতি কারো নেই।

শান্তি প্রিয়র বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী। সে স্বামী পরিত্যক্তা। অনেকদিন ধরে বাপের বাড়ীতেই আছে। পাড়ার মেয়েদের নিয়ে মহিলা সমিতি গড়ে তুলে, পণপ্রথা বিরোধী, বধূ নির্যাতন এবং শিশু ও নারীদের অধিকার নিয়ে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠনের কাজ করে।

সে এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথবাবু এবং সন্ধ্যারাণীর পদধূলি গ্রহণ করে। ভূলণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাশে বসে বলল—'হ্যাঁ-লা! এমনি করে কান্নাকাটি করলে হবে? উঠে বোস।' শান্তির ইঙ্গিতে সরলা, যূথিকা, পঞ্চি এগিয়ে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে খাড়া করে বসিয়ে দিল। শান্তি চন্দ্রনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো—'জ্যাঠামশাই! আপনি কি কাল রাতেই খবর পেয়েছেন?'

চন্দ্রনাথ বললেন—'হ্যাঁ, খবর পেয়েই বুঝেছি—কোন মিসক্রিয়ান্ট ওকে ধাপ্পা দিয়ে নিশ্চয়ই কিডন্যাপ করেছে। আমি ঘটনাটা লালবাজারে জানিয়েছি এবং ভবানী ভবনেও ফোনে সংবাদ দিয়েছি।' প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুই অফিস যাবার পথে দিদিভাইকে স্কুলে পেঁছে দিয়েছিলি তো?' প্রিয়নাথ কান্নার আবেগ সামলে নিয়ে বলল—'আমি রিক্সা থেকে তাকে স্কুলের

গেটের সামনে নামিয়েছি। ও স্কুলের গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই, আমি ঐ রিক্সাতেই স্টেশন চলে আসি।'

চন্দ্রনাথ—'সেই সময় রাস্তায় কোন প্রাইভেটকার আসতে দেখেছিলি বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে?'

প্রিয়নাথ—'যতদূর মনে পড়ে—ঠিক সেই সময় কোন গাড়ী আমার নজরে পড়েনি, তবে বাগবাজারের মোড় পার হয়ে ফটক-গোড়ায় যখন গেছি—সেই সময় একটা কালো রংয়ের প্রাইভেট গাড়ীকে আমার পাশ দিয়ে খুব জোরে চলে যেতে দেখেছি।'

শান্তি বললো—'জ্যাঠামশাই, আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, ঐ চেয়ারে বসুন। প্রিয়দা, তুমি ঐ মোড়াটায় বসে ওঁর সঙ্গে কথা বলো।' চন্দ্রনাথবাবু এবং প্রিয়নাথ বৈঠকখানায় চলে গেলেন এবং দুজনে দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

ঠিক সেই সময় বাড়ীর গেটের সামনে রাস্তায় একটি কার ও একটি জীপ এসে দাঁড়ালো, গাড়ীর আওয়াজ শুনে প্রিয়নাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কার থেকে পুলিশ সুপার এবং জীপ থেকে সি. আই এবং ও. সি নামলেন। একজন কনস্টেবল গেটের কাছে এগিয়ে এসে ডাকল—'প্রিয়নাথবাবু বাড়ী আছেন?'

প্রিয়নাথ এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল—'আমার নামই প্রিয়নাথ।' অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের সকলকে বৈঠকখানায় নিয়ে সোফায় বসালেন। তাঁদের ঘরে ঢুকতে দেখে চন্দ্রনাথবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রিয়নাথ চন্দ্রনাথবাবুর পরিচয় দিলেন—'উনি আমার বাবা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দে, রিটায়ার্ড ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ্ হোম পুলিশ।'

চন্দ্রনাথবাবু হাতজোড় করে তাঁদের নমস্কার জানালেন। তাঁরাও প্রতিনমস্কার জানালেন।

পুলিশ সুপার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—'আমি বিশ্বজিৎ সান্যাল। এস. পি. হুগলী, আমি আপনার নাম এর আগেই শুনেছি এবং এর আগে আপনাকে দেখেওছি।' অন্যান্যদের পরিচয় দিলেন। 'উনি মণি ঘোষদস্তিদার—সি. আই. সদর। আর উনি মহাদেব ব্যানার্জী ও. সি পাণ্ডুয়া।'

পরস্পর পরস্পরকে হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

শান্তি টেবিলের উপর কাপ ডিস সাজিয়ে চা এবং বিস্কুট পরিবেশন করল সকলকে।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন—'আপনারা আগে চা খেয়ে নিন, তারপর কথা হবে।' চা খেতেখেতেই পুলিশ সুপার বললেন—'স্যার! গতকাল লালবাজার থেকে খবর পেয়েই আমি এসেছি, আপনি লালবাজারে ফোন করেছিলেন।'

চন্দ্রনাথ—'হ্যাঁ! আমি পুলিশ কমিশনারকে ব্যাপারটা জানিয়েছি, এখান থেকে লোক গিয়ে খবর দিতেই বুঝেছিলাম, নিশ্চয়ই একটা মিসহ্যাপ হয়েছে। কিডন্যাপের ব্যাপার সন্দেহ হওয়ায়, দ্রুত স্টেপ নেওয়ার জন্য লালবাজারে ফোন করে অনুরোধ করেছিলাম।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটি টেবিলে রেখে মিঃ সান্যাল বললেন, 'ঠিক কি ঘটনা হয়েছে বলুন তো?'

চন্দ্রনাথ—'আমার ছেলে প্রিয়নাথ বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে দিতে পারবে।' এই বলে প্রিয়নাথকে ঘটনা বলতে বললেন।

প্রিয়নাথ কথা বলতে গিয়ে তার দুচোখ বেয়ে যেন জল গড়িয়ে পড়ল, ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে উঠল—কথা বলতে পারল না।

মিঃ সান্যাল—'ভয় নেই, মনকে শক্ত করুন, ভেঙে পড়লে হবে না।' পুলিশের গাড়ী দেখে পাড়ার লোক বাড়ীর উঠানে ভিড় জমিয়েছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ওদের এখান থেকে একটু চলে যেতে বলুন।'

প্রিয়নাথ তাদের চলে যেতে অনুরোধ করলে তারা আস্তে আস্তে সরে গেল।

মিঃ সান্যাল—'প্রিয়বাবু, এবার বলুন ঠিক ঘটনাটা কি ঘটেছে?'

প্রিয়নাথ গতদিনের ঘটনা সবিস্তারে মিঃ সান্যালকে জানাল।

মিঃ সান্যাল—'এফ. আই. আর করেছেন?'

মিঃ দস্তিদার—'থানায় গতকাল রাতে একজন জি. ডি করেছেন।'

মিঃ ব্যানার্জী—'হ্যাঁ স্যার, একজন জি. ডি করেছেন। জি. ডি টাকেই ফার্ষ্ট ইনফরমেশন ধরে কাজ করছি।'

মিঃ সান্যাল ধমক দিয়ে বললেন, 'এতবড় ঘটনা, অথচ অফ. আই. আর. না করেই ইনভেষ্টিগেশন শুরু করেছেন? আপনি তো মোকর্দমা শেষ করে দেবেন। আজই প্রিয়নাথ বাবুর এজাহার নিয়ে এফ. আই. আর করে নিন।'

সন্ধ্যারানীও ঐ সময় বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন; বললেন—

'পুলিশ সাহেব! আপনি দয়া করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে দিন।' মিঃ সান্যাল—'আপনার বৌমাকে ডাকুন'। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকবার জন্য তিনি ভিতর বাড়ীতে চলে গেলেন। গণাবুড়ি বাড়ীর ঝি, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। টেবিল থেকে এঁটো কাপ ডিস নিতে এলে, মিঃ সান্যাল তার দিকে তাকালেন, দেখলেন সে কান পেতে সব কথা শুনছে এবং যেন ভয়ে ভয়ে থম্‌কে থম্‌কে কাপ ডিস তুলছে।

প্রিয়নাথ কাগজ ও পেন নিয়ে টেবিলের সামনে বসলেন, এফ. আই. আর লেখার জন্য। তার হাত কাঁপছে, কি লিখবে ভেবে পাচ্ছে না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে ও. সি. মিঃ ব্যানার্জী বয়ান বলতে লাগলেন, শুনে শুনে প্রিয়নাথ লিখতে আরম্ভ করলেন। মনমত না হতেই, মিঃ ঘোষদস্তিদার বাধা দিয়ে বয়ান পাল্টাতে বললেন। একবার লেখা হয় আবার কাটা হয়। এইভাবে এফ. আই. আর লেখা শেষ হল।

সন্ধ্যারানী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে করে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন—'এইই মেয়ের মা। মেয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে, এর মেয়েটিকে আপনি উদ্ধার করে দিন, তা না হলে নির্ঘাত মরে যাবে।'

মিঃ সান্যাল—'আপনি মেয়ের মা, এরকমভাবে কাঁদলে হবে না। আপনার মনকে শক্ত করতে হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনার মেয়েকে আমরা উদ্ধার করবই করব। আপনাকেও মনের সঙ্গে লড়াই করে ধৈর্য্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, দুষ্কৃতকারীরা ধরা পড়ে সাজা পায়, সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান। ভেঙ্গে না পরে তাই আপনার মনকে প্রবোধ দিয়ে লড়াই করতে হবে, বুঝলেন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটার ভিতর থেকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, মিঃ সান্যাল বললেন—'মেয়ের একটা ছবি দিন, আমরা কাগজে ছাপাব, টি. ভি. তে প্রচার করব। মেয়ে যেখানেই থাকুক না কেন যে কোনও মাধ্যম থেকে খবর পেয়ে যাব, তখন তাকে উদ্ধার করতে কোনও অসুবিধা হবে না। সন্ধান পেলেই আপনাদের খবর দেব। আপনাদের গিয়ে বলতে হবে মেয়েটি আপনারই কি না? শুধু কাঁদলে হবে না।' বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং মেয়ের ফটো আনার জন্য ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুললেন। অ্যালবাম সেখানেই রাখা থাকে, কিন্তু ড্রয়ারের ভিতর অ্যালবাম নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'অ্যালবাম কোথায়? এইখানেই তো রেখেছিলাম।'

প্রিয়নাথকে উদ্দেশ করে বললেন—'তুমি কি অ্যালবামটা রেখেছ?'

প্রিয়নাথ বৈঠকখানা থেকে এসে বলল—'আমি কেন রাখতে যাব? আমি তোমাদের ড্রেসিং টেবিলে হাতই দিই না।'

অন্যসব জায়গা খুঁজে দেখ, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে, উড়ে তো আর যাবে না। কোথাও গোঁজা আছে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া চারিদিক খুঁজতে থাকে। ছোট খাটো জিনিস নয়, একটা বড় সাইজের অ্যালবাম, তাতে যাবতীয় ছবি আছে। গেল কোথায়? কোথাও খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘরের মেঝেতে বসে পরলেন। কাউকে দিয়েছেন কিনা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গণাবুড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া গণাবুড়িকে জিজ্ঞাসা করল—'মাসি! এইখানে যে ছবির বইটা ছিল—সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি জান কোথায় আছে?'

গণাবুড়ি কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে।

গণাবুড়িকে বিষ্ণুপ্রিয়ার জিজ্ঞাসাবাদ এবং তার নীরবতা মিঃ

সান্যাল এবং অপরাপর পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মিঃ সান্যাল বললেন—'ওকে এখানে নিয়ে আসুন।'

মানসিক দুর্বলতা এতক্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়ার মন এবং শরীরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ; গণাবুড়ির মুখের চেহারা এবং অশ্রুজল দেখে তারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। সে গণাবুড়িকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এস পি সাহেবের সামনে হাজির করল।

প্রিয়নাথ বলল—'এ আমাদের বাড়ীর ঝি। জন্মাবধি ওর ঠোঁট কাটা, গণা সুরে কথা বলে, তাই সবাই ওর কথা বুঝতে পারে না। বহুদিন থেকে আমার বাড়ীতে কাজ করছে। বাড়ীর সব কিছুই ও দেখাশুনা নাড়াচাড়া করে, কোন জিনিস নড়চড় হয় না।'

মিঃ সান্যাল—'আপনি থামুন।' তারপর গণাবুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই বুড়ি! মেয়েটার ফটোগুলো কি করেছিস বল, না হলে আজ আর তোর রেহাই নেই।' এই বলে, একটা ছোট লাঠি তুলে তাকে মারতে উদ্যত হলেন।

গণাবুড়ি উঠান লাঠি তার পিঠে পড়বে এই আশঙ্কায় ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

শান্তি—'আমার মন বলছে, অ্যালবামটার বিষয়ে গণা নিশ্চয়ই কিছু জানে, তা না হলে কোন উত্তর দিচ্ছে না কেন ?'

মিঃ দস্তিদার—'মিঃ সান্যালের কাছ থেকে লাঠিটা নিয়ে খপ করে গণা বুড়ির একটা হাত ধরে লাঠিটা ঘরের মেঝেতে বার দুই ঘা মেরে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—'বল বুড়ি! মেয়েটার ফটো তুই কোথায় রেখেছিস ? না বললে তোর হাড় মাস আলাদা করে দেব।'

গণা চিৎকার করে কুঁজো হয়ে গেল, যেন লাঠিটা তার শরীরের উপরই এসে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল—'ইব্রাহিমে দ্যাখতে চ্যায়েছিল, আমি তারে দিয়েছি।'

ঘোষদস্তিদার—'কবে দিয়েছিস ?' গণা—'আজ চারদিন হল।'

ঘোষদস্তিদার—'ইব্রাহিম চাইল, আর তুই মণিবদের না জানিয়ে তাকে দিয়ে দিলি ? ছবিগুলোর বদলে ইব্রাহিম তোকে কি দিয়েছিল ?'

গণা—'আমারে পাঁচ টাকা দ্যাছিলো।'

মিঃ ঘোষদস্তিদার পুলিশের লোক, তাঁর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হল না। বুড়ির পিঠে লাঠির একঘা বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি চল ইব্রাহিমের সঙ্গে মোকাবিলা করে ছবিটা ফেরৎ নিয়ে নিবি।'

মিঃ সান্যাল—'ওকে জীপে ওঠাও।'

দাঁড়িয়ে থাকা কনষ্টেবলরা গণাবুড়িকে গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসাল।

চন্দ্রনাথ—'আমি জানতাম, বাড়ীতে চুরি ডাকাতি বা অন্য কিছু ক্রাইমের ঘটনার সঙ্গে বাড়ীর চাকর-ঝি-দারোয়ান কেউ না কেউ জড়িত থাকে।'

শান্তি—'বুড়িকে তোমরা আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ। ওর পেটে পেটে ঐ রকম বদ বুদ্ধি!'

মিঃ সান্যাল—'দেখি এফ. আই. আর. এ কি লিখলেন?'

প্রিয়নাথের হাত থেকে নিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে একটা অংশ দেখিয়ে বললেন—'এটা কি লিখেছেন? এই ব্যাপারে আমি কাউকে সন্দেহ করছি না!'

প্রিয়নাথ—'আমার ক্ষতি করতে পারে, এমন কাউকে তো আমার সন্দেহ হচ্ছে না।'

শান্তি—'গণা কি বললে শুনতে পাওনি? ইব্রাহিম ওর কাছ থেকে অ্যালবামটা নিয়েছে। মনে নেই? ঐ ইব্রাহিম হিরুকে গুলি করেছিল বলে, তুমি তার কাছ থেকে বন্দুক কেঁড়ে নিয়েছিলে?' ও' বলেছিল—তোমাকে দেখে নেবে। তুমি যাই বল প্রিয়দা! আমি স্থির নিশ্চিত—ইব্রাহিম এর মধ্যে জড়িত!'

প্রিয়নাথ—'হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঘটনাটা মনে পড়েছে। বালিখাদ খনন বিরোধী আন্দোলনে, ইব্রাহিম এবং অন্যান্য খাদ মালিকদের সংঘর্ষ হয় এবং ইব্রাহিম প্রকাশ্যে হিরুকে গুলি করে। আমি বন্দুক কেড়েনি। পুলিশ কেস হয়েছিল, কিন্তু সেসনে ঐ মোকর্দ্দমায় ইব্রাহিম খালাস পায়। ওরা আমাকে দেখে নেব বলেছিল।'

মিঃ সান্যাল—'তাহলে এফ. আই. আরটা ঠিকমত লিখে দিন।' তারপর প্রিয়নাথের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'মিসেস দে!

আপনার মেয়ের অন্য কোনও ফটো থাকলে দিন। সংবাদপত্র এবং টি. ভি. তে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্মিতার সহপাঠিনীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। একটা ফটো বিশেষ প্রয়োজন।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে পড়ল—বাক্সের মধ্যে ফটোর নেগেটিভগুলো আছে। বাক্স খুলে একটু খুঁজতেই একটা খামের মধ্যে নেগেটিভগুলো পেয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—ঐ খামটা নিয়ে এসে মিঃ সান্যালের হাতে দিয়ে বলল, 'এতে সুস্মিতার একক এবং গ্রুপ ফটোও আছে, কাজ হবে কি ?'

মিঃ সান্যাল—'নিশ্চয়ই হবে, খুব ভাল কাজ হবে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'আপনাদের কাজ হয়ে গেলে, ঐগুলো ফেরৎ দেবেন। মেয়ের এবং আমার খুব সখের ফটো। হারিয়ে গেলে বা বেহাত হলে মুস্কিলে পরব। অন্য কেউ চাইলে দিতাম না।'

মিঃ সান্যাল—'মিঃ ঘোষদস্তিদার! আপনি আজই এ থেকে প্রিন্ট করে নিয়ে মিসেস্ দেকে ওঁর মেয়ের একটা কপি এবং অন্যান্য নেগেটিভগুলো ফেরৎ দেবেন। বাকি কপি ভবানী ভবন মিসিং স্কোয়াড, নামকরা সব সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

মিঃ সান্যাল প্রিয়নাথকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'কই প্রিয়নাথবাবু! আপনার লেখা হল? দেখি কি লিখলেন? প্রিয়নাথের কাছ থেকে লিখিত এজেহার দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনি যে লেখক তা লিখে আর একটা সই করে দিন। তারিখটা কিন্তু গতকালেরই দেবেন। তাহলে আমরা এখন উঠলাম স্যার।' এই বলে চন্দ্রনাথবাবুর করমর্দ্দন করে সকলে বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলেন।

ঠিক সেই সময় গেটের কাছে একটি গাড়ী এসে দাঁড়াল। দুজন মাঝবয়সী ফরসা রংয়ের ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে, পুলিশ অফিসারদের দেখে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মিঃ সান্যাল—'কি ব্যাপার রথীনবাবু, অলোকবাবু কোন সূত্রে খবর পেয়ে এখানে এলেন ?'

রথীনবাবু—'খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। তাই সংবাদ-

পত্রের তরফ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য এসেছি।'

অলোকবাবু—'স্যার, এই ব্যাপারে আপনি যদি কোন ব্রিফিং করেন!'

মিঃ সান্যাল মনে মনে ভাবলেন, এদের পিছনে লেগে কাজ করা যাবে না। তাই এদের দিয়ে হৈ চৈ এর কাজটা করিয়ে নিতে হবে। বললেন, 'সুস্মিতা নামে একটি স্কুল গার্ল গতকাল চন্দননগর সেন্ট জনস্ স্কুল থেকে মিসিং। তার কোনও ফটো নেই, এইখানে নেগেটিভ্ আছে।' নেগেটিভ বার করে দেখালেন।

রথীনবাবু তাঁর নোটবুকে সব নোট করতে লাগলেন।

মিঃ সান্যাল—'তবে দেখবেন সংবাদটা যেন বিকৃত না হয়ে আপনাদের কাগজে বেরয়। বহুক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। আশাকরি এই মেয়েটির ক্ষেত্রে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাব।'

মিঃ সান্যাল তাঁর দলবলসহ গেটের বাইরে চলে এলেন। রথীন, অলোকবাবুও ওঁদের পিছু এলেন।

রথীন—'স্যার গাড়ীতে একজন বৃদ্ধাকে দেখছি। ও কি অ্যারেষ্ট হয়েছে?'

মিঃ সান্যাল—'ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

অলোকবাবু গাড়ীতে গণাবুড়ীর একটা ফটো তুলে নিলেন।

মিঃ সান্যাল, মিঃ ঘোষদস্তিদার ও মিঃ ব্যানার্জী যে যাঁর গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন।

গণাবুড়ী গাড়ীতে বসে আধোমুখে কাঁদছে।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর অলোক ও রথীনবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া গাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রথীনবাবু অলোকবাবুকে বললেন—'যেটুকু ওরা বলে গেলেন তাতে ঘটনার কিছুই পরিস্কার নয়। ঘটনার বিশদ বিবরণ জানা দরকার।'

অলোকবাবু—'ঐ বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে গেল। এই ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই বুড়ি জড়িত। সব কিছু জানতে গেলে, গৃহকর্ত্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। চল বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক।'

তাঁরা আবার বাড়ীর ভিতর এলেন। পাড়ার লোকও সেখানে

জমায়েত হয়েছে প্রচুর।

বৈঠকখানায় গিয়ে প্রিয়নাথবাবুকে দেখতে পেয়ে নমস্কার জানিয়ে বসার অনুমতি নিলেন এবং তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ বললেন যে তিনি নিখোঁজ মেয়েটির বাবা।

রথীনবাবু—'আমরা খবরের কাগজের লোক। খবর পেয়ে এসেছি, সঠিক খবর সংগ্রহের জন্য। আগামীকালই কাগজে ছাপা হবে। তাতে আপনার মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার একটা প্রথম পদক্ষেপ জানবেন।'

প্রিয়নাথ—'কি খবর জানতে চান বলুন ?'

রথীন—'আপনার মেয়ের কোনও ঘনিষ্ঠ বয় ফ্রেণ্ড আছে ?'

প্রিয়—'না। পাড়া এবং গ্রামের সকলেই তাকে খুব ভাল মেয়ে বলেই জানে। বাড়ীতে আমরা সকলেই মেয়ের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করি।'

রথীন—'মেয়ে যখন বাড়ীর বাইরে থাকে, তখন তো আপনাদের সে সুযোগ নেই। সেই সময়ে কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে।'

প্রিয়—'না, তাও সম্ভব নয়। আমি অফিস যাবার সময় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছেদি। ছুটির পর এখনকার অন্যান্য বান্ধবীর সঙ্গে সে ফিরে আসে। সে রকম কিছু থাকলে কানাঘুষায় শুনতে পেতাম।'

রথীন—'ঈশ্বর না করুন, যদি এটা কিডন্যাপের ব্যাপার হয়,—আপনারা কাউকে সন্দেহ হয় ?'

প্রিয়নাথের সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিমের কথা মনে হল। তার মন বলল এঁদের কাছে তা বলা ঠিক হবে না। বললেন—'জ্ঞানতঃ আমার কোন শত্রু নেই। সুতরাং সন্দেহ কাকে করব' ?

রথীন—'দেখুন' প্রিয়বাবু! পুলিশের জেরায় যন্ত্রণা বেশী, গোদের উপর বিষফোঁড়া। জেরা করে যার কাছে যা খবর পেল তা সংগ্রহ করে চলে গেল। ঐ পর্য্যন্তই। তারা মনে করে তাদের কর্তব্য শেষ হল। পরবর্তী পদক্ষেপ তারা কি নেবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে।' এই কথা বলে তাঁরা উঠে পরলেন।

যাবার সময় প্রিয়নাথকে সমবেদনা জানিয়ে গেলেন, বললেন,

'সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ করে তা জনসাধারণের নজরে আনা হবে, তাতে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার এবং মন্ত্রীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এবং পুলিশ অফিসাররা এ ব্যাপারে তৎপর হতে বাধ্য হবে।'

তের

জীপ্ গাড়ী থানায় ফিরে এল, মহাদেব ব্যানার্জী, মণি ঘোষদস্তিদার গণাবুড়ি ও রামজীবন দারোয়ানকে থানায় হাজির করল। ওরা জীপ গাড়ী থেকে নেমে থানায় বসল মহাদেব ব্যানার্জী একজন কনষ্টেবলকে চা সিঙ্গারা আনতে বললেন। হিমাংশু কনষ্টেবল চা সিঙ্গারা আনতে গেল।

ঘোষদস্তিদার গণাবুড়ি ও রামজীবন দারোয়ানকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের অ্যারেষ্ট করিনি তোমরা যে কথাগুলো আমাদের কাছে বলেছ সেই কথাগুলো তোমাদের হাকিমের কাছে বলতে হবে। হাকিম তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন হ্যাঁ বলবে।' হিমাংশু চা সিঙ্গারা নিয়ে এল। মিঃ ব্যানার্জী, হিমাংশুকে বলল, 'সবাইকে চা সিঙ্গারা দিয়ে দাও।' হিমাংশু একটা শালপাতা করে সবাইকে গরম সিঙ্গারা দিল। মিঃ ঘোষদস্তিদারকে ও মিঃ ব্যানার্জীকে ডিসে করে সিঙ্গারা দিল। সকলকে মাটির ভাঁড়ে চা দিল। কেবল মিঃ ব্যানার্জী ও ঘোষদস্তিদারকে কাপে করে চা দিল।

মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'বুড়ি চা খেয়ে নাও, দারোয়ানজী চা, পিজিয়ে।'

গণাবুড়ি, 'আমায় ছেড়ে দে বাপ আমি ঘর যাই, আমি তো কিছু করিলাই।' মিঃ ব্যানার্জী, 'আগে খেয়ে নাও পরে কথা হবে।' মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'তোকে কেউ মেরেছে ?'

গণাবুড়ি—'না !'

মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'তাহলে তুই অমন করছিস কেন ?'

রামজীবন, 'হামিতো আপকো বোলা হ্যায় গাডি কা লম্বর দে দিয়া, তব কাহে হামশে পাকড় লিয়া !'

মিঃ ঘোষদস্তিদার—'আপযো বোলা হ্যায় ও বিলকুল ঠিক

হ্যায়। ওহি বাত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কো পাস বোলনে হোগা। এহি কানুন হ্যায়, সমজ্‌গিয়া।' রামজীবন—'হাঁ, জী!'

গণা বুড়ি 'আমি তো বলেছি ফটগুলো আমার কাছ থেকে ইব্রাহিম লিয়েছে, উহার বাড়ীটাও দ্যাখায়ে দিলাম, ওর বাপের সাথে তুর কথা হল। আমি তো ভজিয়ে দিলাম। তবে ঘরকে যাই। 'মিঃ ব্যানার্জী, 'আচ্ছা তাই হবে, এখন চা সিঙ্গারা খেয়ে নাও।'

গণাবুড়ি ও রামজীবন চা সিঙ্গারা খেতে আরম্ভ করল।

মিঃ ব্যানার্জী, 'সেন্ট্রি, হাজতীদের বার করে কোর্টে চালান করতে হবে। এই জীপে করে এদের দুজনকেও নিয়ে যাবে। এদের কোন রসি দেবে না, হাতকরা দেবে না। এরা সাক্ষী বুঝেছ। রামবিলাসবাবু কোন্ কোন্ কনষ্টেবল যাবে ওদের কমান্ড করে দিন, আর কাগজপত্র সব গুছিয়ে দিন।'

একজন মহিলা কপালে রক্ত ঝরা অবস্থায় থানায় এসে হাজির, 'দারোগাবাবু আমায় আমার সোয়ামী মেরেছে। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে, দেকাঠি মারতে যাবে দেখে আমি পালিয়ে এসেছি।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'তুমি কি করেছিলে?' মহিলা, 'আমি ওকে পদিন মায়ের কাছে যেতে বারন করেছিলাম। সেই রাগে আমায় মেরেছে।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'হাঁক দিয়ে বললেন, ব্রজবাবু ওর একটা ডায়েরী করে নিন, একজন হোমগার্ড পাঠিয়ে ছোঁড়াকে ডাকিয়ে নিয়ে আসুন।'

রামবিলাস, 'দুজন হাজতী আছে, ওদের ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট তৈরী করেছি, আপনি সই করে দিন, এফ, আই, আর পাঠাচ্ছি।' মিঃ ব্যানার্জী, 'এই এফ আই. আর এই দুইজনেই হানড্রেড সিক্সটি ফোরের জবানবন্দী দেবে এইভাবে ফরওয়ার্ড করে দিন।' এদের কোন হাতকড়া লাগাবেন না।'

রামবিলাসের হাতে প্রিয়নাথের লিখিত এফ. আই. আর এজেহার মিঃ ব্যানার্জী জমা দিলেন।

মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'ওটা এক্ষুনি লিখে নিয়ে আসুন—আমি দেখে পাঠাতে চাই।'

হিমাংশু, 'স্যার আর টি ঘরে একবার যান, বড় সাহেব. সি. আই, ও

ও. সির সঙ্গে কথা বলবেন, ডাকছেন।'

মিঃ ব্যনার্জী, 'কাগজ পত্রে সই করতে করতে আর পারা যায় না, এই থানার যা চাপ।' সামনের ফোন উঠাল। মিঃ ব্যানার্জী ফোনের রিসিভার তুলে ধরলেন, 'হ্যালো পাণ্ডুয়া থানা বলছি।'

সিমলাগড়ের কালিতলায় কখন এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কতক্ষণ লরি জ্যাম হয়েছে?'

মিঃ ব্যানার্জী, 'হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্রাম প্রধান জানাচ্ছেন। আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।' বলে ফোন রেখে দিলেন। 'এই হোমগার্ড কে আছে। ব্রজবাবু দুজন হোমগার্ডকে আপাতত ট্রেনে করে সিমলাগড়ে পাঠিয়ে দিন।'

মিঃ ব্যানার্জী ও ঘোষদস্তিদার উঠে আর টি ঘরে গেলেন। আর টি ঘরে কার্তিক অপারেট করল, লাল সবুজ আলো জ্বলে উঠল। 'ও· সি পাণ্ডুয়া কলিং চিন্‌চুরা হেড কোয়াটারস,' —ওভার।

উত্তর এল, 'হেডকোয়াটারস স্পিকিং, সি-আই আছেন।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'সি. আই. রয়েছেন।' সি· আই কে দিন, কথা বলুন বড় সাহেবের সঙেগ কথা বলুন। মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'হ্যালো, সি. আই. মিঃ ঘোষদস্তিদার স্পিকিং স্যার।'

মিঃ সান্যাল, 'এস. পি স্পিকিং, কতদূর কি হল?'

মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'আপনার কথামত দারোয়ান রামজীবনকে পেয়েছি। ও গাড়ীর নম্বর ওর গেটে ইটের টুকরো দিয়ে দেওয়ালে লিখে রেখেছিল, W M T 390 ও যা জানে তাই বলেছে, আসামীর চেহারা, রং, বয়স, যা বলেছে তার সঙেগ গণাবুড়ির ষ্টেটমেন্টের মিল আছে। ওদের এখুনি চুঁচুড়া কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাচ্ছি স্যার, ওভার।' মিঃ সান্যাল, 'ইব্রাহিম কোথায়?' মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'ও বাড়ী নেই, ওর বাবার সঙেগ দেখা করে জেনেছি ও মুম্বাই গেছে।' মিঃ সান্যাল, 'ওর বাবাকে থানায় এনে জেনে নিন, কোথায় গেছে, কার সঙেগ গেছে আর ওর সঙেগ কে গেছে। কোন গাড়ীতে গেছে।—বুঝলেন।'

মিঃ ঘোষ দস্তিদার, 'হ্যাঁ স্যার।'

মিঃ সান্যাল, 'গাড়ীটার ব্যাপারে খোঁজ পেয়েছেন।'

মিঃ ঘোষ দস্তিদার, 'স্যার এখনও আমি বার করতে পারিনি।'

মিঃ সান্যাল, 'আজই ভবানী ভবনে মিসিং স্কোয়াডে ছবি পাঠান। যাতে রেডিও ও দূরদর্শনে প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করুন। আর ইব্রাহিম কোথায় ওর বিষয় জেনে আজই সন্ধ্যায় আপনি আমার সঙ্গে দেখা করুন।—ওভার।'

হিমাংশু, 'মেজবাবু জানালেন স্যার গাড়ী আসামী নিয়ে রেডী, রওনা দেবে কিনা? মিঃ ব্যানার্জী, 'মেজবাবুকে বলে দাও, এখুনি আসামী পাঠিয়ে দাও।'

মিঃ ঘোষদস্তিদার, 'আসুন মিঃ ব্যানার্জী, বড়সাহেবের সঙ্গে কথা হল, ইব্রাহিমের বাবাকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে ওর কাছে থেকে আপনাকে সব জেনে নিতে হবে। আজই সন্ধ্যায় বড় সাহেবকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আমি অন্যান্য কাজের জন্য এখুনি চলে যাব। ইনভেষ্টিগেসন খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেরী করা যাবে না।' মিঃ ব্যানার্জী, ঘাড় নেড়ে সব বুঝেছেন, জানালেন। মিঃ ঘোষ-দস্তিদার, নিজের জিপে গিয়ে বসলেন। জিপ ষ্টার্ট দিল, মিষ্টার ঘোষদস্তিদার চলে গেলেন। মিঃ ব্যানার্জী, নিজের চেয়ারে এসে বসলেন, কাগজপত্র হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'ব্রজবাবু! ও ব্রজবাবু ওয়ারেন্ট গুলো, কে দেখেন।'

ব্রজ, 'পরেশবাবু।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'তিনি কোথায়?'

ব্রজ, 'ছুটিতে।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'কোর্টের অর্ডার দেখেছেন?' শোকজ করেছে। থ্রু এস. পি. জবাব চেয়েছে। ওকে খবরটা জানিয়ে দিন। সি. জি. এসের ঘরে তিনশো ছাব্বিশের কেশটার চার্জসীট না দিলে আসামী কেন খালাস হবে না, আদালত জানতে চেয়েছে, ওটার চার্জসীট হতে বাকী আছে? ওর আই ও তো আপনি চার্জসীট দিয়ে দিন। সেসনের সাক্ষের সমন এসেছে কোর্টে যেতে হবে। কোনটা করব থানার তো লোক এই কটা এইবার কে কি করবে।'

ফোনটা বেজে উঠল, 'সেন্ট্রি ফোনটা ধরল, স্যার ভি আই পি ডিউটি।' ফোনটি—ওসির হাতে দিল।

মিঃ ব্যানার্জী ফোনটা তুললেন, 'হ্যালো, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বেলা তিনটায় পাশ করবে, ভি আই পি, ডিউটি যেন দেওয়া হয়।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'হ্যাঁ স্যার, সব ব্যবস্থা হবে। ফোনটা নামিয়ে, 'হোমগার্ড কারা ফাঁকা আছে, তিনটায় ডিউটিতে যেতে হবে। ভি আই পি ডিউটি।'

হিমাংশু, 'আমি আর ইলা যেতে পারব।' মিঃ ব্যানার্জী, 'ব্রজবাবু, হিমাংশু ও ইলাকে ভি আই পি ডিউটিতে এ্যালট করে দিন। রামবিলাসবাবু আর ব্রজবাবু, আমি একটু বাসায় যাব একটু কিছু খেয়ে আসব। আপনারা থাকবেন।' কাগজপত্র গুছিয়ে ফাইলে বেঁধে চেয়ার ছেড়ে ওঠার মুখে, একজন সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ তার সঙ্গে চার পাঁচজন এসে উপস্থিত। বৃদ্ধ নমস্কার বড়বাবু বলে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গের লোকেরাও নমস্কার জানাল।

মিঃ ব্যানার্জী, 'কি ব্যাপার আপনাদের?' বৃদ্ধ, 'আমার নাম হাজি ওসমান গনি, আমি ইব্রাহিমের বাবা। আপনি আমার বাড়ী গিয়েছিলেন, তাই দেখা করার জন্য চলে এলাম।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'ছেলে কোথায়? ইব্রাহিম!' গনি, 'ওতো ওর দাদার কাছে চলে গেছে। মুম্বাই। এখানে তো নেই।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'কবে মুম্বাই গেছে।'

গনি—'পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী থেকে চলে গেছে।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'কোন গাড়ীতে মুম্বাই গেছে? বলতে পারেন?'

গনি, 'না তা বলতে পারব না।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'কোথায় থাকবে?' গনি, 'জহুরী বাজারে ওখানে আমার বড় ছেলে বাস করে, সোনার পালিশ, পাথর শেটের ব্যবসা আছে। 'মিঃ ব্যানার্জী' 'ঠিকানা দিন।'

গনি, 'ঠিকানাটা আমার কাছে নেই। কাল পাঠিয়ে দেব।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'আপনাকে আজই টেলিগ্রাম করে আপনার ছেলেকে আনিয়ে দিতে হবে। কতকগুলি জরুরী কথাবার্তা আছে। আপনার যে ছেলে মুম্বাই থাকে তার নাম কি?' গনি, 'ওর নাম

আবদুর রহিম।' মিঃ ব্যানাজী', 'আপনার দুটি ছেলে ?'

গনি, 'না স্যার, তিনটি ছেলে আর একটি ছেলে আরবে থাকে ?'

মিঃ ব্যানাজী', 'বলেন কি ? আপনি তো রাজা ব্যক্তি মশাই, তা আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মেয়ে চুরির অভিযোগ এসেছে।'

গনি, 'ওসব বাজে কথা, আমার ছেলে বিবাহিত ওর ছেলে মেয়ে বৌ আছে। তাছাড়া প্রিয়র মেয়ে তো আমার নাতনীর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। আমার ছেলে ঐ মেয়ে চুরি করতে যাবে কেন ?'

মিঃ ব্যানাজী', 'দেখুন মশাই, আপনারা আমার বাসায় আসুন। আরও কথা আছে। সিরিয়াস কেশ, যা বলছেন তা নয়, এর পেছনে আর কিছু নিশ্চয়ই আছে। জানেন বাঘে ছুলে আঠার ঘা। ভাল চান তো ওদের মেয়ে কোথায় বলে দিন। আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে।'

মিঃ ব্যানাজী' বাসায় চলে গেলেন। ওর পিছু পিছু গনি আর তার সঙ্গের লোকেরা থানা থেকে ওঁর বাসায় চলে গেল। থানার অপরাপর অফিসার ও কনষ্টেবল পরস্পর মুখের দিকে তাকাল মুচকি হাসি হেসে আবার সবাই যে যার কাজে মন দিল। কিন্তু মন চলে গেছে ঐ লোকেদের পিছু পিছু।

চোদ্দ

সাংবাদিকরা যা লিখলেন সংবাদপত্রে তা কিন্তু প্রকাশিত হল না, অধিকাংশ সংবাদপত্রে কায়েমী স্বার্থের প্রকাশ ঘটে।

প্রিয়নাথের আশা সংবাদপত্র পূরণ করতে পারল না। সাংবাদিকরা যে সব তথ্য তাঁর বাড়ী থেকে নিয়ে গেলেন, পরদিনের প্রকাশিত সংবাদ তাঁকে খুবই মর্মাহত করল।

ভোর ছ'টায় হাওড়া থেকে ফাষ্ট ট্রেনে খন্যানে সংবাদপত্র এসে যায়। প্রিয়নাথ তাই খন্যান ষ্টেশনে প্রকাশিত সংবাদের আশায় এসে হাজির হলেন। যথারীতি ট্রেন এল। সুধীর হকারের কাগজের বাণ্ডিল নামল। প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে থাকায় অনেকেই ভীড় করে এল, খবরটা কি বেড়িয়েছে জানার আগ্রহে সুধীর হকার বাণ্ডিল খুলে কাগজ সাজাতে লাগল, প্রিয়নাথের আর তর সইল না, সে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে সুধীরের হাতে দিয়ে একটা দৈনিক

বাংলা কাগজ নিয়ে ঘোষদার দোকানে এসে বসে, কাগজ হাতড়াতে লাগল। ভোঁদা, মন্টু, হরি সবাই ঘোষদার দোকানে ভীড় করে এসে কাগজ হাতড়াতে লাগল। পঞ্চম পৃষ্ঠায় পাঁচের কলমে টুকরো খবর বার হয়েছে, তার শিরোনামায় রয়েছে।

মে য়ে চু রি না ম ন চু রি

খন্যান (হুগলী) পনেরই জানুয়ারী, কুমারী সুস্মিতা দে নামে একটি স্কুলগার্ল চন্দননগর স্কুল থেকে উধাও হয়েছে। মেয়ে চুরি না মন চুরি এই বিষয়ে জোরদার পুলিশী তদন্ত চলছে। বাড়ির ঝিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রিয়নাথ সংবাদ পড়েই চমকে উঠল। ঘটনা যাই ঘটুক, এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ তাকে অপমান করেনি। আর সংবাদপত্র সেবীরা ভদ্রবেশে এসে, অন্যায় অবিচারের নামে সত্য সংবাদ জন সমক্ষে তুলে ধরার মহান ব্রতের অন্তরালে একি করল? তার চেয়ে সংবাদ প্রকাশিত না হলে ভাল হত, ভোঁদা, হরি, মন্টু চিৎকার করে বলল, এই তো খবর বেড়িয়েছে। ওরা অত তলিয়ে দেখেনি। প্রিয়নাথ ওদের আর দোষ দিল না, আধুনিক সাংবাদিকতায় ইয়োলো জার্নালিজম নাকি এইসব কায়দা নিয়েছে।

অবশ্য বিজ্ঞাপন 'আজকালে' বেরিয়েছে। এরা যে পয়সা নেয় তাতে ভাল ব্যবসাদার হিসেবে নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছে। হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের সংবাদ ছবি সহ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয়নাথ দু'টি সংবাদ এভাবে পেয়ে একটা সান্ত্বনা নিয়ে দুখানি কাগজ কিনে বাড়ী ফিরলেন।

রাস্তায় যেতে না যেতে সবাই ছেঁকে ধরল, দুটো খবরই দু-এক পা যেতে না যেতে যার সঙ্গে দেখা সেই পড়েছে।

প্রিয়নাথ কাগজ দুটি বাড়িতে শান্তিদিকে দিল, বলল, খবরটা বেড়িয়েছে। শান্তি, 'কৈ দেখি, কোনখানে।'

এই সংবাদ শোনার পর বিষ্ণুপ্রিয়া ঘর থেকে বার হয়ে এল, কাগজ দেখার জন্য।

শান্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত দ্বিতীয় পাতায় আটের কলমের খবর সামনে তুলে ধরল।

উপরোক্ত আলোক চিত্রটি কুমারী সুস্মিতা দে, পিতা প্রিয়নাথ দে। গত পনেরই জানুয়ারী একে কোন ভদ্রলোক একটি ট্যাক্সিতে নিয়ে চলে গেছেন। বয়স চৌদ্দ বৎসর। গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট, পরনে ছিল সাদা ও সবুজ রং এর গাউন ফ্রক ফুল দেওয়া লাল খদ্দরের ছাপা চাদর। পায়ে হিল তোলা জুতো। সন্ধান জানাবার ঠিকানা, স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডট্ অব পুলিশ সি. আই. ডি ভবানী ভবন। কলিকাতা ৭০০০২৭।

সরলা, যুথিকা, পঞ্চি, পাশাপাশি বাড়ি থেকে সব মেয়েরা জড় হতে লাগল। চন্দনা, রুপালী মিতালী সুস্মিতার সহপাঠী ওরাও খবরের কাগজে ছবি দেখার জন্য হাজির হয়েছে। ঐ দিনের ঘটনার পর ওদের অভিবাবক কদিন ইস্কুল যেতে দেয়নি। ওদের মনে ভয় একটা কেমন কেমন হয়েছে, এবার হয়ত তাদের কারো না কারো পালা। খবরের কাগজে সুস্মিতার ছাপান ছবি দেখেই রুপালী পুরো সুস্মিতাকে তার সামনে যেন দেখতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে সে হারিয়ে গেল, তাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওর কান্না সংক্রামিত হল, চন্দনা ও মিতালীর মধ্যে। তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে এল।

প্রিয়নাথ অফিসে যাবে বলে চান করতে তৈরী হচ্ছিল, সেও এই কান্নায় যোগ দিল।

শেষ পর্য্যন্ত শান্তি ধৈর্য্য না রাখতে পেরে প্রিয়নাথকে দাবড়ানি দিয়ে বলল, প্রিয়দা তুমি নাকি পুরুষ মানুষ তুমি কিনা অন্য সবাইকে বোঝাবে তা না অবোধ বালকের মত কাঁদতে লাগলে। সরলা, যুথিকা, পঞ্চি, এরাও ঝাঁজুনি দিয়ে হৈচৈ করে উঠল, মেয়ে খুঁজে বার করতে হবে, শুধু কাঁদলে হবে না। পাড়ার লোকের ভীড়ে বাড়িটা ঠেসে গেল। একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল, তা থেকে ওসি মহাদেব ব্যানার্জী নেমে এলেন। পুলিশ দেখে ভীড় কমতে শুরু হল। মিঃ ব্যানার্জী, গেটের কাছে এসে, প্রিয়নাথবাবু বাড়ী আছেন, বলে ডাক দিলেন। প্রিয়নাথ, অর্দ্ধেক দাড়ি কামান অবস্থায় লুঙ্গি পড়ে গায়ে গামছা জড়িয়ে এসে, ওসিকে দেখে,

'আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।' মিঃ ব্যানার্জী, 'প্রিয়নাথবাবু আপনি বাকীটুকু সেরে নিন।' বলে আধ কামানো দাড়ি দেখিয়ে দিল এবং প্রিয়নাথের সঙ্গে বাড়িতে এসে হাজির হল।

প্রিয়নাথ, ওকে বৈঠকখানায় বারান্দায় একটা চেয়্যার বসতে বললেন, বলে, বাকি দাড়ির ব্যবস্থা করতে ঘরে ঢুকলেন। শান্তি এক-কাপ চা ও একটা ডিসে বিস্কুট এনে মিঃ ব্যানার্জীকে দিয়ে বলল, ওসি সাহেব একটু চা খান। মিঃ ব্যানার্জী ডিসশুদ্ধ চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বাম হাতে ডিস ধরে ডান হাতে কাপের ডান্টি ধরে চায়ে চুমুক দিতে শুরু করল।

শান্তি ঘরের মধ্য থেকে খবরের কাগজ দুটো ওসির হাতে এনে দিয়ে বলল—'আজ খবরের কাগজে মেয়েটার ছবি ও খবর বেড়িয়েছে।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'কৈ দেখি', বলে শান্তির হাত থেকে খবরের কাগজ দুটি নিলেন। কাগজের পাতা উল্টে দু'টো কাগজই যা হয়েছে পড়ে নিয়ে বললেন, যাক্ খবরটা তা হলে বার হয়েছে।

প্রিয়নাথ—'দাড়ি কামিয়ে লুঙ্গি পড়ে গায়ে গামছা দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে বলল, সংবাদটা কিন্তু বিকৃত, প্রতিবাদ হওয়া দরকার।'

মিঃ ব্যানার্জী, 'সংবাদপত্রের পিছনে না লাগাই ভাল, ওরা ভুল, ডাইরেক্সান দিয়ে ম্যাপ ছেপে, ...মার্ডারের মত সব ইনভেষ্টিগেশন গোলমাল করে দেবে।'

প্রিয়নাথ, 'যারা ভদ্রলোক এলেন, সংবাদিক বলে ওদের কি কোন মরালিটি নেই।'

শান্তি, 'ওরা সাংবাদিক, ধান্দায় এসেছিল। রেডিও, টি ভিতে খবর বেরুবে, এস. পি. সাহেব বলে গেলেন, কবে বার হবে?' মিঃ ব্যানার্জী, 'পুলিশ লাইনের বিজ্ঞাপনটা এত তাড়াতাড়ি বার করবে, আমরা ভাবতে পারিনি।'

প্রিয়নাথ—'আপনারা কি করলেন বলুন?'

মিঃ ব্যানার্জী—'আমরা পুলিশ একবার যখন গন্ধ পেয়েছি তখন আমরা বার করব। তবে সব কথা খুলে এখন বলা যাবেনা।'

শান্তি,— 'ইব্রাহিম কোথায় ওর খোঁজ পেয়েছেন ?'

মিঃ ব্যানার্জী—'ওর বাবা থানায় এসেছিল, জানিয়েছে, ও এখানে নেই মুম্বাইয়ের জহুরী বাজারে তার ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে গেছে।'

প্রিয়নাথ—'আপনি ঐ কথা বিশ্বাস করেন, ও ব্যাটাই আমার মেয়েটাকে পাচার করেছে। ওকে আগে খুঁজে বের করুন। দেখবেন ঠিক মেয়ে পাওয়া যাবে।'

মিঃ ব্যানার্জীর মনের মধ্যে হাজি ওসমান গনির সঙ্গে একান্ত গোপনে নিজের বাসায় কথাবার্তা এবং তার উপর যাতে জুলুম অত্যাচার না হয়, তার জন্য লেনদেন ও কথাবার্তার স্মৃতি জেগে ওঠে। তিনি শুষ্ক মুখে হাসি টেনে বললেন, 'আইন মাফিক তো আমাদের কাজ করতে হবে।'

শান্তি, 'বড়বাবু আপনারা চোর ধরেন, বা মাল বার করার জন্য থানায় নিয়ে গিয়ে পয়মাল করেন, তখন বামাল বেরোয় কি বেরোয়না, বলুন তো ?' মিঃ ব্যানার্জী, 'আচ্ছা দেখছি ? কি করা যায় ?'

শান্তি, 'আমরা কিন্তু আপনাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি। ইব্রাহিম ছাড়া এই কাজ হয়নি। আমরা মহিলা সমিতি ওকে ছাড়বনা।' মিঃ ব্যানার্জী, 'আমরা হাজি ওসমান গনি সাহেবকে বলে দিয়েছি। আপনি আপনাদের ছেলেকে টেলিগ্রাম করেই হোক আর লোক পাঠিয়েই হোক হাজির করে দিন। নইলে আপনাকে ছাড়বনা।'

একজন কনেষ্টবল ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, 'আর টিতে আপনাকে বড় সাহেব ডাকছেন।' মিঃ ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন, প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে, 'হ্যাঁ যা বলতে এসেছিলাম, এই ঘটনায় আপনাদের এজেহার গুলি থানায় হাজির হয়ে আগামী-কালই দিয়ে দেবেন। এখন তাহলে আসি।'

মিঃ ব্যানার্জী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'নমস্কার !'

প্রিয়নাথ, 'নমস্কার স্যার আপনি একটু শক্ত হন, দেখুন ঠিক হবে।'

শান্তি, 'আপনি আসামী ধরছেন না বড়বাবু, আমরা কিন্তু ছাড়ব না।'

মিঃ ব্যানার্জী আস্তে আস্তে নেমে গেলেন, গেট পার হতেই, জিপ গাড়িটি আওয়াজ তুলে যাত্রা শুরু করে দিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা বড়বাবু চলে যাওয়া পথে আর একবার হতাশার দৃষ্টি ফেলে তাকাল।

পনের

প্রিয়নাথের বাড়ীতে প্রচুর ভীড় পাড়ার লোকেদের। রাত্রিতে দূরদর্শনে হারান-নিরুদ্দেশের সংবাদ জানতে, সেই সংবাদে সুস্মিতার সংবাদ আজ প্রকাশিত হবার কথা। দূরদর্শনে ছবিটা কেমন দেখায় এবং কি বলে এটা দেখার আগ্রহে বেশ ভীড় জমেছে। প্রিয়নাথ সবাইকে বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া এ'কদিনে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। একমাত্র কন্যা সুস্মিতাকে না পেয়ে, প্রায়ই সে কাঁদে, তাই পাড়ার কেউ না কেউ তাকে একলা থাকতে দেয়না। প্রিয়নাথের মনে হতাশা রোগ সৃষ্টি হয়েছে। অফিসে যে তার সুনাম ছিল, অস্তমিত হতে বসেছে। প্রায়ই তার সিট খালি যায়, অনেক ক্ষেত্রে আসতে দেরী হচ্ছে। ছুটি হবার আগেও হয়ত তাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে হচ্ছে। অফিসের লোকজন তার এই দুঃসময়ে তাকে মানিয়ে নিয়ে চলছে। বৈঠকখানার দালানের সামনে ছেলেমেয়েদের ভীড় তারপর মেয়েরা, সব শেষে পুরুষ মানুষ ভীড় করে বসে আছে। দূরদর্শন কলকাতা, ঘোষণা করে হারান-নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রচার করতে শুরু করল। একটার পর একটা ছবি ফুটে ওঠে দূরদর্শনের পর্দায়, হারান-নিরুদ্দেশ, পলাতক ইত্যাদির বর্ণনা করে। পরমুহূর্তেই দর্শকরা আকাঙ্খিত ছবির আশা করে, না পাওয়ায় গুঞ্জন করে। অবশেষে সুস্মিতার জন্মদিনে তোলা ছবিটি টিভির পর্দায় দেখা গেল। ছবিটি দেখিয়ে প্রচার করা হল, 'এইটি কুমারী সুস্মিতা দে পিতা শ্রী প্রিয়নাথ দে, বয়স চোদ্দ বৎসর, গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা পাঁচফুট, পরনে সাদা ও সবুজ রং এর গাউন ফ্রক, লালফুল খদ্দরের চাদর। পায়ে হিল তোলা জুতো। গত পনেরই জানুয়ারী থেকে চন্দননগর স্কুল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন সদাশয় ব্যক্তি

সন্ধান পেলে, স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ সি· আই· ডি ভবানী ভবন কলিকাতায় সংবাদ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

টিভিতে সুস্মিতার ছবি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে দর্শক ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল। তারা এই বিষয়ে প্রকৃত ঘটনার গুরুত্ব নিয়ে বোঝবার মত ক্ষমতায় আসেনি।

প্রিয়নাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মানসিক বল পেল। এইবার তা'হলে সর্বত্র জানাজানি হল। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও থেকে একটা খবর আসবেই। বিষ্ণুপ্রিয়া বললে এবার ওকে আটকে রাখতে নিশ্চয়ই চাইবে না। পুলিশ চারিদিকে খোঁজখবর যখন নিচ্ছে নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বার করবেই।

দূরদর্শনে হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রচারিত হবার পর সঙ্গীত অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

দু-একটি সঙ্গীত হবার পর প্রিয়নাথ সুইচ অফ করতে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোষিত হল—এর পরে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সঙ্গীত সম্রাট হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথ সুইচের কাছে হাত এনেও হাত ফিরিয়ে আনলেন।

দূরদর্শনে সঙ্গীত আরম্ভ হল। গাইছেন হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়। বয়সের ভারে দেহ ভেঙ্গে পড়লেও কণ্ঠসঙ্গীতের আবেগে ও মধুরতায় পরিবেশন করতে লাগল—

'ঐ রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায়গো—
বনবাসে যায়।
সোনার প্রতিমা কেগো অকালে ভাসায়রে
অকালে ভাসায়।
রাজপুরী অযোধ্যা দিবসে হল আঁধার
দিবসে হল আঁধার।
পুরবাসী আঁখি জলে রাখিতে পারে না।
আর রাখিতে পারে না।
শত সুখ স্মৃতি বলে, দেব না বিদায় রে।
যেনে সীতা বনবাসে যায়
সোনার প্রতিমা কেগো অকালে ভাসায়

অকালে ভাসায়।

শ্রীরামের দু'নয়ন শূন্য হেরি ত্রিভুবন

প্রতিমা গড়িয়া আজি নিজ হাতে বিসর্জ্জন।

প্রিয়নাথ কেঁদে উঠল, 'আমি নিজ হাতে বিসর্জন দিয়েছি—আমি নিজ হাতে বিসর্জন দিয়েছি। আবার গান চলছে,

রঘুকুল পূর্ণিমা সহসা পোহায় রে

রাঘব দুহিতা সীতা বনবাসে যায়।

সোনার প্রতিমা কেগো অকালে ভাসায়

ঐ রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে

বনবাসে যায়।'

বিষ্ণুপ্রিয়া দূরদর্শনে তার হারান মেয়ের মুখখানি দেখার পর, মেয়ের জন্ম থেকে বড় হওয়ার ঘটনা সবই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল। সেইসঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মাতৃত্বকে নাড়া দেবার মত কণ্ঠসঙ্গীতে তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে উঠল। তার মনে হল—বাড়ী ঘর সব যেন ঘুরছে। তার পা সে মাটিতে রাখতে পারছে না। সে মাটিতে পড়ে গেল।

বাড়ীশুদ্ধ লোক চিৎকার করে উঠল। টিভিতে যে অনুষ্ঠান চলছিল বন্ধ করে দিল প্রিয়নাথ। বাড়ীতে জমে থাকা লোক একে একে পাতলা হয়ে গেল। শান্তি, বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথাটা কোলে নিয়ে দেখে তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। সরলা, যূথিকা, পণ্টু—এরা সবাই ছুটোছুটি করছে। কেউ জল আনছে, কেউবা গরম দুধ আনছে। রামু ডাক্তার খবর পেয়েছে, পাড়াতেই তার ডিসপেনসারি—সে এসে হাজির। হাতে তার ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে এসে দাঁড়াল।

রামু—'কৈ? দেখি? কি হয়েছে?' ওকে ভাল করে শুইয়ে দিন। মাথায় একটা বালিশ, 'আমাকে একটা চামচ দিন।'

ডাক্তারের কথামত শান্তি, সরলা, পণ্টু, যূথিকা এরা ভাল করে মেঝেয় বিছানা করে দিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুইয়ে একটা চামচ ডাক্তারকে দিল রামু। চামচ দিয়ে রোগিণীর দাঁত ফাঁক করে অল্প গরম দুধ দিল। নিজের ডাক্তারী ব্যাগ হাতে টেথিসকোপ বার করে শ্বাসপ্রশ্বাস দেখে নিল, তারপর ব্যাগ থেকে হোমিওপ্যাথী জলের

মত একটা ওষুধ বার করে একটা কাপ চাইলেন। সেই কাপে জল দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেলে দিয়ে চামচে করে ধীরে ধীরে রোগীণীকে খাইয়ে দিলেন। রোগীণীর হাত পা ঢাকা দিয়ে দিলেন।

প্রিয়নাথ নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছে না। সে অনবরত ডাক্তারের কাছে এসে বলছে, 'ডাক্তারবাবু ওকে বাঁচিয়ে দিন। ও বেঁচে আছে তো।'

রামু—'প্রিয়দা কোন ভয় নেই। শক লেগেছে, তা ছাড়া ওর শরীর দুর্বল, নিজেকে সামলাতে পারে নি এখনিই জ্ঞান ফিরে আসছে কোন ভয় নেই। তবে আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা রোগীণীর কাছে কোনপ্রকার চিৎকার চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করবেন না।' বিষ্ণুপ্রিয়া—চোখ মেলে তাকাল, বলল, 'জল খাব।'

রামু, তার কাপে লেগে থাকা ওষুধ তার মুখে এক চামচ দিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া সেটুকু খেয়ে নিল। রামু—'কি বৌদি, অসুস্থ হয়েছেন ? আর ভয় নেই, আমি এসেছি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, সে কেঁদে উঠল, তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামু রোগী দেখে, মনে মনে বুঝতে পারল, এই রোগী যদি কাঁদতে থাকে, তার শারীরিক অবস্থার অবনতি অনিবার্য। তাই সে বলল, 'রেডিও টিভিতে আপনার মেয়েকে খুঁজে বার করার জন্য অনবরত বলছে। সবাই চেষ্টা করছে,—আপনার মেয়েকে খুঁজে বার করার জন্য, আর আপনি কেবল কান্নাকাটি করে নিজের অসুখ করছেন। আপনাকে দেখবে কে আর কে আপনার মেয়েকে খুঁজে বার করবে ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'না—আর আমি কাঁদব না সবাই যখন চেষ্টা করছে ও নিশ্চয়ই ফিরবে ?' রামু—'আমি এবার আসি, বৌদি।' প্রিয়নাথও উপস্থিত সবাইকে চুপি চুপি বললে—'ওকে গরম দুধ আর কাপের ওষুধ মাঝে মাঝে দিন। ঘুম এলে কোনরকম আর ডিসটারব করবেন না। আর আমার ডাক্তারখানার থেকে একটা ওষুধ আনতে হবে।'

তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল। শান্তি তার হাতে জল দিল।

ষোল

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, কোর্ট কাছারির কাজে জড়িয়ে গেলে, আঠাকাটির মত লেগেই থাকে। গনা বুড়ি ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের একশ চৌষট্টি ধারার জবানবন্দীতে হাজির হল। রামজীবন যদিও কোন অপরাধী নয় তাকে সংবাদ গোপন রাখার জন্য অভিযুক্ত করে তার জবানবন্দী আদালতে রেকর্ড করার জন্য পাঠান হয়েছে।

এস. ডি. জে. এম. ফোর্থ কোর্টে ওদের ষ্টেটমেন্ট রেকর্ডের জন্য পাঠিয়েছেন। ওরা আদালতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বহু-লোক জড় হয়ে গেল।

মিসেস মল্লিক, জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদেশ দিলেন কোর্টের মধ্যে কোন পুলিশ যেন না থাকে আর বাইরের লোক যেন না ঢোকে। তিনি গনা বুড়িকে ডেকে বললেন, আপনি একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন। আপনি ইচ্ছে করলে নাও বলতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার নাম।

উত্তরে বলল—গনাবুড়ি।

ম্যাজিষ্ট্রেট—পদবী কি?

বুড়ি—বাউল দাস।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনি কি করেন?

বুড়ি—'অমি প্রিয়নাথের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করি। আমি এতোখানি বয়েস থেকে ওদের বাড়ির ঝি। হাত দেখিয়ে দেখাল—তাতে তার বয়স নয় থেকে দশ বছর। আমার বিয়ে হয় নি। আমি ঠোট্‌কাটা বলে আমায় গনা বলে। আমি এখন বুড়ি, তাই আমাকে গনা বুড়ি বলে।'

ম্যাজিষ্ট্রেট—'ওঁদের বাড়ীতে কোন মেয়ে আছে?'

গনা—'হ্যাঁ, সুমী আছে।'

ম্যাজিষ্ট্রেট—'ওর ভাল নাম কি সুস্মিতা?'

গনা—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর দূর হ, আমার বাপু ভাল নাম বার হয় না। আমি ওকে সুমী বলে ডাকি।'

ম্যাজিস্ট্রেট—'সুমীর ব্যাপারে তুমি কি কিছু করেছ ?'

গনা—'আমাদের গেরামের ইব্রাহিম ব্যাটা হররোজ বলে, মাসী, সুমীর একটা ফটো বাঁধানো বই আছে আমাকে একবার দেখাবে—দেখে তোমায় দিয়ে দেব। আমি ভাবলাম, ভদ্দর লোকদের ছেলেমেয়েদের বাপু আজকাল ঐরকম হয়, যখন বলছে একবার দেখে দিয়ে দেব। তাই ওকে দেখাবার জন্য ফটো দেখালাম। ও ফটোর খাতা খানা আমার কাছ থেকে লিয়ে লিলে। আর আমায় পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল, মাসী জল খেয়।'

ম্যাজিস্ট্রেট—'সুমী কোথায় ?'

গনা—'ফটো লেবার পর ক'দিন পরে সুমী ইস্কুলে গিয়ে আর বাড়ী আসে নি।'

ম্যাজিস্ট্রেট—'তুমি কি জানো ঐ সুমীর সঙ্গে ওর আগে কোন যোগাযোগ ছিল ?'

গনা—'ও বাচ্ছা মেয়ে নিজের পড়া লিয়ে, গান বাজনা লিয়ে আর খেলাধুলো লিয়ে থাকে।'

ম্যাজিস্ট্রেট—'সুমী কোথায় ?'

গনা—'আমি বাপু তা জানি না।'

ম্যাজিস্ট্রেট—'তুমি আর কিছু বলবে ?'

গনা—'না বাপু আমি আর কিছু জানি না।'

ম্যাজিস্ট্রেট—তার প্রশ্ন এবং গনাবুড়ির উত্তর যা লিখেছেন তাকে সব পড়ে শুনিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কথা ঠিক ঠিক লেখা হয়েছে তো ?

গনা বলল—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট—তুমি সই করতে জান ?

গনা—বলল, না আমি, ল্যাখাপড়া জানি না।

ম্যাজিস্ট্রেট—'পেশকারবাবু ওর স্টেটমেন্টের উপর এল. টি. আই নিয়ে নেবেন। আর ওকে সিপাই দিয়ে পাঠিয়ে দিন। আর একজন আছে, ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।' পেশকার মুরারীমোহন মোদক তার বয়েস হয়েছে, তার এখন মোহন মূর্তি নেই। তিনি হাঁক দিয়ে বললেন,—'এই সিপাহী আসামীকে লে যাও।'

তখন একজন হোমগার্ড হাজির হল। বয়সে ছোকরা। তাকে মুরারীমোহন জানাল, বুড়িকে কাষ্টডিতে নিয়ে যাও, আর একজন আসামীকে মেমসাহেবের ঘরে হাজির করে দাও। হোমগার্ড গনা বুড়িকে লক্ আপে পৌঁছে দিয়ে রামজীবনকে এনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করে দিল।

মিসেস মল্লিক—রামজীবনকে আবার বলতে লাগলেন। আপ বাংলা সমজতা ?

রামজীবন—হ্যাঁ, জী।

মিসেস মল্লিক—আমি ম্যাজিস্ট্রেট, আমি আপনার কাছে কতকগুলি কথা জানতে চাইব। আপনি ইচ্ছা করলে ঐসব কথার জবাব দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে জবাব নাও দিতে পারেন।

রামজীবন—'হ্যাঁ আমি জবাব দিব।'

মল্লিক—'আপনার নাম বলুন।'

রামজীবন—'আমার নাম রামজীবন যাদব।'

মল্লিক—'বাড়ী কোথায় ?'

রামজীবন—'বিহার, মুঙ্গের, এখন চন্দননগরে থাকি।'

মল্লিক—'কি কাজ করেন ?'

রামজীবন—'ইস্কুলে দারোয়ানীর কাজ করি।'

মল্লিক—'আপনার ইস্কুলটা কোথায় ?'

রামজীবন—'চন্দননগর কোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে।'

মল্লিক—'আপনার ইস্কুলে সুস্মিতা দে নামে কোন মেয়েকে আপনি চেনে ?'

রামজীবন—'বিলকুল আমি চিনি।'

মল্লিক—'কোনদিন কোন ঘটনা ঘটেছে।'

রামজীবন—'হ্যাঁ জী।'

মল্লিক—'কি জানেন বলুন।'

রামজীবন—'ইংরাজী মাসের পনের তারিখে—এই বছর আমি ইস্কুলে সকালে ডিউটি করছিলাম। ওর বাপ ওকে রিস্কা করে এসে ইস্কুলের গেটে লাবিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটা আমার ইস্কুলে গেটের কাছে এসেছে, আমি যখন গেট খুলে দিতে যাই, একটা ট্যাক্সি এসে

দাঁড়াল। মেয়েটাকে ডাকল।'

মল্লিক—'তারপর কি হল ?'

রামজীবন—'মেয়েটা অন্য মেয়েদের হাতে তার বই দিয়ে দিল। সেই লোকটার সাথে বাতচিত্ করল। সেই লোকটা মেয়েটাকে ফটো দ্যাখাতে লাগল, তারপর মেয়েটা ঐ ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল।'

মল্লিক—'যে লোকটাকে ঐ মেয়েটার সংগে কথা বলতে দেখেছ, তাকে দেখলে চিনতে পারবে ?'

রামজীবন—'হ্যাঁ জী, বিলকুল চিনতে পারব।'

মল্লিক—'ঐ লোকটা বাঙালী না হিন্দুস্থানী।'

রামজীবন—'বাঙালী আছে। ছোকরা আছে, বয়স তিরিশ বছর আন্দাজ হবে।'

মল্লিক—'কতক্ষণ রইল ?'

রামজীবন—'খুব বেশিক্ষণ থাকেনি। মিনিট পাঁচেক।'

মল্লিক—'আপনি কি করলেন ?'

রামজীবন—'আমি একটা ইঁটের টুকরো দিয়ে হামার গেটের ঘুমটির ঘরের দিয়ালে ওর লম্বরটা লিখে রেখেছি।'

মল্লিক—'আপনি ঐ নম্বরটা বলতে পারবেন ?'

রামজীবন—'আমি হামার নাম সহি করতে জানি, ইংরেজি লিখা-পড়া জানিনা। তবে দেওয়ালে, এখন ওটা লিখে রেখেছি। থানার পুলিশের লোক এসে লম্বরটা টুকে লিয়ে গেছে।'

মল্লিক—'এই নিয়ে থানায় কোন ডায়েরী করেছন ?'

রামজীবন—'না হুজুর। ওটাই আমার অন্যায় হয়েছে।'

মল্লিক—'ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্কে জানিয়েছন ?'

রামজীবম—'হুজুর ওটাও আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কসুর-মেঙ্গেছি।'

মল্লিক—'আপনি এই ঘটনার কথা আর কাউকে বলেছেন ?'

রামজীবন—'হ্যাঁ জী, আমি ইস্কুলের হেড্দিদিমণিকে বলেছি, মেয়েটার বাপকে বলেছি।'

মল্লিক—'এছাড়া অন্য কোন কিছু জানেন কিনা ?'

রামজীবন—'না, হুজুর, আমি আর কিছু জানি না। যা আমি জানি বলেছি। কুচ নেহি ছুপায়া।'

মল্লিক—'পেশকার বাবু রেকর্ড ও আসামীকে নিয়ে যান।' রামজীবনের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে নিজের সই করে দিলেন।

পেশকার মুরারীমোহন মোদক, রেকর্ড ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বার থেকে নিজের টেবিলে নিয়ে এলেন। বললেন—'এই সিপাহী আসামীকো ইধার লে আও।' হোমগার্ড রামজীবনকে পেশকারের কাছে নিয়ে গেল।

মুরারীমোহন—'আপনি সই করতে জানেন?'

রামজীবন—'হ্যাঁ জী।'

মুরারী—'কলমটা রামজীবনের হাতে দিল।'

রামজীবন কলমটা নিয়ে পেশকারকে জিজ্ঞাসা করল—'সহি কাঁহা করেগা?'

মুরারী রামজীবনকে সই করার জায়গা দেখিয়ে দিল।

রামজীবন ইংরাজী ভাষায় কোন রকমে রামজীবন যাদব বলে সই করল।

মুরারী—'সিপাহী আসামীকো লকআপ মে লে যাও।'

হোমগার্ড বাইরে দাঁড়িয়েছিল। রামজীবনকে নিয়ে চলে গেল।

মল্লিক—'পেশকার বাবু।'

মুরারী—'ম্যাডাম।'

মল্লিক—'ওয়ান সিক্সটি ফোরের স্টেটমেন্টগুলি যা রেকর্ড হল সিলকভারে রাখুন। যেন খোলা অবস্থা না থাকে। এটা সেসন মোকদ্দমার বিষয় বুঝলেন।'

মুরারী—'হ্যাঁ ম্যাডাম।'

যে যার নিজের নিজের কাজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন।

সতের

শীতের হাওয়া কেটেছে, ফাল্গুনের মৃদুমন্দ দক্ষিনা বাতাস ঝির-ঝির করে বইছে। গাছের নব পল্লব গজিয়ে উঠছে। পাখীদের সারি আকাশে মালার মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে।

জি. টি. রোডের ধারে খন্যানে একটি দোতলা বাড়ীর চারিপাশে মানুষের জমায়েত। সমগ্র ষ্টেশান রোড ভর্তি মানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছে সবাই বাড়ীটা লক্ষ্য করে।

বাড়ীটা তেতালা, বাংলো প্যাটার্নে আধুনিক রুচি সম্মত বহু অর্থব্যয়ে এটা তৈরী হয়েছে। বাড়ীটাই সাক্ষী দেয় যে মালিক বিত্তশালী। আরব থেকে মুম্বাই থেকে আর এখানে বালির খাদের পয়সা একত্র জড় করে আধুনিক ফ্যাসনে এই আকর্ষনীয় বাড়ীটা হয়েছে। বাড়ীর মালিক হাজি ওসমান গনি, ইব্রাহিমের বাবা।

ইব্রাহিম বাড়ীতে ফিরে আসেনি। পুলিশের কাছে ইব্রাহিমকে এনে দেবার কথা ওর বাবা হাজি ওসমান গনি দিয়ে এসেছিল। পুলিশ প্রথম খুব হম্বিতম্বি করেছিল, হাজি ওসমান গনি ধুরন্ধর লোক, পুলিশের উত্তাপ কমিয়ে দেবার ওষুধ দেবার পর, ওসমান গনি সাহেবকে বুদ্ধি বার করতে হল না। পয়সা খরচ করলে বাড়ী বয়ে বুদ্ধি চলে আসে।

পুলিশ কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে, শুধুমাত্র চিঠি পত্রের পাহাড় জমেছে আসলে কাজের কাজ কিছুই হয় নি। রেলের সিগন্যালে গোলযোগ দেখা দিলে যে পোর্টার ও পি টি নিয়ে যায় হাত দুটো জোর চলে, কিন্তু পা একেবারেই অচল। কেউ তাকে তাড়াতাড়ি করতে বললে, সে চিৎকার করে বলে থাকে, 'হ্যাম তো যাতা হ্যায়।' আইনের চৌহদ্দির মধ্যে ফাঁস, তাতে আন্তরিকতার অভাব থেকে যায়। তার জন্য গণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে জমায়েত গণ বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে। চিন্তামণি মাইক ধরে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে শর্মা, প্রিয়নাথ, ভোঁদা, শান্তি, সরলা, হরি, হিরু,—বাদল পর্য্যন্ত তার দোকান বন্ধ করে জমায়েতে হাজির। পুলিশও একটা বড় রকমের মতায়েন। জমায়েতে শ্লোগান চলছে—এই শ্লোগানে নেতৃত্ব দিচ্ছে চিন্তামণি, 'মেয়ে চোর ধরতে হবে—ধরতে হবে। পুলিশের টালবাহনা চলবে না,—চলবে না। অপরাধীদের শাস্তি চাই—শাস্তি চাই। বালি খাদ মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও।' মাঝে মাঝে শ্লোগান থামছে, বক্তৃতা হচ্ছে। প্রিয়নাথ মাইকে বক্তৃতা শুরু করল,

'আপনাদের সকলের কাছে জানাচ্ছি, আমার কন্যা সুস্মিতার ফটো গণা বুড়ির কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে ইব্রাহিম নিয়েছে। গণা বুড়ি এই কথা বলেছে। ইব্রাহিম এখন লুকিয়ে আছে। ঐ ইব্রাহিমই আগে হিরুকে গুলি করেছিল। আমরা ঐ বন্দুক আটক করি। হিরুর চিকিৎসা করি। ঐ দিয়ে ইব্রাহিম আমাদের শাসিয়েছিল, দেখে নেব বলে। আমার বিশ্বাস এই নোংরা কাজ ও ছাড়া কেউ করেনি। তাই আপনাদের কাছে আবেদন আপনারা এর বিচার করুন।' সমবেত জনতার চিৎকার ওদের বাড়ী ঘিরে ফেলতে হবে, ওদের ছাড়া হবে না।

চিন্তামণি ঘোষণা করলেন, 'এইবার মহিলা সমিতি থেকে শান্তি দেবী বক্তৃতা দেবেন।'

শান্তি—'আমি সাধারণ মেয়ে বক্তৃতা-টক্তৃতা দিতে জানিনা। তবে এইটুকু বুঝি যে আজকের সমাজে মেয়েদের এককাট্টা হতে হবে। আমরা ওসির কাছে কৈফিয়ত চাই, কেন এখনও পর্য্যন্ত ইব্রাহিমকে তিনি ধরলেন না। ইব্রাহিমের বাড়ী ঘেরাও করতে হবে। এস. পি. না এলে ছাড়া হবে না। এই পুলিশ পেট মোটা করে বসে আছে। অপরাধীকে ধরছে না। আজ আমরা এই অবস্থান চালিয়ে যেতে চাই —যতক্ষণ না ইব্রাহিমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে ততদিন আমরাও এখানে শিবির বসাব। পুলিশও ক্যাম্প করুক, চোরকে পাওয়া চাই নইলে অমারাও উঠব না। আমাদের লড়াই চলতেই থাকবে।'

জনতার মধ্যে চিৎকার—'অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে—করতে হবে।'

মহাদেব· ব্যানাজী—ওসি, পুলিশ ক্যাম্প, জানালেন পুলিশ ভ্যানের মাইকযোগে প্রচার করলেন, উপস্থিত জনসাধারণকে জানান যায় যে, 'মাননীয় এস. ডি. ও. সদর হুগলী ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের একশ চুয়াল্লিশ ধারা প্রয়োগ করেছেন। আপনাদের জমায়েত বেআইনি হয়েছে। পাঁচজনের অতিরিক্ত জটলা হলে পুলিশ এই বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমরা সবাইকে ডিসপার্সমেন্টের আদেশ দিচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে যে সভা চলছিল, তা বন্ধ

হয়ে গেল। চিন্তামণি জনতাকে জানিয়ে দিলেন। সরকার আমাদের সুতরাং আমরা সরকারের সঙ্গে কোনরকম সংঘর্ষে যাব না। তবে পুলিশ অফিসারের মধ্যে একটা অংশ আছেন, তাঁরা সব সময়ই অতীত দিনের জমিদার জোতদার বালিখাদের মালিকদের প্রেম ও প্রীতি পরিত্যাগ করে না। আপনারা কোথাও জটলা করবেন না। চারজনের বেশী কোথাও কোনরকম জটলা করবেন না। তফাৎ তফাৎ বসে যান, শান্তিপূর্ণ অবস্থান আমাদের চলবে।

উপস্থিত জমায়েতের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি উঠল চাপা ক্রোধ প্রকাশিত হল। বিরাট জনতা, বার-খন্যান থেকে ইটাচুনার মোর পর্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে গ্রুপে নিজেরা বিভক্ত হয়ে গেল।

দুপুর গড়িয়ে এল। রোদের তেজ বেশ প্রখর হয়ে উঠল। কিন্তু জনগণের অবস্থান চলছে শান্তিপূর্ণ। রাজপথ অবরোধ হল না, রাজপথে যানবাহন যথারীতি চলছে, সারা পশ্চিম বাংলার জনগণের শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন প্রচারিত হচ্ছে।

একটি কালো ট্যাক্সি এসে হাজির হল। ট্যাক্সি থামতেই তা থেকে ইব্রাহিম বার হয়ে এল। ওর বাড়ী যাবার পথে জনতার জটলা থাকায় ট্যাক্সি বাড়ী অবধি যেতে পারে নি।

ইব্রাহিম ট্যাক্সি থেকে নেমেই চিৎকার করে—'কি হচ্ছে? আদালত এই এলাকায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে। আপনি পুলিশ অফিসার হয়ে আদালতের আদেশ কি রকম ল-এ্যাণ্ড অর্ডার পালন করছেন, দেখা যাচ্ছে। অবিলম্বে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গকারী বেআইনী জমায়েতকে হঠিয়ে দিন। ওদের গ্রেপ্তার করুন।'

চিন্তামণি—মাইক দিয়ে ঘোষণা করল, যে যেমন চারজন করে অবস্থান করছেন সেইভাবে থাকুন—অবস্থান করবেন। দাবী করুন অপরাধী বাইরে কেন পুলিশ তুমি জবাব দাও। জনতা—অপরাধী বাইরে কেন, পুলিশ তুমি জবাব দাও।

জনতা আবার—অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।—আওয়াজ উঠল, অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

ইব্রাহিম—'অ্যামবাসাডার গাড়ীর মধ্য থেকে পোর্টেবল ওয়ারলেস

মেশিন বার করে তার এনটেনা টেনে বার করে, বলল—'হ্যালো… হ্যালো—এস পি হুগলী।'

—'হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।'—'আদালতের আদেশ পুলিশ মানছে না, এখানে আমার বাড়ী ঘেরাও হয়েছে। আপনি পুলিশক অবরোধ মুক্ত করতে বলুন।'

—'হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে।' ইব্রাহিম ওয়ারলেশ মেসিনটি আবার ট্যাক্সিতে রেখে দিল।—হাইওয়ে জিপ একটা চলে এল। মিঃ ঘোষদস্তিদার জিপ থেকে নেমে এলেন! চিৎকর করে বললেন—'আপনাদের সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা চিৎকার (—জনতার থেকে)—ব্যাটা, হরিদাস পাল, চলে যেতে হবে।

চিৎকার উঠল—অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এই সময় ঐ পাড়ার কয়েকটি সমাজবিরোধী জনতার মধ্য থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট ফেলতে শুরু করল।

ঘোষদস্তিদার—বুঝলেন, জনতা নীরব থাকবে না। একটা সময়ে এইরকম ঘটনা ঘটবে আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি চিৎকার করে বললেন গ্যাস চালাও। দুজন গ্যাস কনস্টবল—গ্যাস বন্দুক তুলে গ্যাস সেল নিক্ষেপ করল। জনতার মধ্যে গ্যাসের সেল গিয়ে পড়ল তা থেকে ধুঁয়ো বেড়োতে লাগল। লোকজন পালাতে শুরু করল। জি. টি. রোড, ষ্টেশন রোড লোকে বোঝাই, রাস্তার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

ইব্রাহিম নিজের বাড়ী যেতে উদ্যত হল।

ঘোষদস্তিদার 'আপনি বাড়ী যেতে পারবেন না, আপনি অ্যারেষ্ট। আপনাকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।'

ইব্রাহিম—'পকেট থেকে একটা জেরক্স কপি হাইকোর্টের অর্ডার বার করে ঘোষদস্তিদারের হাতে দিয়ে বলল—'আমি মহামান্য হাইকোর্টের জামিনে আছি। আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।

ঘোষদস্তিদার—'আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনাকে এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে আপনার গাড়ী নিয়ে থানায় যেতে হবে। আপনার

ড্রাইভারকে ডাকুন।'

ইব্রাহিম গিয়ে নিজের গাড়ীতে বসল। ড্রাইভার দত্তবাবুকে চুপিসারে বলল কলকাতায় নিয়ে চল। দত্তবাবু আস্তে আস্তে গাড়ীটা সোজা করেই জোরে ছুটিয়ে দিল জি. টি রোডের উপর দিয়ে। পুলিশের এত লোকজন ভাবতেই পারল না। ওদের ভাবনার কোন সুযোগ না দিয়েই গাড়ী জি. টি. রোড দিয়ে কলকাতা শহরের দিকে ছুটে চলল।

পুলিশের মধ্যে চিৎকার উঠল। মিঃ ঘোষদস্তিদার বললেন, ঐ গাড়ীর নম্বর **WMT 390,** ঐ গাড়ীটা ধরতেই হবে। চিৎকার করে আর টি অপারেটারকে মগরা থানায় ঐ গাড়ী আটক করার জন্য ম্যাসাজ দিতে বললেন। পুলিশের যত গাড়ী ছিল, সব ঐ গাড়ীকে ফলো করায় জন্য হুকুম দিলেন। হাইওয়ে জিপ গাড়ীটাতে চেপে পলাতক ট্যাক্সির পিছন ধাওয়া করলেন। জি. টি. রোড জনবহুল পথ, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আপ ডাউনে গাড়ী, মাঝেমাঝে ব্রেক ডাউন গাড়ী, পথে গর্ত, বাঁক, বাম্প, গাড়ীর গতিপথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ীগুলি কাছাকাছি চলছে।

আঠারো

হুগলী জেলখানার সামনে গঙ্গানদী, জেলখানার গেট বড় বড় লোহার রড দিয়ে তৈরী। ছোট গেট ও বড় গেট আছে। বড় গেট খোলা হয় কেবলমাত্র সম্মানীয় অতিথি ও বড় বড় গাড়ী জেলের ভিতরে যাবার ও আসার জন্য, ছোট গেট সাধারণ কয়েদী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য। এই গেটের সমান্তরাল আর একটি কাঠের গেট আছে মাঝখানে বাঁক দুপাশে দুটি অফিস ঘর। কাঠের গেট কারার অন্তরাল, বাইরের লোকেরা কারাগারের অভ্যন্তরের কিছু দেখতে পায় না আবার কারাগারে যারা থাকে বাইরের কোনকিছু তারা দেখতে পায় না। একসঙ্গে দুটি গেট কোনসময়ে খোলার আইন নেই জেলখানায়। একটি গেট খুলে সেটা ব্যবহার করার পর সেটি বন্ধ করে তবে অন্য গেট খোলার বিধি আছে।

ইব্রাহিম ও হরিহর দত্তকে হুগলী জেলে বিচারাধীন বন্দী

হিসাবে পুলিশ হাজির করল কালো গাড়ীতে গেটের সামনে। কালো গাড়ীর দরজা খুলে গেটের মুখে দাঁড় করিয়ে ওদের ছোট লোহার গেট দিয়ে মাথা গলিয়ে দুটো গেটের ফাঁকে দাঁড় করান হল।

হাবিলদার রামস্মরণ সিং এক, দো, তিন আওয়াজ তুলে পুলিশের কালো ভ্যান থেকে কয়েদীদের বার করে ছোট লোহার গেট দিয়ে জেলখানার দুটো গেটের মধ্যে ঢোকাতে লাগল। শিউপুজন পান্ডে গেটের তালা হাতে বন্ধুক কাঁধে পাহারারত, তালা খুলে আসামী সে গুনে নিচ্ছে।

ইব্রাহিম ও হরিহর চুঁচুড়া আদালত থেকে কোর্টের হুকুমে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে চোদ্দদিনের পর প্রোডাকসান ডেটে হাজির হবার হুকুম দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। আদালত ওদের জামিন মঞ্জুর করেনি। ইব্রাহিমের উকিল এ্যান্টিসিপেটারী বেলের পিটিশান করা আছে, এই দাবী আদালতের কাছে রেখেছিল। পুলিশ ওর জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে ওকে সেফ কাষ্টডিতে রাখার প্রার্থনা করায় আদালত সেইমত নির্দেশ দিয়েছে।

ডেপুটি জেলার অপরেশ লাহিড়ী হাঁক দিয়ে ডাক দিল, 'এই ফালতু কে আছ?' হিরু ও সাদেক হাজির হল। এদের পরনে খদ্দরের হাফ প্যান্ট, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে একটি করে লোহার বেড়ী কোমরে বেল্ট আঁটা আছে।

জেলখানা কোন জিনিষ বাইরে থেকে কেনে না। এক জেলের তৈরী জিনিষ অন্য জেলখানাতে পাঠায় ঐ পোষাক জেলখানাতেই তৈরী হয়। এরা বয়েসে যুবক।

অপরেশ লাহিড়ী, 'হিরু, তুমি ওদের সার্চ করে দেখে নাও ওদের কাছে কি আছে, তা জমা করতে হবে। আর সাদেক, ওদের নাম বাবার নাম ঠিকানা সব মিলিয়ে কেস কার্ড তৈরী করে নিয়ে এস।'

বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বিজলী বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে ওদের পুনরায় গুনীত হল। হিরু ওদের একে একে নাম ডাকল, হাত তুলল, বগল, কোমর ও শরীরের সব অঙ্গ স্পর্শ করে দেখে নিল, কোন জিনিষপত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা। হিরু জানিয়ে দিল,

যার যা পয়সাকড়ি, হাতঘড়ি, কলম, যা কিছু আছে জেলের গেটে জমা দিতে হবে। এটাই জেলের নিয়ম। বিড়ি সিগারেটও জমা রাখতে হবে। তবে অল্প করে পাবে। জেলগেটে একটা ঝুড়ি করে কচুরীজাতীয় খাবার এবং একটা জার্মান-সিলভার হাঁড়ি করে তরকারী এনে গেটের কাছে দাঁড়াল। বংশী ময়রার বংশ পরম্পরায় রাতের আমদানীতে খাবার যোগায়। ঐ খাবার যুগিয়ে ওরা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। অবশ্য জেলার বাবুদের খুশী করতে হয়েছে। আগের চেয়ে কচুরীর সাইজ ক্রমে ক্রমে খেলার মার্বেল—ভেটায় পরিণত হয়েছে। রসগোল্লায় মিষ্টি যত না থাক মুখে মিষ্টির কৃপণতা নেই। কচুরী চারখানা একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েদীর হাতে ধরিয়া দিল আর মাঝারী চামচের এক চামচে আলু কুমড়োর তরকারী। আর একটা ভেঁটা মার্কা রসগোল্লা। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, কয়েদীর হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ। হরিহর ও ইব্রাহিম ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে খাবে কি খাবে না ভাবছে দেখে, হিরু বলে উঠল ও মশাই ওটা খেয়ে নিন, সারারাতে আজ আর কিছু জুটবে না। আবার কাল খাবার পাবেন। হরিহর ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে বলল—'বাবু! ইব্রাহিম খেয়ে নাও, কি আর হবে।' ওরাও খাবারটুকু খেতে আরম্ভ করল। হিরু, 'বংশীদা তোমার যে কচুরী দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে গো। শেষ পর্যন্ত ওকে কচুরী বলে চেনা যাবে তো।' বংশী, 'জেলারবাবু, মাথাপিছু আশি পয়সা বরাদ্দ করেছেন। বাজারে একটা কচুরী আট আনা, আমি চারটে কচুরী আশি পয়সায় দিচ্ছি। তার ওপরে তরকারী, একই রসগোল্লা আবার ফ্রি শালপাতার ঠোঙা ; আর কত দেব বাবু ? এই যা বাজার দর। আমাদের কিছু থাকে না বাবু, কিচ্ছু থাকে না। তবে আমরা বাপ ঠাকুরদার থেকে কনট্যাক নিয়ে জেলখানায় খাবার দিয়ে আসছি, একটা মায়া পড়ে গেছে কিনা ?' বংশী হাঁড়ি উজার করে দরাজ হস্তে যে যা তরকারী চাইল, দিয়ে আবার লোহার গেটে দাঁড়াল। শিউপুজন পাণ্ডে গেটের তালা খুলে বংশীকে তার হাঁড়ি ও ঝুড়ি সমেত বার করে তালা দিয়ে এল।

হিরু হরিহরের পকেট সার্চ করে দু-তাড়া বিড়ি, একটা

লাইটার, একটা গাড়ির চাবি, খুচরো কয়েকটা টাকা পেল। হাতে রুপোর পলা বসান একটি আংটি পেল। হরিহর বিড়ি লাইটার ও পলা বসান আংটি দিতে আপত্তি জানাল।

হরিহর বলল, 'আংটিটা আমার হাতে দেন, ওটা আমার কাছে না থাকলে আমার প্রাণ বাঁচবে না। আর আমি বিড়ি ছাড়া থাকতে পারব না। আমায় আপনারা খেতে না দেন, তাতে কিছু বলব না। দৈনিক দুতাড়া আমার চাই-ই। হিরু—'মেলা বক্ বক্ করবেন না বলছি। যা বলার জেলার সাহেবকে বলবেন। আপনার যা নিচ্ছি—তার তালিকায় সই করে দিন।' হরিহর বাধ্য হয়ে সই করে দিল।

ইব্রাহিমকে হিরু সার্চ শুরু করল। চার প্যাকেট উইলস্ সিগারেট বেরুল। দেশলাই দুটো, একটা কলম, প্যান্টের কোমরের খাঁজ পকেট থেকে দুহাজার টাকার নোট বার হল। হাতে হাতঘড়ি ও সোনার আংটি। এ সবই তালিকা হল এবং ওর সই হল।

সাদেক প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকল, কার কার পরনে কি পোষাক, আর রং কি রকম, বয়স কত, শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে কোন চিহ্ন আছে কিনা, বাড়ী কোথায়, বাড়ীতে কে আছে, এইসব বিবরণ লিপিবন্ধ করে ওদের সই নিয়ে জেলার সাহেবের কাছে কয়েদীদের হাজির করে দিল। ডেপুটি জেলার অপরেশ লাহিড়ী ডিউটি করছেন, তিনি সব কাগজপত্র বুঝে নিয়ে জেলের বড় খাতা বার করে তাতে বিবরণ লিপিবন্ধ করে কয়েদীদের সই বা টিপসই নিতে শুরু করলেন। কয়েদীদের বললেন, 'তোমাদের বিড়ি সিগারেট টাকা পয়সা এখানে জমা থাকবে তা থেকে তোমাদের প্রয়োজনমত পাবে।' অন্যান্য কয়েদীদের শরীরের চিহ্ন দেখে ওদের অফিস থেকে বার করে সারি বন্দী বসান হল। শুধুমাত্র ইব্রাহিমকে একা দাঁড় করিয়ে বললেন, 'আপনার রেকর্ড খারাপ।'

ইব্রাহিম—'কেন ? তার কি কোন প্রমাণ আছে ?'

অপরেশ—'সঙ্গে করে দু' হাজার টাকা নিয়ে জেলখানায় কেন এসেছেন ? এই টাকা এখন রেকর্ড হবে। তার থেকে খরচ দেখান হবে। তারপর জেল ভিজিট হবে। আমাদের বিরুদ্ধে নানা প্রচার

এলিগেশান হবে। আপনাকে ডাণ্ডা বেরি দিয়ে একটা সেলে আটক করতে হবে। ঐ টাকা জমা করে আপনার নামে কেশ দিতে হবে।'

ইব্রাহিম জীবনে জেলখানা দেখে নি। তার ভয় সবচেয়ে ডাণ্ডা বেরীতে, বড় বড় ডাকাতকে জব্দ করার জন্য ডাণ্ডা বেরী দিয়ে দেয়। ঐ ডাণ্ডা বেরীতে ওদের ঘা হয়ে যায়। সে বলল, 'যা জমা করলে হয় করুন।'

অপরেশ—'আপনার নামে এক হাজার টাকা জমা করছি। বাকী এক হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার হাসপাতাল বেড, ফুড এবং এন্টারটেমেন্ট যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। তবে দু-একদিন আপনার একটু অসুবিধা বা কষ্ট হবে।' হাতের একটু পুরানো ক্ষত চিহ্ন রেকর্ড করে সঙ্গে কিছু সিগারেট দিয়ে ওকে ঐ লাইনে গিয়ে বসার জন্য বলা হল।

কয়েদীরা সারি সারি উঁচু হয়ে বসে রইল। লোহার গেট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। আবার গুনতি হল। শিউপুজন পাণ্ডে কাঠের গেটের ছোট দরজায় তালা খুলে দাঁড়াল।

হিরু ঐ কাঠেব গেট দরজা দিয়ে আগে ভেতরে চলে গেল। সারিবন্ধী বসান বন্দীদের একে একে গুনে ছোট দরজা দিয়ে ভিতরে পাঠান হতে লাগল, সাদেক ওদের এইভাবে সারিবন্ধভাবে বসায়। সবশেষে সাদেক ঐ গেটের মধ্যে দিয়ে ভিতরে চলে গেল, আবার কাঠের গেটে তালা পড়ে গেল। বাইরের জগতের সঙ্গে জেলখানার জগতের কোন সম্পর্ক রইল না।

জেলখানার মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমদানী ঘরে ছয় নম্বরের সামনে হিরু, পিছনে সাদেক, কয়েদীদের নিয়ে হাজির হল। পাহারাদার ওসমান বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আবার কয়েদীদের জোড়া জোড়া করে লাইনে বসান হল। ওসমান এসে ফের গুনতি করল। তার নোট বুকে লিখে নিল।

হিরু চিৎকার করে বলল, 'চাচা যে আজকাল গুনে গুনে পা ফেলে চলছ কি ব্যাপার।'

ওসমান—'আরে বাপ, জেলখানার ভিতরটা জংগল হয়ে গেছে, গত মাসে এক সিপাহীকে সাপে কেটেছিল—মারা গেল। শালা

জীবনটা হামার আছে, নকরীতো সরকারের, জীবনটা গেলে তো সরকার দেবে না।'

সাদেক—'খোল—চাচা তাড়াতাড়ি গেট খোল আজ মোটা রকম দাঁও আছে?'

ওসমান—'কেয়া বোলতা, মোটা রকম দাঁ, মালদার কোহি হ্যায়?'

সাদেক—'হাঁ, জী হাঁ।'

ওসমান—'আগাম গুনতি হোগা, তব ফটক খোলেগা। চাবি বার করে দুনম্বর রুমের গেট খুলে দাঁড়াল দুটো দুটো করে কয়েদী ঘরের মধ্যে ঢোকাল। গোনা শেষ হল, হিরু ও সাদেককে ভিতরে ঢুকতে বলল, হিরু ও সাদেক ভেতরে ঢোকার পর আবার লোহার গেট বন্ধ হল, ওসমান চাবি দিয়ে তালা লাগিয়ে দিল। তালা টেনে দেখে নিল, হাঁ ঠিক হয়েছে। তার খাতার লেখার সঙ্গে মিল করে নিল।

হিরু—'চাচা, আধ ঘন্টা বাদ আসুবে।'

ওসমান—'হাঁ হাঁ জরুর।'

জেলের বাইরে বড় বড় আলো, দিবালোকের মত করা হয়েছে। পাহারাদাররা সব ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু জেলের ভেতরে আলোর খুব অভাব, এখানে খুবই মৃদু। আবছা আলোয় শুধু কয়েদীদের মুখ চেনা যায়। ঘরের মধ্যে মেঝেতে কম্বল পাতা, এখানেই সবাইকে গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হবে। ঘরের মধ্যে প্রস্রাবের ড্রাম, পায়খানার ড্রাম আছে—ঐখানেই প্রস্রাব, পায়খানা করতে হবে, বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। হিরু চিৎকার করে বলল, 'যে যার-জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়, আর ঘর নোংরা করলে পিটানী হবে।'

হরিহর দত্ত ইব্রাহিমকে বলল, 'মশাই সিগারেট বার করুন।' সঙ্গে সঙ্গে হলের মধ্যে চিৎকার সিগারেট। সাদেক বলল, 'চুপ কর শালারা, এখন সিগারেট দিয়ে শুরু হবে, তারপর দেখবি কোথায় যায়। হিরু—'এই মানা, বোচা, যোগীন্দর, ভুলু এধার আও। মানা, বেচা, যোগীন্দর, ভুলু চারজন হচ্ছে ওদের দুজনের অ্যাসিসটেন্ট। এই আমদানী ঘরে ওদের ডিউটি। ওরা গিয়ে

হাজির হল হির্ুর কাছে। হির্ু চিৎকার করে বলল, 'ঐশালা জামাইবাবুর কাছে সিগারেট আছে যা নিয়ে আয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে চিল ছোঁ মেরে চারজন ইব্রাহিমের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জামার পকেটে হাত ভরিয়ে দিল। জোয়ান ছেলে, সে রোখার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না—দু প্যাকেট সিগারেট বার করে নিয়ে হির্ুর হাতে দিল।

মোদক চিৎকার করে, 'আমি আছি মনে যেন থাকে।'

হির্ু—'আমরা ছজন, বাইরে সিপাইজী আজ এক প্যাকেট ফর্সা করা হোক' বলে সিগারেট ভাগ হয়ে গেল। লোহার বড় বড় গরাদ, গরাদের ফাঁক দিয়ে, 'ও সিপাহীজি ইধার আইয়ে।'

ওসমান—'কাহে চিল্লাতা হ্যায় ?' বলে জানলার কাছে এল। সিগারেট বার করে ওর হাতে হির্ু দিল। দেশলাই জেবলে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে সিগারেট ধরাধরি।

হির্ু—'আপলোক ডিউটি মে যাও ফিন আধাঘন্টা বাদ এসতরফ আয়েগা।'

ওসমান কাঁধে বন্দুক নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল।

সাদেক—'এই পাঁচু এদিকে আয়। তুই কি করেছিলি তুই জেলে এলি কেন ?'

পাঁচু—'আমি একটা ছাগল চুরি করেছিলাম।'

হির্ু—'ওটা পাঁঠা না পাঁঠি ?'

পাঁচু—'ওটা পাঁঠি।'

হির্ু—'ভুলু ওরপিছনে একটা লাথি মার, ওকে বিছানায় শুইয়ে দে।'

ভুলু—পাঁচুর পিছনে একটা লাথি মারল, পাঁচু পড়ে গেল। ওকে শুইয়ে দিয়ে কম্বল চাপা দিল।

হির্ু—'এই মুন্না। তুই এদিকে আয়। তুই কি করেছিলি ?'

মুন্না—'আমি একটা মেয়েকে···'

হির্ু—'ওরে ব্যাটা, সাবাস্—তবে তুই কাঁই কুই করছিস কেন ? যা ঐখানে যা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়।'

সাদেক—'রয়হান, তোর কি হল ? তুই জেলখানায় ?'

রয়হান—'আমি শালা ডাকাতি করতে গিয়ে দুটোকে ফাঁসিয়েছি। আমায় ধরতে পারে নি। আমায় সন্দেহ করে ধরেছে।'

সাদেক—'শালা গুরু আছিস সাবাস্। হরিহর তোমার কি হয়েছে?'

হরিহর—'আমি ড্রাইভার টাক্সি চালিয়ে নিয়ে গেছি বলে আমায় ধরেছে।'

হিরু—'মানা, একে নিয়ে যা, বেশ করে ওলট কম্বল করে দে।'

মানা হরিহরকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কম্বল জড়িয়ে ধপাধপ ঘা কতক দিতে লাগল। হরিহর যন্ত্রণায় বাপরে মারে বলে চেঁচাতে লাগল।

হিরু—'বাবা মাল কড়ি ছাড়ো চাঁদা লাগবে। বল কাল দেব।'

হরিহর—'হ্যাঁ কাল আমি চাঁদা দেব।'

হিরু—'মানা ওকে শুইয়ে দে। যোগীন্দর তুই দেশ থেকে চলে এলি কেন?'

যোগীন্দর—'পাঞ্জাব মে হররোজ আদমী খতম হোতা হ্যায়। কই জিন্দা হ্যায়, ওভি আচ্ছা নেহি হ্যাঁ, হাম চাচাকে ঘরমে যানে কো লিয়ে আয়া হ্যায়। বাণ্ডিল মে, হামকো পাকড় লিয়া।' সাদেক, 'ইব্রাহিম, তোমায় বাপু মোটা টাকা চাঁদা দিতে হবে?'

ইব্রাহিম—'কেন? এতো তোমরা অত্যাচার করছো। সরকার কি তোমাদের এইসব করার জন্য রেখেছে?'

হিরু—'শালা একচড়ে বদন বিগড়ে দেব। বলার সঙ্গে ধপাধপ, ঘা কতক কিল চড় পড়ে গেল।'

সাদেক—'জেলার বাবুর বেলায় পাঁচশ টাকা। কেন, হাসপাতালে বেড হবে, রোগীর খাবার দেবে। আমরা ফ্যালনা। আমাদের যদি পাঁচশ টাকা না দাও তা হলে তোমাকে রোগী বানিয়ে সত্যি সত্যি হাসপাতালে পাঠাব।'

হিরু—'বল শালা দিবি কিনা? আমরা কি ঐ টাকা আমাদের মাগ ছেলেদের খাওয়াব? এই জেলখানায় যারা কয়েদী আছি সবাই ফিষ্টি করে খাবো।'

ইব্রাহিম—'এই কথা আগে বলনি কেন?'

হিরু—'এটা আমাদের আমদানী ঘরের নিয়ম।'

ইব্রাহিম—'আচ্ছা, তাই হবে ?'

হিরু—'তা হলে কাগজে লিখে দাও।'

ইব্রাহিম—'আমার কাছে কোন কাগজ কলম নেই।'

হিরু—'আচ্ছা আমি কাগজ কলম দিচ্ছি।'

হিরু একটি পাতা ও একটি কলম ইব্রাহিমকে দিল।

ইব্রাহিম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে যাচ্ছিল। হিরু বলল—'দাঁড়াও, শুধু লিখে দাও পাঁচশ টাকা দেব।' ইব্রাহিম কথামত লিখে দিল।

হিরু—'তুমি জেলে এলে কেন ?'

ইব্রাহিম—'তোমার জেনে কি লাভ ?'

হিরু—'শালা হারামী, শালার মনে প্যাঁচ। যা শালা শুয়ে পড়গে। তুই তো আমার এক রাত্রিরের খদ্দের। তোর তো কাল থেকে হাসপাতালে বেড হবে জানি। মেডিকেল ডায়েট। দেখবি শালা তোর ভুঁড়ি নেবে যাবে ? !'

ইব্রাহিম—'দেখল, এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ড্রামের কাছে গিয়ে প্রস্রাব করে হরিহর দত্তের কাছে শুয়ে পড়ল। হিরু, সাদেক, মানা, বোচা, ভুলু সবাই গোল হয়ে বসল, ভুলু গাঁজার কলকে বার করে গাঁজা ভরতে লাগল।

সাদেক—'সিপাহী জি, সিপাহী জি।'

ওসমান—'হাম যাতা হ্যায়, হো গিয়া'

সাদেক 'হো গিয়া।'

ওসমান জেলের বড় জানলার কাছে গরাদের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। হিরু ওর হাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে গাঁজার কলকেটা ধরিয়ে দিল। কলকেতে দেশলাই জেবলে আগুন ধরিয়ে দিল। ওসমান গাঁজার কলকেতে টান দিতে লাগল। আওয়াজ এল, 'এই ওসমান, হামলোগ ভি হ্যায়' আর দু তিনজন সিপাহী এল। ওসমান গাঁজার কোলকেতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওদের হাতে দিল। ওদের কেউ কেউ কলকে হাতে করে নমস্কার করল, শিউজীকে স্মরণ করল, কলকেতে টান দিয়ে আবার অন্যের হাতে দিয়ে দিল। নিজের

নিজের ডিউটিতে চলে গেল। গাঁজার কলকে লোহার গেট দিয়ে আবার কয়েদীদের ঘরে চলে গেল। হিরু কলকে নিয়ে টান দিল, ওদের মধ্যে পরস্পর চলতে লাগল। কম্বল নড়ে উঠল, দু-একজন বসে পড়েছে দেখে হিরু বলল, 'চলবে না কি?' তারাও প্রসাদ পেল।

ইব্রাহিম শুতে পারছে না, কম্বলের মধ্যে ছারপোকা আর চুলচুলে কামড়াচ্ছে। ঘুচ ঘুচ নড়ছে। ফিস ফিস করে সে হরিহরকে বলল —'দত্তবাবু কোর্টে কি বলে এলে?' দত্ত চুপ করে আছে, যদি দত্ত কিছু বলে তাহলে আবার মার খাবে। তাই সে চুপ করে আছে। হিরু সাদেক মিলে মিটিং করতে শুরু করল, ঐ টাকায় কি হবে। সাদেকের প্রস্তাব এল, মেগলাই পরটা আর মাংস, আর কোল্ডড্রিংক একটা করে হবে। সবাই তো মেনে নিল। সেইভাবে জেলারকে অর্ডার দেবার দায়িত্ব হিরু নিল।

ইব্রাহিম—'ও দত্তবাবু, কোর্টে কি বলেছ।' হাকিম, সাদেক —'এই বকবক করবিনি বলে দিলাম। এবার যদি আওয়াজ পাই খারাপি হবে। সাদেক ও হিরু ওদের নির্দিষ্ট কম্বলে শুয়ে পড়ল। তারপরই ওদের নাক ডাকা শুরু হল। ইব্রাহিম ও দত্তবাবু পারল না।

উনিশ

কলকাতা গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে রজনীগন্ধা হল। সন্ধ্যা ছটায় সভা বসেছে। সভার উদ্যোক্তা হুগলী জেলা বালিখাদ মালিক অ্যাসোসিয়েশন। কাঠের সিঁড়িতে লাল কারপেট বেয়ে হল ঘরের দোতলায় যেতে হয়। মাঝে মাঝে পিতলের পাত্রে নানা দেশী বিদেশী গাছ-গাছরা দিয়ে টব সাজান আছে। হল ঘরে প্রচুর লাইট। মাঝখানে ফাঁকা। চারিদিকে টেবিল, টেবিলের চারিদিকে নানা রঙের ছাল, সাদা পাথরে বাঁধান মেঝে, মেঝেয় কাশ্মিরী কারপেট। তারপর সাজান চেয়ার, চেয়ারে শম্ভু শেঠ, তারাপদ পান, ইসলাম, ইসমাইল, কে মল্লিক, হায়দর আলি হুগলী জেলা বালিখাদ অ্যাসোসিয়েশান এর কর্তাব্যক্তিরা সব এসেছেন ও বসেছেন। ডাঃ বি. চ্যাটার্জী

অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি আসবে বলে জানিয়েছেন। এই কথা কে মল্লিক জানাল। শম্ভু শেঠ বলল, 'যখন মধু ছিল তখন সব ছিল, এখন জেনারেল সেক্রেটারী মহম্মদ ইব্রাহিম জেলে।' তারাপদ, 'আমি জানতে চাই আমাদের মিটিং-এর কোন জায়গা ছিল না, এতদূরে এসে এত পয়সা খরচ করে এখানে মিটিং করতে হচ্ছে। আর মিটিং করেই কি হবে? বালির গাদা, গাদা হয়ে পাহাড় হয়ে গেল। আমরাও শেষ হয়ে গেলাম। জেনারেল সেক্রেটারী জেলে আটক ওকে বার করতে হবে। ম্যাও ধরার লোক চাই।' হায়দার আলি—'আমার শেয়ারের টাকা জেনারেল সেক্রেটারী মেরে দিয়েছে, আমাকে দেয়নি। আমার সর্বস্ব চলে গেছে,—আমার বৌয়ের গহনা বিক্রীর টাকা, জমি বন্ধক দিয়ে আমি খাদের জন্য টাকা দিয়েছি। আর উনি জীপ দাঁড় করিয়েছেন আর সরকারের কাছ থেকে যা টাকা পেয়েছেন নিয়ে চলে গেছেন। আমার কি হবে?' ইসলাম ও ইসমাইল দুজনে উঠে দাড়িয়ে, 'কি যচ্ছে? আপনাদের কি এখন ঝগড়া করার সময়? নিজেরাই যদি ঝগড়া করি তবে এখানে আসার কি দরকার ছিল? যদি আপনারা ঝগড়াই করেন, আমরা আর এই মিটিং-এ থাকতে চাই না।'

শম্ভু শেঠ—'সত্যিই তো, এখন ঝগড়া করার সময় নয়। যে ভাবেই হক আমাদের বাঁচতে হবে। আমর ডাঃ এম. চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি এখনই এসে পড়বেন।'

হায়দর আলি—'ডঃ এম. চৌধুরী এলেও কিছু হবে না। আমাদের টাকা উনিও নিয়েছেন আর জেনারেল সেক্রেটারীও নিয়েছেন। সবাই মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে।'

ইসলাম—'চাচা, তুমি থামবে কি না? আমরা মিটিং বন্ধ করে চলে যাব? এখানে যখন এসেছ একবার দ্যাখো না কি হয়?'

ঘরের মধ্যে কলিং বেল বেজে উঠল, গেটের কাছে ইসলাম ছুটে গেল, মুখে আঙুল দিয়ে ইসারায় জানাল ডঃ এম. চৌধুরী এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আসুন।' ডঃ চৌধুরী হল ঘরে এসে গোল টেবিলের কোনায় একটি গদি আঁটা চেয়ারে বসলেন। কে. মল্লিক, ইসলাম কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

ইসলাম—'এক কাপ করে চা খেয়ে মিটিং শুরু করলে কেমন হয় ?'

শম্ভু শেঠ—'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।' বেল টিপতেই একজন সাদা পোষাক পরিহিত বেয়ারা হাজির হল। ইসমাইল তাকে এক কাপ করে চা আর একটা করে নোনতা আনতে আদেশ দিল। বেয়ারা ট্রে করে এনে কাপ ডিসে চা দিল এবং প্লেট ভর্তি বিস্কুট দিল। যে যার তুলে নিয়ে চা পান করতে লাগল।

ডঃ এম. চৌধুরী—'অ্যাসোসিয়েশান কি খুব গরিব হয়ে গেছে ?'

কে. মল্লিক, 'হ্যাঁ স্যার সত্যিই আমরা গরীব হয়ে গেছি আমাদের ব্যবসা একেবারে বন্ধ। আমাদের নিজেদের মধ্যে কলহ হচ্ছে।'

ডঃ এম. চৌধুরী—'তা হলে সমস্যাগুলো আগে শুনে নেওয়া ভাল, তা না হলে আলোচনাটা ভালভাবে করা যাবে না মাঝে মাঝে সমস্ত ভাবনা চিন্তা বাধা পাবে। আপনারা সমস্যাগুলো একে একে বলুন, আর আপনাদের আমার পাশ এসে সমস্যাগুলি যা রিপোটিং হবে সেগুলি রেকর্ডিং করুন। আমি যাতে আপনাদের জবাব দিতে পারি।' সকলে সম্মতি জানিয়ে বলে আচ্ছা ঠিক আছে। শম্ভু শেঠ বলল—'আমি রেকর্ডিং করব। তবে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মহম্মদ ইব্রাহিমকে একটা নোংরা মকদ্দমায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রেখেছে। ওকে যাতে জামিন করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

তারাপদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের কলকাতায় এসে মিটিং করতে হচ্ছে কেন ? আমাদের ওখানে কি মিটিং-এর কোন জায়গা ছিল না ? আমাদের যাতায়াতের জন্য দুবার গাড়ী ভাড়া, সারাদিন নষ্ট। সারাদিনের কাজ নষ্ট।'

ইসলাম—'বালিখাদের আমরা রয়েলিটি দিয়েছি, জমির দাম দিয়েছি, শ্রমিকদের মজুরী দিয়েছি, বালি তুলে গাদা দিয়েছি। আজ বালি বিক্রী করতে পারছি না। জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে। তারা বালিখাদের বালি বিক্রী বন্ধ করে দিয়েছে।' ইসমাইল—

'আমরা অনেকে বর্তমান বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে বালির খাদ করা হবে বলে জমি খরিদ করেছি। সেই জমি পড়ে আছে। যার জমি সেই চাষ করছে। আমরা বালির খাদ করতে পারি নি। আমাদের ব্যবসায়ে যেটুকু পুঁজি ছিল তা আমরা নিজেরাই শেষ করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের হাত কামড়াচ্ছি, আর মনে মনে বলছি আমরা আমাদের কি সর্বনাশ করেছি।'

হায়দর আলি—'আমারও সেই একই কথা। আমি ছা-পোষা লোক। সামান্য জমি জমা আর আমার স্ত্রীর কিছু গহনা সম্বল ছিল। আমাদের সেক্রেটারী খাদের শেয়ারের লোভ দেখালে, আমি স্ত্রীর গহনা সব বিক্রী করে জমি বন্ধক দিয়ে বালি খাদের শেয়ার কিনলাম। আর টাকাগুলিই মারলেন। আমায় এক পয়সা দেয় নি। এইভাবে অ্যাসোসিয়েশান হবে। আমি তা হলে বাঁচব কি করে?' কে· মল্লিক—'আমরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আপোষের অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করছে না। আমরা এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছি সবেতেই রাজী, ওদের কেবল এক কথা ওদের নামে যে কেস আছে তুলে নিতে হবে। একজনের একটা মেয়ে কার সঙ্গে উধাও হয়েছে তা নিয়ে আমাদের সেক্রেটারীকে মকদ্দমায় জড়িয়েছে। বলি কার মেয়ে যদি কার সঙ্গে ভাব করে চলে যায় তাতে বালিখাদের অ্যাসোশিয়েশানের কি অপরাধ? তাই বলি স্যার আমাদের ঘাট হয়েছে আর আমরা এই ব্যবসা করব না। শুধু আপনার কথায় আমরা ধ্বংস হলাম।'

ইসলাম ও ইসমাইল—'কাকা তুমি বাপু অহেতুক স্যারকে দোষারোপ করছ! উনি আমাদের যা করেছেন, যা পরামর্শ দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। আমাদেরও অনেক দোষ আছে সে কথা তো বলছ না। কে· মল্লিক—'আমি দুঃখে, শোকে এই কথা বলেছি। এখন আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।'

ডঃ এম. চৌধুরী—'আমি তা হলে এবার আমার বক্তব্য আপনাদের কাছে পেশ করি।'

ইসমাইল—'একটু টিফিন খেয়ে তারপর শুরু করলে ভাল হয় না? নইলে মাঝে অসুবিধা হবে।' সকলে সমস্বরে—আচ্ছা তাই

হক। ইসমাইল কলিং বেল টিপে, বেয়ারাকে ডাকল। আগে থেকে অর্ডার দেওয়া ছিল। বেয়ারা প্রত্যেকের কাছে একটা করে প্লেট ট্রেতে করে হাজির করল। তাতে চানাচুর, কাজুবাদাম, মাখন দেওয়া বিস্কুট আর একটা করে সিঙ্গাপুরী কলা ও একটা সন্দেশ দেওয়া আছে। সবারই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছিল। পরমানন্দে সকলেই শুরু করে দিল। টিফিন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম কফি এক কাপ করে দিয়ে গেল।

শুরু হোল ভাষণ ডঃ এম. চৌধুরীর। তিনি প্রথমেই সকলকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করলেন—এভ্রী অ্যাক্সন হ্যাজ রিএ্যাকসন। প্রত্যেক কাজের মধ্যেই ভালমন্দ আছে। আমরা যখন ভাল হয় তখন নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করি। যখন কোন প্রকার গোলমাল হয় তখন তার দায়টা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করি। কথাটা কটু হলেও আপনাদের শুনতে হবে। ওষুধ তিতো হলেও খেতে হয়। তাতে ডাক্তারের চেয়ে রোগীর কল্যানই বেশী হয়। এখানে এমন কেউ আছেন যিনি বলবেন তার লাভ হয় নি। এমন কেউ আছেন—যিনি বলবেন সরকারকে পূর্ণ রয়েলটি দিয়ে ব্যবস্থা করেছেন? সরকারের মকদ্দমা যে সব লোকেদের নামে তাদের অধিকাংশ লোকের কোন অস্তিত্ব নেই। যাদের সঙ্গে জমির যে দামের কথা, তারা কি সেই দাম পেয়েছে? এইসব মিলিয়ে দেখলে ব্যবসায়ে আপনারা যে টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলেন, তা আপনাদের উঠে গেছে। কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আপনারা সংযম হারিয়ে ফেলেছেন। বলুন তো—দো / তিন ফসলী জমি আপনারা নষ্ট করেন নি। চাষের জমি তো আমাদের জাতীয় সম্পদ। জন্মহার যেভাবে বাড়ছে, চাষের জমি বাড়ছে না। মানুষকে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। চাষের জমি নষ্ট হলে মানুষের বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলি আগে দুর্গম ছিল কোন রকমে যানবাহন চলাচল করতে পারত না। এখন গ্রামের অনেক রাস্তা পীচের তৈরী হয়েছে। যে সব রাস্তা পীচের তৈরী হয়েছে তার ধারে বালি খাদ হওয়ার পর, রাস্তার ছাল চামড়া উঠে গেছে। অনেক গরীব আদিবাসীদের বাস্তু চলে গেছে। তারা বাস্তু পায়নি।

মেয়েদের সম্মান হানি হয়েছে। এর প্রতিবাদ হয়েছে। তারপর মানুষ খুন হয়েছে। অর্থের লালসা বাড়তে বাড়তে নিজেদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্বে আপনারা লিপ্ত হয়েছেন। আমি কি আপনাদের সমাজের মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে বলেছিলাম ? আমি কি বলিনি, ব্যবসাদারকে হতে হবে সমাজের বন্ধু। তাঁরা ব্যবসা করবেন সমাজের সেবক হিসেবে। সমাজের সেবা ব্যবসায়ের মধ্যে আপনারা করে থাকেন। আপনারা যতক্ষণ নিজেদের বেঁচে থাকার মত মুনাফা নেবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনারা দেশের সেবক থাকবেন। আর যখনি অন্যপথ ধরবেন, তখন আর ঐ মর্যাদা থেকে আপনারা নিজেদের সরিয়ে নেবেন।'

কে. মল্লিক—'স্যার আমাদের অন্যায় হয়েছে, আমরা আপনার কাছে মাপ চাইছি। আপনি ক্ষমা করুন।'

ডঃ এম. চৌধুরী—'আমি কে ?—আপনাদের ক্ষমা করার ? আমার কাছে তো আপনারা কোন অপরাধ করেন নি ? আপনাদের আপনার দেশের লোকেদের কাছে ক্ষমা চান। তাদের কাছে এটা স্বীকার করুন। আপোষে মিটিয়ে নিন।'

ইসলাম—'না কোন মতেই আর সম্ভব নয়। আমাদের মান ইজ্জত নষ্ট করে ওদের কাছে আমরা মীমাংসা চেয়েছি—ওরা মীমাংসা করে নি। ওরা আমাদের কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এর প্রতিশোধ নেব—প্রতিশোধ নেবই।'

ডাঃ এম. চৌধুরী—'আমি বুদ্ধিজীবি। আমার একটাই কাজ বুদ্ধি বিক্রী করা। তাই দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ও আমার সংসার প্রতিপালন করা। বাজারে বুদ্ধিজীবির অভাব নেই। আপনারা আমার খরিদ্দার। আমি আপনাদের ছেড়ে দিলে, আপনারা অন্য লোক খুঁজে নেবেন। আমি বেকার হয়ে যাব।'

সকলে হোঃ হোঃ হাসি।

'হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি হয়তো জানেন না, আমার বাবা রেলে চাকুরী করতেন, কিন্তু স্বদেশী করার জন্য তাঁর ইংরেজ আমলে চাকুরী চলে যায়। যতক্ষণ তিনি সুস্থ শরীরে ছিলেন, ততক্ষণ আমাদের বাড়ীতে কত নেতা আসতেন, বাবা তাঁদের ফরমাস মত

কাজ করতেন। যেই বাবার পক্ষাঘাত হল, আর ঐ নেতারা কেউ এল না। বাবাকে মা তিরস্কার করতেন। তাঁর সততার মূল্য কেউ দেয় নি। বাবা মারা গেলেন। ববার বন্ধুরা সরকারে এসে তাঁদের ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনের নানা সরকারী চাকুরী গুছিয়ে নিলেন। আর আমি যখন গেছি, আমাকে তাঁদের চিনতে কষ্ট হয়েছে। বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারের খাতিরও চলে গেল। তাই আর আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিইনা বা কার হাতে তুলে দিই না।' সকলে করতালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। 'স্যার বাঁচার পথ বলুন

ডাঃ এম. চৌধুরী—'হ্যাঁ আমি বাঁচার পথ বলার জন্যই তো এসেছি। কিন্তু আমার পনের হাজার টাকার ড্রাফট এখনও পাই নি সুতরাং আমি তো বলতে পারছি না—আমি কি খেয়ে বাঁচব।'

কে. মল্লিক—'আমরা কি এতই অবিশ্বাসের পাত্র। আপনাকে যা দেব বলেছি তা দিতে পারব না। এই নিন আপনার পনের হাজার টাকার ব্যাঙ্কড্রাফট। কে. মল্লিক ব্যাঙ্কড্রাফটটি ডঃ এম. চৌধুরীর হাতে দিলেন। তিনি সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলেন। এবং পকেটে রাখলেন।

ডঃ এম. চৌধুরী—'আমি প্রথমেই আপনাদের কাছে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে বলছি—আমি বুদ্ধিজীবি, আমার কাজ বুদ্ধি বিক্রী করা। আমি কোন জনপ্রতিনিধি নই, বা মন্ত্রী নই যে দেশের কল্যাণের জন্য জনগণ কর্তৃক দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাজারী সংবাদপত্র পড়েছেন, তারা যেমন মালিক শ্রেণীর টাকায় পরিচালিত হয়, সেখানে আমার মত অনেক বুদ্ধিজীবি কাজ করেন। তাঁদের বিবেক আছে। কিন্তু নিজেদের বাঁচার তাগিদে তাঁদের কাছে দেশ বড় নয়। বড় কথা হল মণিব। আপনারা আমার মণিব তাই আমার কাছে কোন নীতি নেই। আপনাদের স্বার্থ দেখাই আমার কাজ।'

কে. মল্লিক—'স্যার বাঁচার রাস্তা আপনি দেখান।'

ডাঃ এম. চৌধুরী—'বাঁচার রাস্তার জন্যই এই কলকাতায় মিটিং

ডাকতে বলেছি। আর আপনাদেরও কথা দিতে হবে আমার কথা আপনাদের মধ্যে থাকবে। কাল আর আপনাদের কেউ কোথাও কোন গল্প করবেন না, এটা আমার নির্দেশ।' সকলে সম্মতি জানাল।

প্রথমে কথা ছিল আজ থেকে আপনারা আর কোন গরীব লোকদের গায়ে হাত দেবেন না। আপনাদের ভালোর জন্যই এটা আমার নির্দেশ গরীবদের জন্য নয়। ওদের ভাল করার ক্ষমতা আমার নেই। স্বয়ং কার্ল মার্কস ওদের ভাল করতে পারে নি। ওরা যে পাতে খায়, সে পাত ফুটো করে, আমি তো কোন ছাড়। আপনারা গরীবদের গায়ে হাত দিলে ওরা দল বেঁধে মিছিল করবে মিটিং করবে ঘেরাও করবে তাই ওদের আর ঐ সংগ্রাম করার সুযোগ নয়। ওদের শ্রেণীসংগ্রাম ভোঁতা করে দেবার জন্য ওদেরই এক শ্রেণীকে দালাল করে ওদেরই দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। এতে আপনাদের মুনাফা একটু কমলেও আখেরে আপনাদেরই ভাল হবে।'

কে. মল্লিক—'স্যার আমাদের বাঁচার রাস্তা বলুন।' বেশ তাই বলে দিচ্ছি। কোনও ব্যবসা দুইনম্বর ছাড়া চলে না। তাই আপাতত আপনাদের দামোদরের বালি আনতে হবে, আর বাঁকুড়ার মোরাম, দুটো মিশিয়ে দিয়ে কালারিং করে দিলেই বাজারে পাণ্ডুয়ার বালি বলে চড়া দামে বিক্রী হবে। দেখেন না, তারকেশ্বর যেতে আলু ব্যবসায়ীরা কোল্ড ষ্টোরের থেকে আলু বার করে ইঁটগুড়ো দিয়ে রং করে মাদার সীড বলে বাজারে বিক্রী করে। তাই চাষীরা নিয়ে নিয়ে চাষ করছে। আপনাদের বালিও চড়া দামে বিক্রী হবে। দেখেন না, অনেক রাজনৈতিক নেতা ফুটবল খেলোয়াড়ের মত জার্সী বদল করে অন্য দলে গিয়ে খুব ভালই খেলে। পরে বেনোজল এসে ঘোলা জলকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। আপনাদেরও সেইরকমই করতে হবে।' সকলের মধ্যে প্রবল হর্ষধ্বনি।

ডাঃ চৌধুরী—'আপনারা তো দীর্ঘসংগ্রাম করেছেন, ওদের সঙ্গে শত্রুভাবে লড়াই করে ওদের পরাজিত করতে পারবেন! ওদের পরাজিত করতে হলে ওদের মিত্রভাবে ওদের মধ্যে মেলামেশা করতে হবে। ওদের হয়ে কাজ করতে হবে। সময় ও সুযোগ বুঝে ওদের আক্রমণ করতে হবে। ওদের মধ্যে যারা চরিত্রহীন লোভী তাদের

খুঁজে বার করতে হবে। তাদের নিয়ে আপনাদের ব্যবহার করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র যেমন কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভীষণকে ব্যবহার করেছিলেন, ইংরেজরা যেমন মিরজাফরকে ব্যবহার করেছিলেন ভারতের মাটিতে যারা দুর্বল তাঁদের যদি বৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করতে হয়, বিভীষণ চাই। যে সব গরীব মানুষ সমাজে ন্যায়, নীতি ও আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছেন, সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য আত্মত্যাগে করেছেন, কয়েকজন মুখোসধারী ভ্রষ্টাচারী চরিত্রহীন ব্যক্তিই ওদের মুখে কালিমালিপ্ত করতে সক্ষম, সংগ্রামে যেখানে জয় লাভ সম্ভব নয় সেখানে কৌশল অবশ্য চাই।'

সকলে সমস্বরে, 'চমৎকার, চমৎকার ; এ না হলে অর্থনীতিবিদ।' ডঃ চৌধুরী, 'আর একটা কথা বাকী, সেটা হচ্ছে, টাগ্-অব-ওয়ার, তার মানে ধর্মযুদ্ধ। গীতা পড়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী। তিনি গীতায় কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলেছেন কেন ? ক্ষেত্রের প্রভাব আছে। যে ক্ষেত্রে অগ্নি জ্বলে সে ক্ষেত্রে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। যে ক্ষেত্রে জলরাশি আছে, শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। ধর্মক্ষেত্রে মানুষের মনে ধর্মের উদয় না হয়ে মারামারি কাটাকাটি হল কেন ? কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ এবং অহংকার মানুষকে নরকগামী করে। তাই আজ যারা অহংকার করছে আদর্শ ও নীতির কথা মুখে বলছে, অথচ আদর্শ ও নীতি পালন করেনা। জনগন তাদের আস্থা ওদের উপর রাখতে পারে না। সেই জন্য ধর্মযুদ্ধ টাগ্-অব্-ওরার প্রয়োজন ধর্ম রজ্জুর দুই প্রান্তে একদল হিন্দু আর অপরদল মুসলিম। এরা কেউ মানব ধর্ম পালন করেন না, অথচ ধর্মকে অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই যে সব জায়গায় পরিত্যক্ত মসজিদ আছে, না থাকলেও মসজিদ বলে প্রচারিত করতেই হবে। ধর্মের পুজা পার্বনের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। নিজের অর্থে কোন সময়ে স্ফুর্তি হয় না, দেশের বেকার ও সমাজ বিরোধী যুবকরা যাতে জনগণকে বধ করে অর্থ সংগ্রহ করে তারা স্ফুর্তি করতে পারে তাদের সুযোগ করে দিতে হব। এই ধর্ম যুদ্ধ হলে, দেশে শশ্মানের শান্তি হবে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দেশে শশ্মানের শান্তি এসেছিল।

মাননীয় মহোদয়গণ, আপনারা নিজেরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লালসায় প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন, আপনাদের কাছে দেশ জাতি বলে আছে শুধু ক্ষমতার মোহ, আছে শুধু অর্থের লালসা। আমি যেহেতু আপনাদের কাছে অর্থ গ্রহণ করেছি, আপনাদের নুন খেয়েছি তাই আপনাদের সেবা করার জন্য যে উপদেশ দিলাম, তাতে আমার বিবেকের দংশনে আমি অবিরত দংশিত হব। কিন্তু আমি বেইমানি করিনি।' সকলে, গুরু, গুরু, গুরু বলে উৎসাহ করল। ডঃ চৌধুরী, এবার সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ইসমাইল—'এইবারে শালারা কোথায় যাবে, কতকগুলো ছোট লোককে মাথায় তোলা হয়েছে। ওদের দিয়ে আমাদের বারে বারে অপমান করা হচ্ছে।'

ইসমাইল, 'ক্ষেতে আলে কোনদিন সমান হয়?' কে· মল্লিক, 'ধর্মক্ষত্রে কুরুক্ষেত্র এই সংগ্রাম আমাদের ধর্মযুদ্ধ আমাদের জিততেই হবে।'

সবাই বাড়ী ফেরার জন্য একে একে উঠে দাঁড়াতে লাগল, সভার পরিসমাপ্তি হল।

কুড়ি

সেসন জজের আদালত চুঁচুড়া, জেলাজজ মিঃ গাঙ্গুলী এজলাসে বসে আছেন। গায়ের রং ফর্সা—বয়েস চল্লিশের ওপর, ব্যবহার অমায়িক হলেও বিচার কঠিন ও কঠোর। হরিধন রক্ষিত পেশকার। কাঠের ফ্রেমে লাল কাপড় দিয়ে ঘেরা উপরে ডায়াসে জজ সাহেবের এজলাস।

এজলাসে হুইল লাগান ডিংডং চেয়ারে বসে আছেন সেসনজজ মিঃ গাঙ্গুলী। পেশকারের সামনে কাঠের ফ্রেমে লাল কাপড় ঘেরা। মাঝে মাঝে লাল শালু বেশ খানিকটা ছেঁড়া, তার মধ্য দিয়ে মকর্দমার তদ্বিরকারকদের কাগজ ও কাগজের সঙ্গে হাত যাতায়াত করে। হরিধন ন্যায় বিচারের স্বার্থে লাল শালুর বেষ্ঠনী মধ্যে উভয়ের স্বার্থে কিছুটা ফাঁক করে দিয়েছেন। হাকিম জানেন অবশ্য তিনি দেখেও দেখেন না, ওদিকে নজর দেন না। পারসোনাল ফাইলের মকর্দমা চলছে।

জজ সাহেবের সামনেই সাক্ষীর কাঠ্‌গড়া এতে সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে হলপনামা নেয়, পেশকারের বসার জায়গা ঘেরাপাদে। উকিলরা কাল-কোট গাউন গায়ে গলায় সাদা ব্যাণ্ড পরে বসে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। উকিলবাবুদের বসার ঠিক পিছনেই কাঠের ফ্রেমে গরাদে তার দিয়ে ঘেরা দুই কামরা কাঠগড়া। আসামীদের জেল হাজত থেকে এনে কাঠগড়ার মধ্যে মুক্ত অবস্থায় বন্ধনবিহীনভাবে বিচার শুরু হয়। মহিলা ও পুরুষ আসামীর একই সঙ্গে বিচার শুরু হয় আলাদা আলাদা কাঠগড়ার কামড়াতে রাখার ব্যবস্থা আছে। আদালতের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দোতলায় খোলামেলা জায়গা। বিচারপ্রার্থীরা সাক্ষী ও পুলিশ এখানে দাঁড়িয়ে বসে অপেক্ষা করে। আরামবাগ গোঘাট এলাকার মানুষ দায়ড়া মকর্দমায় আসামী হয়ে দিনরাত বিচার শেষ না হওয়া অবধি এই কোর্ট বারান্দায় পড়ে থাকে, বস্তায় মুড়ি আর চিড়ে বাড়ি থেকে এনে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। যেটুকু সম্বল উকিল জামিনদার পেশকার চাপরাশি ও পুলিশকে দিয়ে দিতে হয়। খালাস হয়ে বাড়ী যায়, না হলে জেলের কয়েদী হয়ে সাজাখাটার আদেশ পালন করতে জেলে চলে যায়। পয়সাওয়ালাদের কথামত পুলিশ মকর্দমা সাজিয়ে দেয়, সরকারী উকিল ও জজ সাহেবের পুলিশের তৈরী কাগজের বাইরে যাবার উপায় নেই। গরীব মানুষ ভাল উকিল পয়সা খরচা করে দিতে না পারলে সাজাখাটা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না।

জজ সাহেবের চাপরাশী শিবু দোহারা চেহারা রং কাল খুব ছটফটে। চারদিকে তার নজর একবার জজ, একবার পেশকার আর একবার মক্কেল, সব দিকে তাকিয়ে কাজ করছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার টি. এন. মুখার্জী বয়সে মাঝ বয়েসী, গায়ের রং ফর্সা দেখতে সুন্দর কথাবার্তাও সুন্দর, উকিল হিসাবে অনেকের হাত দোষ আছে, আজ পর্য্যন্ত এই দোষ অবশ্য তাঁর কেউ দেয়নি।

কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইন্দ্রজিত গুপ্ত এ্যাড্‌ভোকেট এসেছেন, আসামীর পক্ষে ডিফেন্স কাউনসিলার, নামকরা এ্যাডভোকেট। বহু-লোক উভয় পক্ষের তরফে মকর্দমা শোনার জন্য এসেছেন। চারজন

মামলাবাজ লোক ঘুর ঘুর করছে, যেমন যাত্রাদলের গান শুনে যাত্রা বায়না করে, তেমনটি ওরা পরখ করবে বলে এসেছে। তাই ওরা কাছে পিঠে ঘেঁস দিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে।

মিঃ ইন্দ্রজিত গুপ্ত, ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন, 'কোর্টের পশ্চিম দিকে আসুন, অন্য লোকেদের এখানে আসতে দেবেন না। একটু কথাবার্তা আছে।'

ইব্রাহিমের পক্ষে ইসমাইল, কে. মল্লিক, হায়দর আলি, শম্ভু শেঠ, তারাপদ পাল সবাই দল বেঁধে হাজির হয়েছে। ওরা সিঁড়ি ঘিরে দাঁড়াল।

মিঃ ইন্দ্রজিত, সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, কাল কোট। কোটের উপর কাল গাউন। গলায় এ্যাড্‌ভোকেট ব্যাণ্ড পড়ে আছে। গায়ের রং ফর্সা ধপ্‌ধপে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পায়ে বুট জুতো ও মোজা।

মিঃ ইন্দ্রজিত, 'ইব্রাহিম, আমি যেমন যেমন বলেছি, সাক্ষীরা বলবে তো?'

ইব্রাহিম,—'হঁ্যা, বলবে। তবে কয়েকজন বলবে। সবাই বলবে না।'

ইন্দ্রজিত, 'বুড়িটা, তোমার ড্রাইভার, দারোয়ানব্যাটা ওরা কি করবে?'

ইব্রাহিম, 'আপনি যা বলেছেন ওরা তাই বলবে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, হতচকিত ভাবে, ইব্রাহিম বলল, 'স্যার শুনছি নাকি মেয়েটাকে ওরা আনছে।'

ইন্দ্রজিত, 'আনতে দাওনা, ওর ওয়ান সিকষ্টি ওয়ান নেই—আমি তুড়ি মেরে ওকে নাবিয়ে দেব।' একটু থেকে চারিদিকে তাকিয়ে, 'হঁ্যা! আমার টাকা দাও। গাড়ী করে এসেছি শুধুমাত্র তেল খরচা দিয়েছ, বাকী টাকা না পেলে আমি মকর্দমায় উঠব না। তুমি প্রদীপবাবুর জুনিয়ারকে দিয়ে মকর্দমা করে নেবে বুঝলে।'

ইব্রাহিম, 'আপনি তো বলেছেন, মকর্দমায় তেমন কিছু নেই।'

ইন্দ্রজিত, 'উকিলকে পয়সা দিলে তেমন কিছু নেই, না দিলে ওতেই দশ বছর বুঝলে? এখন টাকা কড়ি দেবে?'

ইব্রাহিম, প্যান্টের খাঁজের ভিতরের পকেট থেকে পাঁশশত টাকার নোট চারখানা বার করে ইন্দ্রজিত গুপ্তের হাতে দিল।

ইন্দ্রজিত, 'এইকথা তো ছিল না, বড্ডো কম হয়ে গেল। বাকীটা কিন্তু দিয়ে দিও বুঝলে!'

জজ সাহেবের চাপরাশি শিবু, আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল,- 'আসামী মহম্মদ ইব্রাহিম, আসামী মরিয়ম বিবি, আসামী রেখা পাল—হাজির—হাজির।'

ইন্দ্রজিত, 'ইব্রাহিম মকর্দমার ডাক পড়েছে কাঠগড়ায় ঢুকে যাও।'

জজের ঘরের একই সঙ্গে দুটি দায়েরা খাঁচা, ইব্রাহিম তার একটা দরজা খুলে ঢুকে গেল এবং আর একটা খাঁচায় মরিয়ম বিবি ও রেখা পাল ঢুকল।

সিপাই দরজা এঁটে দাঁড়াল।

জজ সাহেব—'আজকের সাক্ষী কটা ?

হরিধন, 'তিনটী সাক্ষী আছে।'

জজ সাহেব, 'সাক্ষী তুলে দিন, পি. পি.কে ডাকুন। ডিফেন্সে কে আছেন, উকিলকাবুকে খবর দিন। ষ্টেনোবাবুকে ডেকে দিন।'

ইন্দ্রজিত—'স্যার আমি ডিফেন্স কউন্সিল ইন্দ্রজিত গুপ্ত, হাই-কোর্টে প্র্যাকটিস্ করি। আপনি স্যার ব্যারিষ্টার জে· এন. গুপ্তকে চেনেন আমি তাঁর ছেলে।'

জজসাহেব, 'উনি তো আমার মাষ্টার মশাই ছিলেন। কলকাতা ইউনিভারসিটী ল' কলেজের লেক্চারার ছিলেন। আচ্ছা বেশ, বেশ।'

জয়ন্ত সামন্ত, হাতে পেনসিল ও শর্টহ্যাণ্ড রেকর্ডিং এর খাতা নিয়ে জজের পাশে এসে বসলেন।

জজসাহেব, 'শিবু দেখ একবার, পি. পি·কে ডেকে দাও, অনেক সাক্ষী আছে।'

পাবলিক প্রসিকিউটার টি. মুখার্জী, হন্তদন্ত হয়ে এলেন, তাঁর গাউনের পিছনের দিক ছিঁড়ে গেছে, কোটের হাতের কনুই দুটোর সেই অবস্থা।

ইন্দ্রজিত, 'আপনিই পি. পি. নমস্কার।'

টি মুখার্জী, 'নমস্কার।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনি একজন পি. পি. একটু ফিট্‌ফাট থাকবেন না, এইভাবে ?'

টি. মুখার্জী, 'আমাদের বিল পাচ্ছিনা, হাইকোর্টের সরকারী উকিলদের সরকার ফি বেশী করেছে, কিন্তু মফঃস্বলের সরকারী উকিলদের ফি অনেক কম।'

ইন্দ্রজিত, 'আমি তো প্যানেলে ছিলাম, এখন নাম বাদ করিয়ে নিয়েছি। ঐ পয়সায় এই কাজ করা যায় না।—যাক। আজ আপনার মামলা হবে তো ? ভিক্‌টিম্‌ গার্ল কোথায় ?'

টি. মুখার্জী, 'আমি তো খবর দিয়েছি, এখনও আসেনি, দেখছি, আর কি করতে পারি বলুন।'

জজসাহেব, 'আপনার সাক্ষী তুলে দিন। আপনাব কেসটি বলুন

টি. মুখার্জী, 'আনডার সেকসন, থ্রি সিক্সটি্‌ এইট্‌ সেভেনটি এণ্ড থারটিফোর অব আই. পি. সি.। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ইণ্ডিয়ান পেনালকোড অনুযায়ী আসামী ইব্রাহিম মাইনর সুস্মিতা দে কে তার ল-ফুল কাস্‌টডি থেকে কিড্‌ন্যাপ করে। আসামী মরিয়ম বিবি ও আসামী রেখা পাল এই কাজে তাকে সাহায্য করেছে এবং ওরা ওকে এক্সপোর্ট করার ব্যবস্থা করেছিল। সেই অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে এডিং সেকসন থারটি ফোর সহ।' জজসাহেব, 'সাক্ষী তুলে দিন।'

ইন্দ্রজিত, 'স্যার সাক্ষী কি করে হবে ? হোয়ার ইজ ভিক্‌টিম গার্ল ? সেই মেয়েটি কোথায় ? মেয়েটিকে ছাড়া কি করে সাক্ষী হবে।'

টি. মুখার্জী—'কেন সাক্ষী হবে না, আমি সব কাগজপত্র দিয়েছি। আপনি যদি কোন কাগজ না পেয়ে থাকেন, আগে বলবেন।'

শিবু, পেশকারের কাছ থেকে হাজিরার কাগজ নিয়ে আদালতের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল 'সাক্ষী প্রিয়নাথ দে হাজির, হাজির।'

প্রিয়নাথ এই আওয়াজে হন্তদন্ত হয়ে আদালতের ঘরে ঢুকে জানাল সে হাজির আছে।

শিবু তাকে জজসাহেবের সামনে উইটনেশ বক্সে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। বিয়ের পুরুতের মত মন্তর পড়তে সুরু করল, বলুন, 'আমি যাহা বলিব সত্য বলিব।'

প্রিয়নাথ, 'আমি যাহা বলিব সত্য বলিব।'

.শিবু, 'কোন কিছু গোপন করিব না।'

প্রিয়নাথ, 'কোন কিছু গোপন করিব না।,

শিবু বলুন—'সব-সত্য কথা বলিব।'

প্রিয়নাথ,—'সব সত্য কথা বলিব।'

শিবু —'স্যার! ওথ্ হয়ে গেছে স্যার।'

হরিধন, 'আপনার নাম বলুন।'

প্রিয়নাথ, 'আমার নাম প্রিয়নাথ দে।'

হরিধন, 'পিতার নাম।'

—'চন্দ্রনাথ।'

—বয়স কত ?

—'চল্লিশ।'

—ঠিকানা ?

—'খন্যান, থানা পাণ্ডুয়া জেলা হুগলী।' ডিপোজিসান রেকর্ড করার জন্য কাগজটিতে সব লিখে হরিধন, জয়দেব সামন্তের হাতে তুলে দিল।

টি. মুখার্জী, 'আপনি পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেছেন ?'.

প্রিয়নাথ, 'হ্যাঁ, আমি অভিযোগ করেছি। আমার কন্যা সুস্মিতাকে ইব্রাহিম চন্দননগর স্কুল থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। পাচার করেছে। এজেহারে এইসব লেখা আছে।'

টি. মুখার্জী, 'আচ্ছা আপনি এই লেখা দেখুন তো, কার হাতের লেখা কার হাতের সই।'

প্রিয়নাথ লিখিত এজেহারটি হাতে নিয়ে, 'আমার হাতের লেখা, সই আমার।'

টি. মুখার্জী —'স্যার এফ. আই. আর.-টা এক্সজিবিট হবে, স্যার নম্বর পড়বে।'

জজসাহেব, 'পেশকারবাবু নম্বর বলুন।'

হরিধন, 'এক্সজিবিট নং ওয়ান এবং ওয়ান বাই ওয়ান সই।'

টি. মুখার্জী 'মালখানারবাবুকে ডাকাত হবে সীজ্ আরটিলকেল আছে।'

শিবু, মালখানায় খবর দিল, পেশকারবাবুর কাছে থেকে শ্লিপ নিয়ে চলে গেল।

টি. মুখার্জী, 'আপনার বাড়ী ফটো ছবি এইসব কিছু রাখা হয়!'

ইন্দ্রজিত, 'স্যার লিডিং হয়ে যাচ্ছে।' সেপাই কতকগুলি বাণ্ডিল বাঁধা জিনিষপত্র নিয়ে কোর্টে হাজির হল।'

টি. মুখার্জী, 'সিপাই কাগজের বাণ্ডিলগুলোর মধ্যে ফটোর অ্যালবাম একটা আছে বার কর। সিপাই কাগজের বাণ্ডিলের মধ্য থেকে অ্যালবামটি বের করল।'

টি. মুখার্জী,—'ওনার হাতে দাও।'

প্রিয়নাথ, অ্যালবামটি গ্রহণ করে ভালভাবে দেখে জজের মুখের দিকে তাকিয়ে, 'এই অ্যালবাম আমাদের বাড়ীর, আর এই ফটো আমার মেয়ে সুস্মিতার।'

ইন্দ্রজিত, 'আই অবজেক্ট স্যার, নেগেটিভ্ চাই না হলে ফটো যাবে না।'

টি. মুখার্জী, 'মিঃ ইন্দ্রজিতবাবু, আপনি অনুগ্রহ করে ব্যস্ত হবে না।' পরে সিপাহির দিকে তাকিয়ে, 'এই সিপাই ঐ বাণ্ডিলের পাশে প্লাষ্টিক কাগজের একটা মোড়ক আছে সেটা খুলুন।'

সিপাই প্লাষ্টিক কাগজের মোড়কটি খুলল, তাতে গুটোনো ফিল্ম বের হল। 'ওটা ওনার হাতে তুলে দাও।'

সিপাই প্রিয়নাথের হাতে দিল।

টি. মুখার্জী, 'বলুন এগুলো কি ?'—

প্রিয়নাথ, 'এগুলো নেগেটিভ এইগুলো থেকেই ঐ ফটোগুলি তৈরী করান হয়েছে।'

ইন্দ্রজিত, 'আমি তো নেগেটিভের কপি পাইনি। আমাকে নেগেটিভের কপি দিতে হবে না হলে যাবে না স্যার।'

টি. মুখার্জী, 'আপনাকে তো সিজার লিস্টের কপি দিয়েছি।'

জজসাহেব, 'পেশকারবাবু এক্সজিবিটের নম্বর বসান।'

টি. মুখার্জী, 'এই ফটোগুলো কোথায় ছিল ?'

প্রিয়নাথ, 'আমার বাড়ীতে ছিল। গনারবুড়ি আমাদের বাড়ির ঝি, ইব্রাহিম ওকে পাঁচ টাকা দিয়ে ফটোগুলি নিয়ে নিয়েছিল।'

টি. মুখার্জী, 'কোনটি কার ফটো ওতে আছে ?'

প্রিয়নাথ, 'এইটি আমার মেয়ে সুস্মিতার ফটো।'

জজসাহেব, 'আইডেন্টিফায়েড ফটো অব দি ভিক্‌টিম গার্ল এক্সজিবিট ইট্‌।'

হরিধন, 'এক্সজিবিট নং দুই অ্যালবাম। দুই এর এক ফটো সুস্মিতা।'

টি. মুখার্জী, 'এই ফটোগুলি কোথায় ছিল ?'

প্রিয়নাথ, 'আমাদের বাড়ীতে ড্রয়ারে ছিল।'

টি. মুখার্জী, 'নেগেটিভটা কোথায় ছিল ?'

প্রিয়নাথ—'ঐগুলি পুলিশ সুপারকে আমরা দিয়েছিলাম। যখন পুলিশ সুস্মিতার ফটো চাইল, অ্যালব্যাম পেলাম না। তখন আমার স্ত্রী নেগেটিভ্‌ বার করে দেয়।'

টি· মুখার্জী একটা সিল করা খাম তুলে নিয়ে জজকে দেখালেন, 'দেখুন স্যার এই খামটির সিল ঠিক আছে, আপনারা যে কেউ দেখে নিন, সিল ঠিক আছে কিনা ?' সকলে মিলে দেখে নিল।

টি· মুখার্জী, 'এইবার সিল ওপন করছি। সিপাই এই খামের মুখের গালা খুলে ফেল।'

সিপাই পেশকারের কাছ থেকে কাগজ কাটা ভোতা ছুরি দিয়ে গালা খুলে খামটি পি-পির হাতে দিল।

টি. মুখার্জী, 'খামের মুখ খুলে একটি ফর্মের উপর একটি ফটো আছে সরকারী সিল দেওয়া কাগজ বার করে জজের কাছে তুলে ধরলেন।'

জজসাহেব, 'সাক্ষীকে দিন।'

টি. মুখার্জী, 'সাক্ষীর হাতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, দরখাস্তে কোন ফটো আছে ?'

প্রিয়নাথ, 'হ্যাঁ আমার মেয়ের ফটো আছে।'

জজসাহেব, 'আইড্যানটিফায়েড্ এবং এক্সিজিবিট।'

হরিধন, 'এক্সিজিবিট তিন।'

ইন্দ্রজিত 'আমি অবজেকসান দিচ্ছি। এই ফটো আইনে যাবে না।'

টি. মুখার্জী, 'সিপাইজি আর একটা খাম আছে ওটা দিন।'

সিপাই. কাগজের মোড়ক থেকে, সিল শুদ্ধ খামটি দিল।

টি. মুখার্জী—'আর একটি খাম ওপন করব, আপনারা সিল ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।' সবাই মিলে দেখে নিল।

টি. মুখার্জী, 'সিপাই খামের গালা খুলে দাও।'

সিপাই খামটির গালা খুলে দিয়ে শুধু খামটি টি. মুখার্জীর হাতে ফেরত দিল।

টি. মুখার্জী খামটি খুলে জজসাহেবে হাতে দিলেন।

জজসাহেব—'হুঁ' বলে মন্তব্য করে আবার টি. মুখার্জীর হাতে খামটি ফেরত দিলেন।

টি. মুখার্জী, প্রিয়নাথের খোলা খাম থেকে একটি লাগান ফর্ম হাতে দিলেন বললেন, 'দেখুন ফটোকার ?'

প্রিয়নাথ, 'আমার মেয়ে মতন মুখ, তবে ?'

ইন্দ্রজিত—'আমার অবজেক্সন স্যার এই ফটোগুলো এক্সিজিবিট হবে না।'

টি. মুখার্জী, 'অবশ্যই এক্সজিবিট হবে, সরকারী পাশপোর্ট অফিস থেকে সংগৃহীত ওতে সই আছে, সীল আছে। সুতরাং এভিডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে এক্সজিবিট হবে।'

জজসাহেব,—'পেশকারবাবু এক্সজিবিট্ করুন।'

টি. মুখার্জী, 'আপনার মেয়ের বয়স কত ?'

—বছর পনের।

—কোথা থেকে আপনার মেয়ে কিড্ন্যাপ হয়েছে ?

—চন্দননগর সেণ্টপল ইস্কুলের গেট থেকে, ইব্রাহিম ওকে

কিড্ন্যাপ করে ট্যাক্সি করে নিয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিত—'আই অরজেক্ট দ্যাট্।'

জজসাহেব—'আপনি যখন জেরা করবেন, তখন বলবেন।'

টি. মুখার্জী, 'আপনি ঐদিন কোথায় ছিলেন ?

—'আমি ঘটনার দিন আমার মেয়েকে স্কুলের গেটে নামিয়ে দিয়ে রিক্সা করে অফিস যাই। আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম ডব্লু বি. টি· ৩৯০ নং ট্যাক্সি নিয়ে আসে। আমার মেয়েকে ঐ ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে।'

—'গাড়ির নম্বর আপনি কি করে জানতে প্যরলেন ?'

—গেটের দারোয়ান রামজীবন দেখছে, তার গেটে ট্যাক্সির নম্বর লিখে রেখেছে। দারোগাবাবু ঐ ট্যাক্সির নম্বর লিখেছেন। দারোগা-বাবু ঐ ট্যাক্সি আটক করেছেন। কটা, কাগজ পত্র পেয়েছেন। গাড়ীর ড্রাইভার এইসব কথা বলেছে।

টি. মুখার্জী, 'আপনি আপনার মেয়েকে পেয়েছেন ?'

প্রিয়নাথ, 'না'।

টি. মুখার্জী, 'দেখুন ত, ডকে যারা রয়েছে তাদের কাউকে চিনতে পারেন কি না ?

প্রিয়নাথ, 'একজনকে চিনতে পেরেছি।'

জজসাহেব, 'কাছে যান আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিন।'

প্রিয়নাথ কাঠগড়া থেকে নেমে খাঁচার কাছে গেল এবং আঙ্গুল দিয়ে ইব্রাহিমকে দেখিয়ে দিল।

পি. পি. 'কি নাম ?'

—'ইব্রাহিম।'

—জজসাহেব, আসামীর প্রতি, 'কি নাম আপনার।'

—'ইব্রাহিম,' আসামী জবাব দিল।

টি. মুখার্জী, 'আইডেনটিফায়েড এ্যাক্যুজ্ড। বাকী দু'জন মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখুন আর কেউ আছে কিনা ?

প্রিয়নাথ, 'মহিলাদের চিনিনা।'

টি. মুখার্জী, 'দ্যাটস্ অল।'

জজসাহেব,—'ক্রশ্—ক্রশ্।'

ইন্দ্রজিত, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রিয়নাথবাবু, আপনি তো নিজের চোখে ইব্রাহিমকে, আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেন নি।'

প্রিয়নাথ,—'না।'

ইন্দ্রজিত, লোকেব মুখে নানা কথা শুনে ইব্রাহিমকে সন্দেহ করছেন ?

প্রিয়নাথ—'হাঁ।'

ইন্দ্রজিত, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে ইব্রাহিমের মনমালিন্য আছে ?'

প্রিয়নাথ, —'হাঁ।'

টি মুখার্জী, চেয়ারে বসে চোখ পাকিয়ে অস্বীকার করতে ইঙ্গিত দিল। কিন্তু প্রিয়নাথ অসহায়।

ইন্দ্রজিত, 'আপনি অহেতুক এক ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন ? ...যান —নেবে যান।'

প্রিয়নাথ কাঠগড়া থেকে যখন নমলা, তার গায়ের গেঞ্জি মায় পাঞ্জাবী ভিজে লেপটে গেছে।

শিবু, প্রিয়নাথকে উইটনেশ বক্স থেকে নামিয়ে ঘরের মধ্যে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল, বাইরের সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা ও কথা বলতে দিল না। শিবু দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিল, 'সাক্ষী গণা বাউল দাস।'

গণাবুড়ি এজলাসের কাছে এসে হাজির হল।

শিবু বুড়িকে সাক্ষীর কাঠগড়াতে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

হরিধন—তোমার নাম কি ?

—গণা

হরিধন, কি পদবী,

—পদুবী আবার কি ?

টি মুখার্জী—গণা বাউল দাস নাম তো ?

—হিঁ বাবু

হরিধন, তুমি লেখাপড়া জান ?

—ন্যাকাপড়া ?

হরিধন, 'শিবু ওকে হলপ পড়িয়েছ।' শিবু গণাবুড়ির কাছে

গিয়ে, 'আমি কতকগুলো মন্তর পড়ব, তুমি ও মুখে বলবে—বুঝলে। বল।'

—বল,

—আমি যা বলব, সব সত্য কথা বলব।

—সব সত্যো কওথা বলব।

—'কোন কথা মিথ্যা বলিব না।'

—ক্যানো কথা মিথ্যে বলিব না। হরিধন, 'শিবু তুই থাম, হয়েছে।' টি মুখার্জী, 'তোমার নাম গনাবুড়ি ওরফে গণা বাউল দাস।'

—হিঁ বাবু।

—তুমি প্রিয়নাথের বাড়িতে ঝিএর কাজ করতে? প্রিয়কে দেখিয়ে।

—হিঁ বাবু,

—তুমি ইব্রাহিমকে চেন?

—না।

টি. মুখার্জী, 'ওখান থেকে নেমে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখ।' ইন্দ্রজিত, 'স্যার উইটনেস জানেনা বলছে? পি. পি. ওকে ধমক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

টি. মুখার্জী, 'আপনি এগিয়ে যান, ঠিকমত দেখুন, আপনার লোক আছে কিনা?'

—হ্যাঁ

টি· মুখার্জী, 'কই কে তোমার চেনা লোক? আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দাও।'

গণা ইব্রাহিমকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

টি· মুখার্জী, 'নাম বল।'

—ইব্রাহিম ব্যাটা।

ইব্রাহিমের মুখ শুকিয়ে গেল, ইন্দ্রজিত মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

—টি· মুখার্জী, 'আবার এখানে এস।' গণাকে ডকে তুলল, হাতে অ্যালবাম দিল, জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?'

—ফটো ফটো, সুমি, সুমি—

—'তুমি সুমির ফটো চেন ?' গণা অ্যালবাম খুলে সুস্মিতার ফটো দেখাল, ফটো নাড়াচাড়া করায় গণাবুড়ি কাঁদতে লাগল, তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল, মুখে কথা বলতে পারছে না।

টি. মুখার্জী, 'কি হল, বুড়ি কাঁদছ কেন ? তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে ?'

গণা সাক্ষীর কাঠগড়ায় কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল।

টি. মুখার্জী, 'স্যার আমার খুব ভুল হয়েছে, ফটোগুলোতে ক্লোফর্ম মাখান ছিল—ফরেনসিকের রিপোর্টে নোট আছে। আমার স্যার ভুল হয়ে গেছে ওর হাতে না দিলেই হত। ওকে জল হাওয়া দিলেই সেরে উঠবে। ফটোগুলি সেপাই গুছিয়ে রাখ, খুব সাবধান তুমি নাড়াচাড়া করবে।'

গণাবুড়িকে শিবু আর সেপাই ধরাধরি করে নিয়ে বারান্দায় শুইয়ে দিল।

ইন্দ্রজিত, 'স্টপ উইটনেস টুডে, আমি আজ জেরা করতে পারব না।'

জজ সাহেব স্টপ উইটনেস এ্যাট্ প্রেজেন্ট বলে খাস কামড়ায় চলে গেলেন।

বাইরে কোর্ট বারান্দায় বেশ ভীড় জমেছে গণাবুড়ির চারদিকে।

একুশ

ট্যাক্সি চলছে দিল্লীরোড দিয়ে, ট্যাক্সিতে ইন্দ্রজিত গুপ্ত, ইব্রাহিম, মোরিয়াম বিবি এবং রেখা পাল, সেসন আদালতে আসছে। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে চলেছে। আপ ও ডাউনে পাশ দিয়ে লড়ী গাড়ী ওভারটেক্ করে চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রজিত, ইব্রাহিমকে বলল, 'যে সাক্ষ্যটা আমাদের পক্ষে দেবার কথা, বুড়ি উল্টো পাল্টা সাক্ষী দিল কেন ? ওকে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি ?'

ইব্রাহিম, 'আমি ওকে একখানা কাপড় কিনে দিয়েছি, নগদ একশ টাকা দিয়েছি। তাতেও উল্টে গেল।'

ইন্দ্রজিত, 'ফটো গুলোর কি এখনও অ্যাকসন কাটেনি ?'

ইব্রাহিম, 'হাই ডোজের ক্লোরোফর্ম কোথাও কিছু থেকে যেতে পারে।'

ইন্দ্রজিত, 'তাহলে ওকে জেরা করব না, ডিক্লাইন করে দেব। এইসব লোক বিপদ ঘটায়, মুখ্যু লোক কিছু বোঝে না, কখন কি করে বসে। দত্তবাবু কি করবে ?'

ইব্রাহিম, 'দত্ত ঠিক আছে, চাবুকের মত। আপনি যেমন শিখিয়েছেন, সব না বলতে, আমিও ওকে না বলতে শিখিয়েছি আপনি আমাদের কেসের কি বুঝছেন ?' ইন্দ্রজিত, 'দেখলে তো, আমার বাবার ছাত্র। বাবার প্রতি ওর কিছু না কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। তাছাড়া ভিকটিম্ গার্ল আসবে না। আজই মকদ্দমা শেষ করে দেব। তবে টাকা পয়সা দাও। রোজই দেব দেব বলে এড়িয়ে গেলে কি হবে ? টাকা না পেলে উকিলদের বুদ্ধি খোলে না।'

ট্যাক্সিটা চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় পার হয়ে, পুলিশ লাইন ও কোর্ট বিল্ডিং এর ফাঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ইন্দ্রজিত তার ব্রিফকেশ নিলেন, ল' বুকসগুলি ওর ড্রাইভার নিয়ে পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে জজ কোর্টের দোতলায় এগিয়ে চললেন। পিছন পিছন আসামীরাও আদালতে চলছে।

জজ সাহেব জেনারেল বেল ম্যাটার শেষ করে বসে আছেন। পারসন্যাল ফাইলে দায়রা মকদ্দমা, উকিল বাবুদের বলে দিলেন আজ আদারস্ ম্যাটার হবে না। শিবু আসামীদের নাম ধরে হাঁক দিচ্ছে। ইন্দ্রজিতকে দেখেই শিবু বলল, 'আসামীদের হাজিরা পড়েনি ডাক হয়েছে, আসামীদের হাজির করে দিন।'

ইন্দ্রজিত জজ সাহেবকে সেলাম জানিয়ে বলেন, 'স্যার কলকাতার রাস্তায় বিরাট জ্যাম, এখন আবার ওয়ান ওয়ে, আশ পাশ দিয়ে ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে যে পালিয়ে আসব তার কোন পথ নেই, তাই দেরী হল স্যার। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' জজসাহেব, 'সাক্ষী তুলে দিন। আর দেরী নয়।'

ইব্রাহিম, মোরিয়ম বিবি, ও রেখা পাল আসামীদের কাঠ গড়ায় মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল গণাবুড়ি কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। টি· মুখার্জী

বসে আছেন, পেশকার হরিধন তার নিজের জায়গাতে, শিবু সেপাই মায় ষ্টেনো জয়ন্ত সবাই তৈরী।

ইন্দ্রজিত, 'আমি ওকে স্যার ডিক্লাইন করছি। কোন জেরা করব না। আজ স্যার মকদ্দমার সাক্ষী সব শেষ করে দিন।'

টি· মুখার্জী, হরিহর দত্তকে সাক্ষী ডেকে দেবার জন্য হরিধনকে বললেন। শিবু কোর্ট বারান্দায় সাক্ষী হরিহর দত্ত বলে হাঁকার দিল। হরিহর দত্ত কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পেশকার তার নাম, ও ঠিকনা লিখে ডিপোজিসান রেকর্ড করার জন্য জয়ন্ত সামন্ত ষ্টেনোর হাতে দিল। শিবু ওকে হলফনামা পড়িয়ে দিল।

টি· মুখার্জী উঠে দাঁড়িয়ে, 'দত্ত মশাই, আপনি তো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হানড্রেট সিক্সটি ফোরের জবান বন্দী দিয়েছেন ?'

হরিহর, 'আজ্ঞে না।'

ঈন্দ্রজিত কট কট করে হরিহরের দিকে তাকাচ্ছে।

টি· মুখার্জী, 'দেখুন আপনার সই দেখুন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আপনি যা বলেছেন, আপনার কথামত তিনি লিখেছেন। হরিহরের হাতে কাগজখানি দিলেন। হরিহর কাগজখানি নিয়ে সই দেখে, 'আমার সই আছে। তবে আমি কি বলেছি মনে নেই।' টি· মুখার্জী, 'বুঝেছি রোগ ধরেছে। বেশ সেইমত আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

টি· মুখার্জী, 'আপনি স্বেচ্ছায় হাকিমের কাছে বলেছেন। হাকিম আপনার কথা কথামত লিখেছেন। আপনাকে পড়ে়শুনানর পর, তারপর আপনি সই করেছেন। কি বলছেন আপনি দেখে বলুন!'

হরিহর, 'আজ্ঞে না।'

টি· মুখার্জী, 'আদালতে মিথ্যে কথা বললে আপনার সাজা হবে জানেন ?'

হরিহর, 'আজ্ঞে না।'

ইন্দ্রজিত, 'লোকটা একেবারে বোকা! হাঁ। না জানে না।'

টি· মুখার্জী, 'আপনি কোন ভয় খাবেন না।'

হরিহর 'আজ্ঞে না।'

টি· মুখার্জী, 'আপনি সত্যি কথা বলুন, না হলে আপনার

বিপদ হবে।' হরিহর, 'আজ্ঞে না।'

জজসাহেব 'কি হয়েছে আপনার? বাংলা কথা বুঝতে পারছেন না। জেলে পাঠাব।'

হরিহর, 'জোড় হাতে আজ্ঞে না। আমি বুঝতে পারছি না।'

টি. মুখার্জী, 'আমি জিজ্ঞেস করছি লেখা হাকিমের তো আপনার কথামত হাকিম লিখেছেন। হরিহর—'হ্যাঁ আমার কথামত হাকিম লিখেছেন।'

ইন্দ্রজিত, 'হোস্টাইল করুন। করে ওকে ক্রশ করুন।'

টি. মুখার্জী, 'থাক আপনি অনুগ্রহ করে এই বিষয়ে পরামর্শ দেবেন না।' হরিহরের প্রতি, 'হাকিম আপনাকে পড়ে শুনানোর পর আপনি সই করেছেন।' হরিহর 'হ্যাঁ।'

টি. মুখার্জী, 'এঠা স্যার এক্সজিবিট হবে। জজসাহেব, 'নো মোর, ক্রশ।' ইন্দ্রজিত 'আপনি এখন কি করেন?' হরিহর 'কাঁচা আনাজের ব্যবসা করি।'

ইন্দ্রজিত, 'কতদিন করছেন?'

হরিহর, 'প্রায় দুবছর ধরে।'

টি. মুখার্জী 'এবার তো বুঝতে কোন গোলমাল হচ্ছে না। স্যার সাক্ষীর কনডাক্টটা, আপনি রেকর্ড রাখবেন।'

ইন্দ্রজিত, 'এর আগে কি করতেন?' হরিহর, 'ড্রাইভারী করতাম প্যারালিসিস হবার পর থেকে ড্রাইভারী আর করতে পারিনা। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে। এখন কাঁচামালের ব্যবসা করি।'

ইন্দ্রজিত, 'হাকিমের কাছে সাক্ষী দিয়েছিলেন?'

হরিহর, 'সাক্ষী দিয়েছি, কি বলেছে মনে নেই।' ইন্দ্রজিত, 'যান এবার নেবে যান।' জজসাহেব, 'অন্য সাক্ষী ডাকুন।' ইন্দ্রজিত, 'স্যার ভিকটিম্ কোথায়? আমি গত দিন আপত্তি করেছিলাম। ভিকটিম্ বাদ দিয়ে এই মকদ্দমার সাক্ষী হলে ক্ষতি হবে। প্রসিকিউসান ভিকটিম্‌কে আগে দিলেন না। একটা বাজে পচা মকদ্দমা আর কতকাল স্যার আপনি টাইম দেবেন। আজই স্যার ত্রি থার্টিন করে শেষ করে দিন। আমি স্যার হাইকোর্ট কামাই করে

রোজ রোজ আসছি, আর একটু একটু সাক্ষী হচ্ছে।'

জজসাহেব, পি· পি· সাক্ষী তুলে দিন। আজই আমি মকদ্দমা শেষ করে দেব। আপনি যদি ভিক্‌টিমকে এনে দেন তো দেন, না না তো ব্রি থার্টিন হয়ে যাক।'

টি· মুখার্জী, 'পেশকারবাবু শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবার ডেকে দিন।' শিবু বারান্দায় গিয়ে হাঁক দিল, 'সাক্ষী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হাজির।' বিষ্ণুপ্রিয়া আদালতের মধ্যে এলেন শরীর খুব শীর্ণ, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন যথারীতি নাম, ধাম হলপনামা হয়ে গেল। টি· মুখার্জী তাঁকে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন।

—আপনি প্রিয়নাথ দের স্ত্রী, সুস্মিতার মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটার ভিতর থেকে, 'হ্যাঁ।'

—সুস্মিতার কি হয়েছিল ?

—চন্দননগর সেন্টপলে রোজ পড়তে যায়, ওর বাবা ওকে পেঁছে দিয়ে আসে বিকেলে ওর সহপাঠিদের সঙ্গে বাড়ী চলে আসে। —ঘটনার দিন কি হয়েছিল ?—ওর বাবা ওকে ইস্কুলে পেঁছে দিয়ে অফিস চলে যায়। অন্য দিনের মত ও আর ইস্কুল থেকে ওর বন্ধুদের সাথে বাড়ী ফিরে আসেনি।

টি. মুখার্জী, 'আপনি কি করে খবর পেলেন ?'

—'চন্দনা,রুপালী, এবং মিতালী আমাদের পাড়ার মেয়ে ওরা সুস্মিতার সঙ্গে পড়ে, ওদের মুখে শুনলাম, ডব্লু. এম. টি. ৩৯০ নং ট্যাক্সিতে করে একজন ভদ্রলোক আমার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।'

—'কোন ভদ্রলোক আপনার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে জানেন ?'

—'আমার বাড়ীর ঝি, গণাবুড়ির মুখে শুনলাম ইব্রাহিম আমার ঝিকে ফুসলে আমাদের বাড়ীতে রাখা অ্যালবাম ঘর থেকে নিয়ে যায়। তারপর ইব্রাহিম বাড়ী থেকে চলে যায়। আমার মেয়েরও খোঁজ পাওয়া যায়না।'

টি. মুখার্জী, শিবু সেপাইকে বল অ্যালবামটা খুলে দেখাতে ওনার হাতে যেন না দেওয়া হয়।

সিপাই অ্যালবাম খুলে ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখতে থাকেন।

টি. মুখার্জী, —'কার কার ছবি আছে ?'

—'এতে আমার মেয়ের ছবি আছে, আমাদের পরিবারের ছবি আছে।'

—'কোথায় ছিল ছবিগুলি ?

—এই অ্যালবামে, আমাদের বাড়ীতে।

—'এখানে এল কি করে ?'

—'আমাদের ঝি গণাবুড়ি ঐ অ্যালবামটি চুরি করে নিয়ে পাঁচ টাকায় ইব্রাহিমকে বিক্রী করেছিল।' পুলিশ ওর গাড়ী থেকে অ্যালবাম সীজ করেছে।'

—'আচ্ছা আপনি এই ছবিটি দেখুন।' পাসপোর্ট ছবি দেখালেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া,—'আমার মেয়ের মত মুখ তবে মুসলিম মেয়ে।

ইন্দ্রজিত, 'স্যার নোট নেবেন, মুসলিম মেয়ে।'

টি. মুখার্জী, 'আচ্ছা আর এই ছবিটি দেখুন, আর একটি পাস্-পোর্ট ছবি দেখালেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমার মেয়ের মত মুখ তবে এটা হল মেমসাহেবের ছবি।'

ইন্দ্রজিত—'কাইন্ডলি, আপনি স্যার নোটটি নেবেন, মেমসাহেব, আমার মেরের মতন মুখ। আর কি নেবেন আর কিছুই নেই, ছেড়ে দেন।'

টি. মুখার্জী, 'আপনি আসামীদের মধ্যে কাউকে চেনেন নাকি? চিনলে দেখিয়ে দিন ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'একজন কে চিনি।'

টি. মুখার্জী, 'কাকে চেনেন, দেখান।'

বিষ্ণুপ্রিয়া আঙ্গুল দিয়ে ইব্রাহিমকে চিনিয়ে দিল।

জজসাহেব, 'আইডেনটিফায়েড্ মহম্মদ ইব্রাহিম।'

টি. মুখার্জী, 'বাকী অন্য আসামীদের চিনতে পারছেন ?'

বিষ্ণুপ্ররা—'না।'

টি. মুখার্জী, 'আপনার মেয়ে কোথায় ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'ইব্রাহিম নিয়ে গেছে, ও কোথায় নিয়ে গেছে, কোথায় রেখেছে ও জানে!'

টি. মুখার্জী, 'দ্যাটস অল, এইবার ওদের উকিলবাবু আপনাকে প্রশ্ন করবেন। আপনি বুঝে উত্তর দেবেন। আর না বুঝতে পারলে আবার জিজ্ঞাসা করবেন।'

ইন্দ্রজিত, 'যে আসামীকে আপনি চেনালেন ওর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'না',

ইন্দ্রজিত, 'তবে চেনালেন কি করে?'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'গ্রামের লোক বলে চিনি।'

ইন্দ্রজিত—'আপনার মেয়েকে ইব্রাহিম নিয়ে গেছে আপনি তো নিজের চোখে দেখেন নি?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি তো বলিনি আদালতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

ইন্দ্রজিত—'ইব্রাহিম যে আপনার মেয়েকে নিয়ে গেছে কি করে জানলেন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'গণা বুড়ির কাছ থেকে ইব্রাহিম অ্যালবাম নিয়েছে। তারপরই আমার মেয়ে ইস্কুল থেকে চুরি গেছে, আর ইব্রাহিমও বাড়ী থেকে উধাও।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে কি ওর ভাব ছিল?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'ভাব ছিল না তবে মেয়ের বাপের সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল। ও মেয়ের বাপকে শাসিয়েছিল।'

ইন্দ্রজিত, আপনি থামুন, আপনাকে শাসানোর কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

টি. মুখার্জী, 'মিঃ গুপ্ত আপনি একজন রেসপেকটেবল পারসন, আপনার কথাবার্তার ভিতর দিয়ে ডিগ্‌নিটী প্রকাশ পাচ্ছে না।'

জজসাহেব, 'অর্ডার—অর্ডার।'

ইন্দ্রজিত, 'পাশপোর্টের ফটো দুটো নিয়ে, এ দুটো আপনার মেয়ের নয় কি বলেন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমার মেয়ের মতন।'

ইন্দ্রজিত, 'দেখুন মানুষের মত মানুষ দেখতে অনেকে আছে। কি বলুন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রজিত, 'স্যার আজ এই থাক আবার কাল করব।'

জজসাহেব, 'আপনার মেয়ের ইস্কুল তো আপনি কোন দিন যান নি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'না'।

ইন্দ্রজিত, 'আপনার স্বামী আপনার মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় কি বলুন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'হ্যাঁ।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনার মেয়ে সারাদিন যে ইস্কুলে থাকে, কার সঙ্গে কথা বলছে কি করছে, আপনি জানেন না?'

বিষ্ণুপ্রিয়া—'না।'

ইন্দ্রজিত, 'আমি বলছি, আপনার মেয়ে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে ভাব করে চলে গেছে, আপনি জেনেশুনে অহেতুক আসামীদের জড়িয়ে দিয়েছেন।'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'না, ইব্রাহিম আমার মেয়েকে পাচার করেছে।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে ইব্রাহিমের শত্রুতা আছে বলে মিথ্যা কথা বলছেন?'

বিষ্ণুপ্রিয়া,—'না।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনি নেমে যান। স্যার—কাল যেন ভিক্‌টিম আসে, নইলে মকর্দমা শেষ করতেই হবে।'

বাইশ

জেনারেল ফাইলের কাজ শেষ, জজসাহেব, স্টেনো, পেশকার সবাই বসে, আসামীরা কাঠগড়ায় খাঁচায়, এ্যাডভোকেট ইন্দ্রজিত গুপ্ত খুব উত্তেজিত।—'স্যার আর কতদিন ভিক্‌টিম গার্লের নাম নিয়ে আসামীদের দিনের পর দিন এ ভাবে হয়রানী চলবে? গতকাল আপনার অর্ডারসীটে আপনি উল্লেখ করেছেন, আজ প্রসিকিউসন ক্লোজ হবে, থ্রি থার্টিন, এণ্ড আরগুমেণ্ট হবে। স্যার আপনার অর্ডার অনুযায়ী কাজ শুরু হোক।'

জজসাহেব, 'পি. পি. কে খবর দিন।'

শিবু পি. পি. কে ডাকার জন্য চলে গেল।

ইন্দ্রজিত 'মকদ্দমাটায় কি আছে স্যার, কিছু নেই, একজন আসামী। আইডেনটিফায়েড হয়েছে, তাও আবার যে চেনা লোক। আর বাকী দু' আসামীদের কেউ আইডেনটিফাই করতে পারেনি। যে আসামী ভিক্‌টিম গার্ল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, ঐ আসামীকে ভিক্‌টিম গার্লকে নিয়ে গেছে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক করেছে বা টাকার বিনিময়ে বিক্রী করেছে, এই অভিযোগ কিছুই আসেনি।'

জজসাবে, 'ইন্দ্রজিতবাবু। আপনি ত্রি থার্টিন হবার আগেই, আরগুমেন্ট আরম্ভ করে দিলেন। একটু দাঁড়ান পি. পি. কে আসতে দিন।'

টি· মুখার্জী, 'আদালতের পোষাকে এসে দাঁড়ালেন এবং বলা শুরু করলেন, স্যার ইন্দ্রজিত বাবুর এতে উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমি লালবাজার থেকে ম্যাসেজ পাবার পর আদালতে মুভ করেছি। আদালত কনসিডার করেছেন, ভিক্‌টিম গার্লকে আদালতে হাজির করার জন প্লেনে ভাড়া বাবদ দু হাজার টাকা রিকুইজট জমা দিয়েছি। এখনও যখন সংবাদ আসেনি তা হলে সময় দেবার জন্য অনুরোধ করছি।'

ইন্দ্রজিত, 'স্যার আজ আর কোন ডেট নয়, তা হলে স্যার আপনার অর্ডারকেই আপনি ভাইওলেট করবেন। দয়া করে ত্রি থার্টিন করে দিন। আপনি লাষ্ট চান্স দিয়েছেন। ভিক্‌টিম গার্ল আর আসবেনা।'

জজসাহেব—'বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আমি টাইম দিয়েছিলাম, আর আমি টাইম দিতে অপারগ। আমি ত্রি থার্টিন শুরু করে দিচ্ছি। পি· পি· আপনি আরগুমেন্টের জন্য তৈরী হন। পেশকার-বাবু আপনি রেকর্ডটা আমায় দিন। আপনি একজন একজন আসামীকে ডেকে দেবেন।' হরিহর মকদ্দমার নথিটি জজসাহেবের কাছে দিলেন। জজসাহেব নথি হতে একটি সাদা কাগজে কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করলেন। মহম্দ ইব্রাহিমের ডাক পড়ল।

হরিধন, 'সিপাই, মহম্মদ ইব্রাহিমকে ডেকে নিয়ে এস।'

সিপাই, ইব্রাহিম কার নাম আছে, আসুন বলে, খাঁচার দরজা

খুলে দিল।

ইব্রাহিম খাঁচা থেকে বার হয়ে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ল। জোর হাতে নমস্কার করল।

জজসাহেব, 'আমি আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন করব, আপনি ইচ্ছা করলে তার উত্তর দিতে পারেন। তবে বুঝে শুনে উত্তর দেবেন। আপনার উত্তর আপনার বিরুদ্ধেও প্রয়োগ হতে পারে।'

মহম্মদ ইব্রাহিম, ঘাড় নেড়ে, সম্মতি প্রকাশ করল।

একজন হোমগার্ড কনস্টেবল একটি রেডিওগ্রাম ম্যাসেজ নিয়ে পি. পি., টি. মুখার্জীর হাতে দিয়ে পিয়নবইএ সই করিয়ে নিল।

ইন্দ্রজিত আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে ইব্রাহিমের বন্ধুরা ভীড় করে চার পাশে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিত ওদের অভয় দিয়ে বলল, আর ভয় নেই, যখন থ্রি থার্টিন শুরু হয়েছে আবার কি? মেয়ে এলেও আর কিছু হবেনা। কেন না বিচারের তো একটা পদ্ধতি আছে। খুব হাসাহাসি হচ্ছে।

টি. মুখার্জী ম্যাসেজ পড়েই জজসাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, স্যার, ভিক্‌টিম গার্ল তো রওনা হয়েছে এই এল বলে তা কি হবে? আর একটু সময় আপনাকে দিতে হবে।'

জজসাহেব, 'পিটিশন করুন।' মহম্মদ ইব্রাহিমকে কে বললেন, আপনি এখন নেবে দাঁড়ান।'

কথাটা ইন্দ্রজিতের কানে গেল, সিগারেটটা হাত থেকে বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গলগল করে ধুঁয়ো বার করে তাড়াতাড়ি আদালতে এসে জানাল, 'স্যার কি করে হবে, আপনি তো প্রসিকিউসন উইটনেস ক্লোজ করে দিয়েছেন? আবার এই অবস্থায় সাক্ষী নেবেন? তাছাড়া ঐ সাক্ষী কি বলবে? ওর তো কতকগুলো কাগজপত্র এনেছে এতে তো কভার করবে না।' জজসাহেব, 'আমিতো আরম্ভ করিনি এই ষ্টেজে সাক্ষী যখন আসছে, তখন আমাকে তো সাক্ষীকে নিতেই হবে। সাক্ষী নেবার পরই না হয় হবে।' টি· মুখার্জী একটি দরখাস্ত ও ম্যাসেজটি যুক্ত করে জজসাহেবকে দিলেন। ইন্দ্রজিত—'তাহলে যখন এখন হচ্ছে না তখন আসামীদের যদি বাইরে যেতে অনুমতি দেন।'

জজসাহেব—'আপনারা বাইরে যান।'

সিপাই গেট খুলে দিল আসামীরা আদালতের বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। দোতলার বারান্দার নীচে পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

ইব্রাহিম, 'উকিলবাবু কি হবে তাহলে মেয়েটা যে এসে গেল? তা হলে উপায়?' ইন্দ্রজিত আমার সঙ্গে যা কনট্রাক্ট ছিল, তাতো শেষ হয়ে গেছে। তোমরা তো বলেছিলে, ঐ মেয়ে কোনদিন ফিরবে না। তা হলে এল কি করে? আমি বলেছিলাম পুরা টাকা দিতে, দায়িত্ব নেব। এখন বাকী টাকা দিলে বাকী দায়িত্ব নিশ্চয় নেব।'

ইব্রাহিম, 'আপনাকে বলেছি টাকার জন্য আপনি ভাববেন না। কিন্তু মামলাটা জিততে হবে।' ইন্দ্রজিত, 'নতুন করে আমার খাটুনি আবার বাড়ল, নতুন করে টাকা কি দেবে সেটা না হয় পরে হবে তবে বাকী টাকাটা আমার আজই চাই। না হলে, মকদ্দমার নথি ফেলে দিয়ে কলকাতায় চলে যাব।'

ইব্রাহিম, 'বেশ এই টাকা নিন—দুই বাণ্ডিল টাকা তুলে দিল ইন্দ্রজিতের হাতে।'

ইন্দ্রজিত টাকা গুনে নিল আর বলল, 'টাকাটা কম হল।'

ইব্রাহিম, 'স্যার মনে যদি না করেন, একটা কথা বলব, আমি জানতাম, ডাক্তাররা নার্সিংহোমে ছুরি ধরার আগে, একরকম কথা বলে আর রোগীকে অপারেশনের টেবিলে ফেলে আর এক কথা।' ইন্দ্রজিত, 'এতই যখন বুদ্ধি ফেঁশে আছ কেন? ইব্রাহিম, 'মেয়েটা আসছে কি হবে?'

ইন্দ্রজিত, 'এলেই বা ঐ সাক্ষীর কি দাম আছে? পুলিশের কাছে কোন এজেহার নেই। টি. আই প্যারেডে কোন আসামী চেনায়নি। আইনের চোখে ঐ সাক্ষীর কোন মূল্য নেই।'

দোতলার বারান্দার নীচে পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল। একটি গাউন পরা, পায়ে হিল তোলা জুতো পরা, শীর্ণকায় দেহ অনুমান বছর পনের ষোল এংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীকে পুলিশ গার্ড দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাগজপত্র এনে জজের আদালতে হাজির হল। মেয়েটি আদালতে আসার সময় পিছনে

বহুলোক ভেঙ্গে পড়েছে, শুধু মেয়েটিকে দেখার জন্য মেয়েটি কি সাক্ষ্য দেয়, কি ঘটনা জানার জন্য জনতা উৎসুক। মেয়ে পুলিশের জিম্বায় জজের ঘরে বসিয়ে কাগজপত্র সব আদালতে জমা দিল।

পাবলিক প্রসিকিউটার সাক্ষীর সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই জজসাহেব এজলাসে বসে, আসামীদের আবার খাঁচায় দাঁড়াতে হুকুম দিলেন। পেশকারকে হুকুম দিলেন পি· পি. কে ডাকতে। সাক্ষী তুলে দিতে বললেন। সিপাই পি. পি· কে ডাকতে গেল। শিবু সাক্ষীকে ডেকে তুলে হলফ পড়াতে লাগল।

টি. মুখার্জী দ্রুতগতিতে এসে আদালতকে জানালেন, 'স্যার একটু সময় হলে ভাল হয়, একটু দেখে নিতাম।' ইন্দ্রজিত, আপনি তো, অনেকবার সময় নিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত মকদ্দমা জেতার জন্য কাকে কোথা থেকে ধরে আনলেন ?'

টি· মুখার্জী বাদানুবাদে না গিয়ে কাজ শুরু করলেন, 'আপনার নাম'। মেয়েটি ইতস্তত করায়, 'হোয়াট ইজ ইওয়োর নেম ?'

—'মাই নেম ইজ মেরী' মেয়েটি উত্তর দিল।

—'হোয়াট ইজ ইওর ফাদারস নেম ?' প্রশ্ন করেলেন।

—'মিঃ যোসেফ, মেয়েটির কাছ থেকে উত্তর এল। সারা আদালতে হাসির রোল পড়ে গেল।

—জজসাহেব, খুব সাক্ষী হয়েছে নামিয়ে দিন।

টি. মুখার্জী, 'স্যার রেকর্ড আমার হাতে, একটু দেখতে দিন, এই ফটোগ্রাফটি কার? বলে গোয়াতে গৃহীত ফটোগ্রাফ, ইন্টারন্যাশানাল পাশপোর্টের দরখাস্তের কপিসহ টি. মুখার্জী মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন। 'দিস ইজ মাইন' মেরী উত্তর দিল। মেরীর তখন মনের মধ্যে রিফ্রেশ অব মেমোরী শুরু হল। মেরীর মনে হল, সে যেন নিউ মুম্বাইতে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার পরনে নীল রংএর সালোয়ার ও নীল রংএর পাঞ্জাবসহ বোরখা মুসলিম পোষাক, পায়ে জরির জুতা।

সিঁড়ির নীচে, মরিয়ম বিবি ও রেখা পাল দাঁড়িয়ে হাত নাড়া দিয়ে ওকে বিদায় জানিয়েছিল। তখন ওর নাম ওরা রাহেলা খাতুন দিয়েছিল। রেখা তার নাম পরিবর্তন করে রমিছন বিবি বলে।

চলন্ত সিঁড়ি মেরীকে নিয়ে তাজ হোটেলের ওপরের তলায় উঠতে থাকে। সেদিন রমিছন বিবি মুচকি হেসে বলেছিল, 'তোর আজ বিয়ে, যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে রাজার চেয়েও ধনী। সেখ সাহেব জেড্ডার বিখ্যাত অয়েল ম্যাগনেট হুসেনের সঙ্গে, ওর কথা শুনে চলবি, সারাজীবন আর তোকে ভাবতে হবে না।'

এখন আসামীর খাঁচায় ওদের প্রতি চোখ মেলে চেয়ে ওদের হাড়ে হাড়ে চিনেছে, আবার চোখ ঘৃণায় ফিরিয়ে নিল। মনে পড়ল, সেই চলন্ত সিঁড়ি ওকে নিয়ে দাঁড় করাল সেখ হুসেনের ঘরে। ঘরটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। দরজা জানালায় নানা রংবেরং এর চিত্র বিচিত্র পর্দা। ঘরের মধ্যে আয়না ফিট করা। মেঝেতে মূল্যবান পাথর দিয়ে মোজায়েক। তার ওপর কাশ্মিরী কার্পেট'। দেওয়ালে নগ্ন নারী মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গীতে নিখুঁত ভাবে শিল্পীর তুলিতে আঁকা। ঘরের শিলিং ও কাঁচের গুচ্ছ ফুলের গোলাকার বল, তার মধ্যে কার্নিশের ফোকরে হাল্কা সবুজ রং এর নিয়ন লাইট। ঘরের মধ্যে মূল্যবান মেহগিনী কাঠের টেবিল চেয়ার, ডবল বেডের ইংলিশ খাট, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। সেই শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন সেখ হুসেন, তাঁর পরিধানে সাদা ধবধবে পাজামা ঢিলে পাঞ্জাবী। তিনি মুম্বাই হাই সমুদ্র বক্ষে ভারত সরকার যে তেল উত্তোলনে ওয়াল্ড ব্যাংকের টাকা ও সরঞ্জমের সঙ্গে যুক্ত। আরব থেকে সোনা স্মাংগলিং হয়ে ভারত ও সিঙ্গাপুরে আসে, তার অনেক লোকজন, এই ব্যবসায়ে যুক্ত, তাই সেখ হুসেন এই হোটেলের একজন স্থায়ী বোর্ডার। মাঝে মাঝে তাঁকে থাকতে হয়, তাই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হোটেল কর্তৃপক্ষের লোকজন, একজন নৈশ সহচরী সরবরাহ করে থাকে। চলন্ত সিঁড়ি ওকে মেমসাহেবের ঘরে হাজির করে দিয়েছিল।

সেখ সাহেব চিৎকার করে বলেছিল, 'জলদি আইয়ে', সেখ সাহেব বিছানা থেকে উঠে, ওর হাতে টেবিল থেকে একটি গ্লাসে ঢালা আংগুরের মদ তুলে দিল। সে হাতে নিল, তার হাত কাঁপতে লাগল, কি করবে ভারতে পারল না। তখন মেমসাহেব হুকুম দিল, 'গানা সুরু কর দেও।' ওর বেশ মনে পড়ছে, ওর হাত কাঁপতে

কাঁপতে পান পাত্রটি ওর হাত থেকে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের পাত্রটি ভেঙ্গে গেল, কাঁচ ও মদ ছিটকে সেখ সাহেবের জামা ও পাজামায় লেগে গেল।

সেখ সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'ইউ ব্লাডি গেট্ আউট'। সঙ্গে সঙ্গে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওকে বুকে সজোরে লাথি মারে। ও ছিটকে গিয়ে চলন্ত সিঁড়িতে পড়ে, তারপর ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ধাক্কা খেয়ে একটি ফ্ল্যাটে এসে পড়ল। এখানে ইউরোপিয়ান নাইট ক্লাব চলছিল। স্ত্রী ও পুরুষ নাচছে ও গান গাইছে। নিজ নিজ পছন্দমত বন্ধু-বান্ধবীকে নাচ গানে চুম্বনে মাতোয়ারা। হঠাৎ ওর পতনে ওদের নাচ গানে ছন্দ পতন ঘটল। ওর তখন নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।' ইউরোপীয়ানরা মেমসাহেবের কাণ্ড জানে, তাই হাসাহাসি শুরু করল। একজন ইউরোপীয়ান দম্পতি ওকে তুলে নিল, লিফটে করে নীচে নেমে এল, তার ড্রাইভারকে হুকুম দিল, গাড়ী চালাবার। ড্রাইভার চৌপাট্টি পার হয়ে কমলা নেহেরু পার্কে একটি বাড়ীতে চলে এল। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হল।

মুসলিম পোষাক পরিবর্তিত করে ওকে ইংলিশ পোষাক পরান হল। এই দম্পতির মহিলা হলেন সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী জোনী, তিনি স্কুলের শিক্ষয়ত্রী। ওর স্বামী মিঃ যোসেফ একটি কারখানার মালিক। ওরা ভারতে একমাস ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। ওরা ওকে খারাপ চরিত্রের মেয়ে ভেবে যতপরনাস্তি তিরস্কার করে, পরে ওদের কোন সন্তান নেই ভেবে ওকে রাখতে চাইলে, তাতে ও সম্মতি জানায়। ওর নাম ওরা দেয় মেরী। ওদের ঐ রাত্রিতে কোচিন বন্দর যেতে হবে, তাই ওরা মুম্বাই সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে যাবার জন্য ট্যাক্সিতে হাজির হল। রাতের বিমানে কোন রকমে সিট পেয়ে ওরা লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগল। ইলেকট্রনিক টিভিতে বিমানের নম্বর, আই সি ৪৬৭ নং ভেসে উঠল। যাত্রীরা সবাই লাইনে দাঁড়াল সিকিউরিটির জন্য। মালপত্র ওজন ও চেক হয়ে নম্বর দিয়ে বিমানে তোলার জন্য বিমান কর্মীরা নিয়ে নিল। যাত্রীদের একটা মেসিন দিয়ে পরীক্ষা করল, কোন শব্দ হলে, কোন বিস্ফোরক বা আগ্নেয়অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করা

হল। বোম্বাই বিমান বন্দরে দেশী ও বিদেশী যাত্রীদের ভীড় কোচিন যাবার বিমান রানওয়েতে ল্যাণ্ড করছে মাইকে ঘোষিত হল। কর্মীদের ডিউটি অনুসারে চলে যাবার নির্দেশ হল। দিল্লী পালাম বন্দর থেকে সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে একদল যাত্রী নেমে গেল। সেই সব ফাঁকা আসনে যাত্রীদের যাবার জন্য অনুমতি পড়ল। বিমান বন্দরে পর্য্যাপ্ত আলো, বিমনে সিঁড়ি লাগান, গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা—ওঠা আরম্ভ করল। মিসেস জোনী, মিঃ জোসেফ ওকে নিয়ে সিঁড়ি বয়ে বিমানে উঠে পড়ল। দেখতে দেখতে ফাঁকা সিট ফিলাপ হয়ে গেল। বিমানের গেটের চাবি পড়ে গেল সিঁড়ি সরে গেল। বিমান সেবিকা যাত্রীদের কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে ঘোষণা করল, বেল্ট বাঁধার টুংটাং শব্দ হতে লাগল। অক্সিজেন টেষ্ট করে দেখে নিল। বিমান দ্রুতগতিতে অ্যামবাসাডার গাড়ির মত রানওয়েতে ছুটতে লাগল। নির্দিষ্ট জায়গায় আসার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রাতের আকাশে লাল, নীল, সবুজ, আলো জ্বলে আর নেভে, আকাশে বিমান চলতে আরম্ভ করল। বিমান সেবিকার এসে প্রত্যেক যাত্রীকে হাতে তুলো টফি এবং কফি দিয়ে গেল। যাত্রীরা কানে তুলো দিল, টফি ও কফি খেয়ে নিল। কোচিন বিমান বন্দরে আসার কাছাকাছি যাত্রীদের আবার বেল্ট বাঁধার জন্য বিমান সেবিকারা জানালেন। বিমানটি ঘুরে ঘুরে নীচে নামতে লাগল, মাটিতে রানওয়ে টাচ্ করার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের চাকা মাটির উপর দিয়ে মোটর গাড়ির মতন ছুটতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে থেমে গেল। আবার সিঁড়ি এল যাত্রীরা নামতে লাগল। কোচিন বিমান বন্দরটি আলোয় ঝলমল করছে। বিমান সেবিকা হাতজোড় করে যাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জানালেন। জোনী, জোসেফ ও মেরী নেমে গেল, ওরা বিমানবন্দরে গিয়ে ওদের মালপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে কোচিন হারবারে চলে গেল। টিপু-সুলতান জহাজ, লাক্ষাদ্বীপে যাবে, আগে থেকেই ওদের বুকিং করা ছিল, শুধু মেরীর জন্য শিপিং করপোরেশনের কাছে আবার ওদের দ্বারস্থ হতে হল। ওরা দুশো দশ নং কেবিনটিতে প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। জাহাজটি চারতলা, লম্বায় আড়াইশো ফুট,

মিঃ পল, জানালেন, 'গোয়া নিবাসী মিস্টার হাই এর কন্যা মিস্‌ ববীর সঙ্গে আমার পুত্র ষ্টিফেনের বিয়ে। মিসেস্‌ হিরোডিয়া, মিঃ পলের স্ত্রী রান্নার ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে মিসেস্‌ জোনীকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দ প্রকাশ করল আলিঙ্গনের মধ্যে। মেরীকে দেখে, হ্যালো, তোর আবার মেয়ে হল কবে? এতবড় মেয়ে?

মিসেস্‌ জোনী বললেন, 'আমি ওকে মানুষ করছি, ও আমাকে মাদার বলে।'

রোডেসিয়া, 'ওকে ব্যাপটিষ্ট করেছিস?'

মিসেস জোনী—'না?'

রোডেসিয়া, 'ওকে কালই ব্যাপটিষ্ট করে নিবি। আমি করিয়ে দেব।'

মিসেস জোনী, 'আচ্ছা তাই হবে, ওর পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিয়েছি। আমি পাসপোর্ট অফিসে ওর দরখাস্ত ফটো পাঠিয়েছি। ষ্টিফেন যদি একটু দেখে তা হলে ভাল হয়।'

ষ্টিফেন, 'কপিটা আমায় দিন, আমি অফিসে যাব, আমার জানা-শুনা আছে, বার করে নিয়ে আসব।' একটু থেমে জোনী ও জোসেফের প্রতি, 'আপনারা দু-একদিন থেকে যান গোয়া সুন্দরী দেখে যান।'

পরের দিন হতে না হতেই সাজসাজ রব, সেন্ট ক্যাথে বহিন গির্জা, পুরান গোয়াতে রেজিষ্টার জেনারেল অব বার্থ, ডেথ, ম্যারেজারের কাছে বর ও কনে উপস্থিত হল। ষ্টিফেন বরের পোষাকে এল, পারার মেয়েরা ষ্টিফেনকে ঘিরে গান গাইতে লাগল। মিঃ হাই তার কন্যা ববীকে নিয়ে ট্যাক্সি করে গির্জায় হাজির হলেন। মিস্‌ববী বছর কুড়ি বয়েস মাঝারী চেহারা গোয়ার অধিবাসী গায়ের রং ইউরোপীয়ানদের মত নয়। ঘি রং এর সিল্কের গাউন প্রসাধন সামগ্রীতে সুসজ্জিত। ষ্টিফেন সিল্কের সাদা পোষাক। বন্ধুরা গুচ্ছ-গোলাপ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। মিঃ আলোকজাণ্ডার চিপ্‌ চার্চ বিশপ তাঁর ডেক্সের উপর থেকে প্রার্থনার বানী উচ্চারণ করলেন। সমবেত জনতা সেই বানী পুনরুচ্চারণ করলেন। সুবর্ণ নির্ম্মিত যীশু মূর্তির পাদদেশে প্রার্থনা শুরু হল। উপরে

মেরীমাতা তার শিশু সন্তান যিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রার্থনার পর মিঃ আলেকজাণ্ডার জানালেন, 'যারা কেবল মুখে ধর্মের বুলি বলে, তাঁরা প্রকৃত ধার্মিক নয়। তারা ঈশ্বরকে প্রভু বলে ডাকলেও স্বর্গে যেতে পারবেন না।'

সকলে হাত জোর করে নিজ নিজ পাপ স্খালনের জন্য যীশুর মূর্তির কাছে প্রার্থনা করলেন।

মিঃ ষ্টিফেন মিস ববীকে বিবাহ করছেন জানালেন এবং ফর্মে সই করলেন। মিস ববী সম্মতি দিয়ে ওতে সই করলেন। ওর পিতা মিঃ হাই সাক্ষী হিসাবে সই করলেন। উভয়ের মধ্যে ফরগেট মি নট বলে পুষ্প বিনিময় হল। মিষ্টার আলেকজাণ্ডার ওদের আশীর্বাদ করলেন, 'আজ থেকে তোমরা স্বামী স্ত্রী হলে। বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কামনা বাসনা পূর্ণ করবে, যে নারী বিবাহিতা তার দেহের উপর তার একা কর্তৃত্ব নেই তার স্বামীর ও অধিকার আছে।'

উভয়ে সম্মতি প্রকাশ করল। ফাদার উভয়ের হাতে মিলিয়ে দিলেন, উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজন খুসীর প্রকাশ করলেন জোসেপ ও জোনী উভয়ে চার্চের খাতায় নিজেদের নাম ঠিকানা দিয়ে মেরীর নাম রেজেষ্ট্রী করালেন।

ফাদার মেরীর গলায় একটি যীশু খৃষ্টের মূর্তির লকেট সমেত সিলভার নেকলেশ ঝুলিয়ে দিলেন। মেরীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'ভগবান যীশু তোমায় পাপ থেকে মুক্তি করুন। তোমার কামনা বাসনা পূর্ণ করুন।'

বিবাহের অনুষ্ঠানের পর গোয়ার সমুদ্র তীরে হনিমুন করতে নবদম্পত্তি গেল, তার সঙ্গে যোসেফ, জোনী ও মেরীও গেল। সমুদ্রতীরে নগ্ন দেহে বহু ইউরোপীয়ান নরনারী রৌদ্র স্নান করছে। ওরাও সবাই সমুদতীরে নগ্নরৌদ্র স্নান শুরু করতে লাগল। কথা হল আজ রাত্রিতে জোসেফ জোনী মেরীকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। প্লেনের টিকিট কাটা হয়েছে। পাসপোর্ট ও টিকিট রেডী।

মেরী এইভাবে জীবনে অভ্যস্ত নয়, সে পোষাক না খোলার জন্য

সমস্ত ইউরোপীয়ান নরনারী অনুভব করল মেরী ওদের সমাজকে অপমান করেছে। দুটি যুবক উলঙ্গ অবস্থায় মেরীর গায়ের গাউন ও প্যান্ট খুলে দিতে চেষ্টা করে। মেরী প্রাণপণে চিৎকার করে ওদের বাধা দেয়, এতে রীতিমত ঠেলাঠেলি, ধাক্কা আরম্ভ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে একদল টুরিশ্‌ট, পশ্চিম বাংলার বিধান সভার সদস্যের কমিটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

ইউরোপীয়ানরা ভাবল ওরা নিশ্চয়ই সাংবাদিক ওদের হাতের ক্যামরা দিয়ে উরোপীয়ানদের নগ্ন ছবি নিয়েছে, সংবাদপত্রে ও পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাদের দেশের কাছে এবং সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের মান ইজ্জত ছোট করে দেবে। এবার ওরা মেরীকে ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে সদস্যের হাতে ক্যামেরা ছিল, তা ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হল। আবার শুরু হল ধস্তাধস্তি একদল বাঙ্গালী যুবকদেব সঙ্গে একদল নগ্ন ইউরোপীয়ান নর-নারীর। বিধান সভার সদস্যদের সঙ্গে সিকিউরিটি ফোর্স ছিল, তাদের হুইসেল বেজে উঠল। আর মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ থেকে পুলিশ ফোর্স ছুটে এল। সমুদতীরে ছোটছোট কাঁকড়াগুলি যেমন বার হয় আবার ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ঐরকম সমুদ্রতীরে আসপাশে অনেক কটেজ আছে তার মধ্যে ইউরোপীয়ানরা লুকিয়ে পড়ল। পশ্চিম বাংলার বিধান সভার সদস্যের টিম সমস্ত বিষয় মেরীর কাছে শুনে নিল। পুলিশকে নির্দেশ দিল মেয়েটিকে কাসণ্টডিতে নিতে ওর আত্মীয়-দের সংবাদ দিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে।

মেরীর চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য একটার পর একটা ভাসতে লাগল।

পঁচিশ

আদালতের সাক্ষীর কাঠগাড়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি যেন কেমন কেমন করছে, মনে হচ্ছে ও যেন তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, এখনই হয়ত মূর্চ্ছা যেতে পারে জজসাহেব অনুভব করলেন, তিনি অর্ডারলিকে বললেন, 'মেয়েটা যেন কি রকম করছে, শিবু ওকে খাবার জল দাও।' গাড়ী

আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডেকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়নি,—জজসাহেব মনে মনে ভাবলেন। শিবু এক গ্লাস জল এনে মেয়েটার হাতে দিল, মেরী গ্লাসের জল পান করে গেলাসটি শিবুর হাতে ফেরত দিল।

টি· মুখার্জী, 'এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে মেয়েটির ভাবাবেগ লক্ষ্য করছিলেন, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ইজ ইওর ফাদারস্ নেম ?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'জোসেফ্ এণ্ড মাই মাদারস্ নেম ইজ জোনী।'

আদালত ঘরের সব লোক হেসে উঠল, এমনকি জজসাহেব পর্য্যন্ত হেসে উঠলেন।

ইন্দ্রজিত, 'স্যার এ সহ্য হয়না, কোথা থেকে একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে এনে, ভিক্‌টিম গার্ল বলে জুয়াচুরি করে পি. পি. মকর্দমা সাজাচ্ছে। ওকে স্যার নামিয়ে দিন।'

টি. মুখার্জী, 'স্যার ব্যস্ত হবেন না' আবার প্রশ্ন করলেন—'দোজ আর ইওর রিয়েল পেরেণ্টস ?' মেয়েটি উত্তর দিল, 'নো, কেয়ার টেকার!' টি. মুখার্জী আর একটি পাসপোর্টের দরখাস্ত সহ ছবি মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখ এই ছবিতে নাম লেখা আছে রাহেলা খাতুন, একটি মুসলিম মেয়ের ছবি, এটা কার ছবি বলতে পারবে ?'

মেরী, 'এটাও আমার ছবি।'

ইন্দ্রজিত, 'স্যার পাগল, স্যার একেবারে পাগল। ওকে নাবিয়ে দিন।'

টি. মুখার্জী, 'এই মেয়েটির নাম রাহেলা খাতুন, আর তোমার নাম মেরী ? তুমি কি করে রাহেলা খাতুন হলে ?'

মেয়েটির হাতে ছবি পড়ার পর, তার মনের মধ্যে পুরোন ঘটনার কথা মনে হল। সেদিন ছিল একটা সকাল বেশ খানিকটা রোদ উঠেছে, বোম্বেমেল, মান্দাদ রেল ষ্টেশনে এসে থামল। তিনজন কাল বোরখা পড়া মহিলা যাত্রী প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে একটি ট্যাক্সিতে উঠলেন। এই তিনজন মহিলা হলেন, মেরিয়াম

বিবি, রেখা পাল আর ওর ছদ্মনাম দিয়েছিল রাহেলা খাতুন। ওরা রাহেলা খাতুন বলে ওকে ডাকত। মেরী কাঠগড়ায় খাঁচার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল, হ্যাঁ তার লোক চিনতে কোন রকমের ভুল হয়নি। মরিয়ম বিবি হুকুম দিল ট্যাক্সির ড্রাইভারকে দৌলতাবাদে যেতে। ট্যাক্সি চালক, ছোট পাহাড় খাদ, উঁচু, নীচু দিয়ে একটি পুরোন দুর্গে হাজির করল। এই দুর্গ ছিল শিবাজীর। বাদশা ঔরঙ্গজেব দখল করে নিয়েছিল। সেদিন সে খুব অঝোড়ে কেঁদেছিল। কর্মব্যস্ত মানুষ পলকের চাহনিতে দেখে নেয় আবার নিজের কাজ চলে যায় যায়। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল, ও অন্যের ভাষা বোঝেনা, আর ওর ভাষাও ঐ এলাকার মানুষ বোঝে না। ওকে রেখা পাল ওরফে মরিছন বিবি খুবই বুঝিয়েছিল। মহম্মদবিন তুঘলকের কাহিনী শুনিয়ে এই জায়গায় ছিল বলে, মনটাকে হাল্কা করেছিল তার মনে হচ্ছিল সে যেন বলির পাঁঠা, শুধু বলির অপেক্ষায় আছে। তাই কান্নায় ভেঙ্গে না পড়ে কৌশলের জন্য সে অপেক্ষা করবে ঠিক করে ফেলল। তারপর ওরা দৌলতাবাদ থেকে, ঔরঙ্গাবাদে যায়, ঔরঙ্গজেবের কবর দেখে, পায়ের জুতা খোলে সালাম জানায়। রহিমছন বিবি ওকে বলে, ভারতের বাদশা ঔরঙ্গজেবের এই হল সমাধিস্থল, তিনি সম্রাট হলেও তিনি দরিদ্রের মতন জীবনযাপন করতেন। প্রজাদের অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করতেন না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ছোট মহীষীর সমাধি দেখে বিস্মিত হল, এ যেন নকল তাজমহল। এখানে ঔরঙ্গজেব প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ওরা জলঢাকিতে হাজির হল, রেখা পাল, ওকে বলেছিল, পারস্য থেকে এক ফকির এসে হুইল সিসটেমে নদী থেকে জল তোলার ব্যবস্থা করে। এখানে পানীয় জলের খুব সংকট ছিল। সেদিন রাতে ওরা মুসলিম বস্তিতে থাকে। ভোর রাতে আবার ওকে ট্যাক্সিতে তুলে ওখান থেকে চলে আসে শহর পার হয়ে, আবার পাহাড় বন জঙ্গলের রাস্তা ধরে একটা কাঁকুড়ে মাটির জায়গায় তখন মরিয়ম বিবি বলে, ইলোরা আগিয়া।' এখানে পাহাড়ের গা কেটে দ্বিতল গুহা অনেক হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ ও জৈনদের মন্দির আছে। এখানকার

কৈলাস মন্দির অপূর্ব। দুটি বড় বড় কালো কুচকুচে পাথরের হাতির মূর্তি খুব সুন্দর।

মহাবীরের দিগম্বর মূর্তি দেখল। ঐ সব মূর্তির কোথাও কোথাও ভাঙ্গা, জানতে পারল, মুসলিম বিজয়ে ঐসব মূর্তি ভাংচুর হয়েছে। আবার ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল, কাঁকুড়ে মাটির পাহাড় ছেড়ে ওরা চারদিকে ঘেরা পাহাড়ে গভীর জংগলে, অযোধ্যা পাহাড়ে এসে হাজির হল। বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারতের বুকে বজায় রাখার জন্য এই অজন্তা সংস্কৃতি ও শিল্প কারুকার্য্য। পূজারিনী কবিতায় বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী আদেশ ও ধর্মের আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের ছবি ওর মনে হল। তা থেকেই এই গভীর অরণ্যে অপূর্ব কারুকার্য বৌদ্ধ ধর্মকে জীবন্ত করেছে। এই গভীর অরণ্যে কতদিন ধরে কত শিল্পী গড়ে তুলেছে অপরূপ শিল্প। কত ত্যাগ, কত রুচিসম্মত ভারতের চিত্র শিল্পও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। পর্বত গাত্রে খোদাই করা বুদ্ধদেবের নানা ভাবের মূর্তি। পাহাড় থেকে নেমে ওরা আবার ট্যাক্সিতে উঠল, ট্যাক্সি আবার চলতে লাগল, পার্বত্য পথ দিয়ে এসে হাজির হল ঔরঙ্গাবাদ বিমান বন্দরে।

এই বিমান বন্দরে দেশী বিদেশী যাত্রী ভিড় করে আছে। সেদিনের যে যুবকটি কালো চশমা পরে হাওয়াই শার্ট ও সুট পরিহিত অবস্থায় বিমানের টিকিটগুলি মরিয়ম বিবির হাতে দিয়ে ছিল, আজকে তার দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরেছে। ঔরাঙ্গাবাদ বিমানবন্দর থেকে আই. সি. চারশ একানব্বুই বোয়িং বিমান মুম্বাই যাবে, মাইকে ঘোষণা হল। অন্যান্য যাত্রীরা যেমন লাইনে দাঁড়াল, তেমনি বোরখা পরা তিনজন মহিলা দাঁড়াল, নিরাপত্তা রক্ষীরা ওদের পরীক্ষা করে, ওদের পাশ করিয়ে একজায়গায় বসিয়ে দিল। লাউঞ্জ আলোয় ঝলমল করছিল। ওরা লাউঞ্জের তিনটি সিট দখল করে বসল। রানওয়েতে লাল সবুজ আলের নানা প্রকার ইঙ্গিত দিয়ে বিমান নেমে এল রানওয়েতে, তাতে সিঁড়ি লাগান হল, যাত্রীরা নেবে গেলে, তারপর অপেক্ষমান যাত্রীদের ছেড়ে দেওয়া হল। যাত্রীরা সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে বিমানে উঠল, বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে সিঁড়ি সরে গেল।

রানওয়েতে বিমান ছুটতে লাগল, বেশ জোরে জোরে ছুটতে ছুটতে আকাশে উঠল, তারপর দুবার ঘুরে নেবার পর মহাশূন্যে উঠে পড়ল। বিমান সেবীরা যাত্রীদের যথারীতি আপ্যায়ন ও মধুর ব্যবহার করল। দেখতে দেখতে আবার বিমানে টুংটাং আওয়াজ হল, বিমান সেবিকা ঘোষণা করলেন, 'মুম্বাই আসছে, যাত্রীরা কোমরে কুরশী বেঁধে নিন।' যাত্রীদের কোমরে কুরশী বাঁধার শব্দ হল। বিমানের গতি বেগ কমে এল ধীরে ধীরে ঘুরপাক খেয়ে বিমানটি রানওয়ে স্পর্শ করে ছুটতে লাগল এবং থেমে গেল। মুম্বাই এর সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরটি ভারতের একটি অন্যতম বিমান বন্দর। বিমানের দরজা খোলার পর আবার ওকে ট্যাক্সিতে ওঠান হল। ট্যাক্সি ওকে মুম্বাইএর জহুরী বাজারে রাত্রিতে একটি বাড়ীতে এনে হাজির করেছিল। এখানে সে একটি ঘরে বন্দিনী। বন্দিনী জীবন তার অসহ্য হয়ে ওঠে। সে পালাবার জন্য পথ খুঁজেছিল, চারিদিক বন্ধ। বারে বারে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। চিৎকার করেছে, তার চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে তারই কাছে ফিরে এসেছে। তার ঘরের তালা খোলার শব্দ হল, ঘরের মধ্যে এল মরিয়াম বিবি, রেখা পাল। সেদিন সে ছিল মরিয়ম বিবি। তার পোষাক পরিবর্তন করতে দেওয়া হল। তাকে পরিয়ে দেওয়া হল নীল রংএর সালোয়ার নীল রংএর পাঞ্জাবী, জরির ওরনা, বোরখা দিয়ে তার ফুটন্ত যৌবনকে ঢেকে দিয়ে আরও আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা হল। প্রসাধন সামগ্রীতে সাজিয়ে দেওয়া হল হল। সেদিন মরিদুন বিবি বলেছিল আজ তোর বিয়ে, যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে সে রাজার চেয়েও ধনী।'

আবার ওকে ট্যাক্সি করে ওরা মুম্বাই শহরে সমুদ্রের তীরে নুতন তাজ হোটেলের চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। তাদের আজ ভাল করে চিনতে পেরেছে। রাগে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠছে। নিজের ডান হাতের তর্জনী কামড়ে দেখল। না সে কোন স্বপ্ন দেখেনি, সত্যই সে চর্ম চক্ষুতে জল-জ্যান্ত মানুষগুলোকে দেখছে। ইন্দ্রজিত, 'মেয়েটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে গেল যে বোধহয় ওর স্টক ফুরিয়ে গেছে।'

টি· মুখাজী—'এই ছবিটি স্যার, সুবোধ চক্রবর্তী সি· আই ডি. অফিসার পাসপোর্ট অফিস থেকে সীজ করেছেন। এটাতে রাহেলা খাতুনের সই আছে। আরবিতে নয়, উর্দুতে নয়, ইংরেজীতে। আর মেরীর পাসপোর্ট অফিসের ছবি ও সই একই ইংরেজীতে। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টের ওপিনিয়ন একই ব্যক্তির হাতে লেখা।' ইন্দ্রজিত, 'আপনি কি আরগুমেন্ট আরম্ভ করলেন, সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন না করলে ছেড়ে দিন, অহেতুক আদালতের সময় নষ্ট করবেন না, আমি জেরা করব।'

টি· মুখার্জী, 'ফাষ্ট অব অল, ইউ সেড ইওর নেম ইজ রাহেলা খাতুন, হাউ ইট ওয়াজ পসেবল ?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'মেরী' ওয়াজ গিভেন বাই জোসেফ এন্ড জোনী। রাহেলা খাতুন ওয়াজ গিভেন বাই মোরিয়াম বিবি, দ্যাট লেডী।' আঙ্গুল দিয়ে খাঁচার মধ্যে থাকা মোরিয়ম বিবিকে দেখিয়ে দিল।' টি· মুখার্জী, 'প্লীজ গো দেয়ার এ্যান্ড আইডেনটিফাই।'

মেয়েটি উইটনেশ বক্স থেকে নেমে দ্রুত গতি তারের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'দিস ইজ মোরিয়াম বিবি।'

জজসাহেব, 'আপনার নাম বলুন।'

—'আমার নাম মরিয়ম বিবি', তার দেওয়া ঘেরা খাঁচার ভেতর থেকে জবাব দিল আসামী মরিয়ম বিবি।

জজসাহেব, 'আইডেনটিফায়েড মরিয়ম বিবি, এক্সকিউষ্ট।'

টি· মুখার্জী, 'দেখুন দেখুন, প্লিজ সি, কেন ইউ আইডেনটিফাই এনি মোর ?'

মেয়েটি খাঁচায় থাকা রেখা পালকে চেনাল।

জজসাহেব, 'আপনার নাম বলুন ?'

—আমার নাম রেখা পাল—খাঁচার মধ্য থেকে উত্তর এল।

মেয়েটি, 'ইয়েস—শী, ইজ হিন্দু, বাট শী টুক মুসলিম নেম।'

ইন্দ্রজিত, 'বলিহারী ভাই পি· পি. এরই মধ্যে লোক চেনানো হল।'

জজসাহেব, 'ক্যান ইউ আইডেনটিফাই এনি মোর ?'

মেয়েটি, 'ইয়েস, দিস জেনটেলম্যান।'

জজসাহেব, 'আপনার নাম বলুন।'

—'মহম্মদ ইব্রাহিম' ডকের ভেতর থেকে ইব্রাহিম জবাব দিল।'

টি. মুখার্জী, 'ও কি করেছে? হোয়াট হি হ্যাজ ডান?'

মেয়েটি, 'হি, টুক মি ফরম মাই স্কুল গেট। হি ইজ দি রুট অব অল। ইন্দ্রজিত, 'স্যার আমি একটা দরখাস্ত দিচ্ছি, আমার অবজেকসন আছে স্যার। আজ যে মেয়েটি ভিক্‌টিম বলে পি. পি. ওকে দিয়ে আইডেনটিফাই করালেন, ওটা আইনে যাবে না। টি আই প্যারেডে চেনান নি কেন? আপনি ঐ চেনাই করার রেকর্ড বাতিল করুন।'

টি. মুখার্জী,' 'আইনে কোন বাধা আছে? ভিক্‌টিম সে অপারচুনিটী আগে পায়নি। তার জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামীদের বর্ণনা করেছে। সুতরাং রেকর্ড স্যার বহাল থাকবে।'

জজসাহেব, 'ইউ মে, সাবমিট ইয়োর পিটিসন। দেআর আফটার আই উইল পাস মাই অর্ডার। নাও গো অন।' টি. মুখার্জী, 'হোয়াট ইজ ইওর রিয়েল ফাদারস্‌ নেম?'

মেয়েটি, 'মাই রিয়েল ফাদারস্‌ নেম ইজ, প্রিয়নাথ দে।'

জজসাহেবের দরজায় প্রচুর ভীড় জমেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া দে, ভিতরে ঢোকার জন্য চেষ্টা করছেন। পুলিশ ওকে ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে খুব হট্টোগোল হচ্ছে।

টি. মুখার্জী, 'হোয়াট ইজ ইওর রিয়েল নেম?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'মাই রিয়েল নেম ইজ সুস্মিতা দে।'

বাইরের দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ উপচে উঠে হুড়মুড় করে গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। মানুষ ঠেকাতে পারছে না।

জজসাহেব, 'নো মোর দ্যাটস অল, ক্রশ ক্রশ।'

ইন্দ্রজিত উঠে দাঁড়ালেন, নিজের শরীরটা দুলিয়ে নিলেন, চারিদিকে চেয়ে লোকের নজর আকর্ষন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'ইউ আর বেঙ্গলি?'

'ইয়েস', মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'কেন ইউ স্পিক বেঙ্গলি ?'

'ইয়েস', মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'আমি বাংলায় প্রশ্ন করব, উত্তর দাও দেখি ?' ইন্দ্রজিত ভাবলেন, যদি মেয়েটি ফিরিঙ্গি হয় তাহলে ধরা পড়ে যাবে, বাংলা বলতে পারবে না। ইন্দ্রজিত, 'তোমার বাবা কটা ?' 'ননসেন্সের মত প্রশ্ন হল না কি ? বাবা লোকর একটাই। আপনার বাবা কটা আপনি অবশ্যই জানেন ?'—মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করল। জজসাহেব, 'ইন্দ্রজিতবাবু আপনার বয়স আর ঐ মেয়েটির বয়স বুঝবেন! শালীনতা রেখে কোর্টের ডেকারাম বজায় রাখার চেষ্টা করুন। মেয়েটির প্রতি, 'ডোন্ট আস্ক এনি কোসচেন টু লইয়ারস।' ইন্দ্রজিতের প্রতি, 'গো, অন!' দরজায় প্রচুর ভীড় জনতা মেয়েটিকে দেখার জন্য প্রবল আগ্রহে আদালত গৃহের দরজা ঠেসে ধরেছে। গোলমাল হচ্ছে।

ইন্দ্রজিত, 'আমার সমস্ত এ্যাটেনশান নষ্ট হচ্ছে বাইরে গোলমালের জন্য। আপনি সাক্ষীর এজেহার ক্যামেরায় গ্রহণ করুন। না হলে আমার পক্ষে ক্রশ করা যাবে না। না হয় আজ আদালতের কাজ বন্ধ করার আদেশ দিন। আজ এ্যাডজোরন্ড করে দিন। আমি অন্য দিন করব।'

জজসাহেব, 'নো, নো, আই উইল ক্লোজ দি কেশ টুডে। প্লীজ গো অন।'

ইন্দ্রজিত, 'তুমি তো সুস্মিতা দে, তোমার কাছে কোন কাগজপত্র আছে, তাই দিয়ে প্রমাণ দেবে ?'

'আমার কাছে কোন কাগজ নেই'—মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'তোমার মা এই আদালতে সাক্ষী দিয়েছেন বলেছেন, তুমি তার হারানো মেয়ে সুস্মিতা দে কখনই নয়! এতে তোমার জবাব কি ?'

'এ হতেই পারেনা, আমার মা আমাকে চেনেন! আমিও আমার মাকে চিনি।'—মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'তুমি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ?'

—নো, এ্যাবসলিউটলী ফলস' মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'গোয়াতে সমুদ্রতীরে তোমাকে নোংরা কাজ করতে দেখে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ?'

—'পুলিশ আমার জীবন বাঁচিয়েছে, আমাকে দুষ্টদের হাত থেকে উদ্ধার করে দেশে পাঠিয়েছে।' নইলে আমি জীবনের মত দেশে ফিরতে পারতাম না'—মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'গোয়ায় সমুদ্র তীরে তুমি সান-বাথ করছিলে ন্যাকেড্ অবস্থায়।'

—'নো, ইট্ ইজ ফলস্', মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'তুমি নোংরা ভাবে জীবনযাপন কর, ওটাই তোমার পেশা ?'

—শাট-আপ্ ননসেন্স ! মেয়েটি উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল।

জজসাহেব—মিঃ ইন্দ্রজিতবাবু, আদালতের ডিগ্নিটী বজায় রেখে প্রশ্ন করুন।

টি· মুখার্জী, 'আমার জিজ্ঞাসা, এটা লারনেড্ কাউন্সিলারের নিজস্ব, না ওর মক্কেলের লিখিতভাবে নির্দেশ আছে ?'

ইন্দ্রজিত, 'আমার মক্কেলের কথাই বলছি।'

টি. মুখার্জী, 'আপনার মক্কেল আপনাকে ঐ প্রশ্ন করার জন্যে লিখিত ভাবে কোন ডাইরেকসন দিয়ে থাকলে আপনাকে আদালতে প্রোডিউস্ করতে হবে। না হলে আদালতের কাছে ঐ প্রশ্ন করার জন্যে আপনাকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।'

ইন্দ্রজিত, 'অবশ্যই দেখাব, তবে এখন নয় পরে।'

টি. মুখার্জী, 'তা হলে স্যার, আপনি লারনেড্ কাউন্সিলারকে একটু কশান্ দেন, না হলে আদালতে ডেকোরাম বজায় থাকবে না'

জজসাহেব, 'অর্ডার, অর্ডার, গো অন।'

ইন্দ্রজিত, 'তুমি এই ছবির মুসলিম মহিলা নও ?' বলে ছবি ছবি তুলে ধরলেন।

মেয়েটি, 'না, স্যার, আমিই সেই।'

ইন্দ্রজিত, 'তুমি হারান মেয়েটি নও, তুমি হারান মেয়ের অভিনয় করছ ?'

'না স্যার ! আমিই সেই সুস্মিতা দে, এখানে আমি কোন

অভিনয় করছি না'—মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রজিত, 'তুমি মিথ্যাভাবে নির্দোষ ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করেছ ?'

—'না, ওরাই প্রকৃত অপরাধী।' মেয়েটি জবাব দিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া আদালতের দরজায় ঘা দিয়ে আঘাত করছে, আমি, মেয়েকে দেখতে চাই বলে চিৎকার করছে !

টি. মুখার্জী, 'দরজা খুলে দিলে ক্ষতি কি— ?'

ইন্দ্রজিত, 'আই সিরিয়াসলি অবজেক্ট। আমি ওর চিপের সময় কোন প্রকার প্রকার বাধা দিইনি, আর আমি যখন ক্রশ্ করছি উনি বারে বারে কেন অবজেক্সান দেবেন ? এটা আমার কাজে ইনটারভিন হচ্ছে বলে আমি মনে করছি।'

জজসাহেব, 'আমার মনে হচ্ছে, দরজা খুলে দিন, বেশী লোক আদালতে না ঢোকে সেই দিকটা লক্ষ্য রাখুন।' আদালতের আদেশে দরজা খুলে দেওয়া হল। জনতার উত্তেজনা থেমে গেল।

ইন্দ্রজিত, 'আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রমাণ করব, মেয়েটি সুস্মিতা নয়। পি. পি. কারসাজি করে ওকে সুস্মিতা সাজিয়েছে শুধুমাত্র মকর্দমায় জেতার জন্য।'

আদালতে গৃহে অবগুণ্ঠনরত একটি মহিলা চিৎকার করে ওঠেন।

ইন্দ্রজিত, 'স্যার এই মহিলা আদালতের মধ্যে কাঁদছে, বিচারে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, ওকে আদালত থেকে বার করে দিন।'

জজসাহেব, 'আপনারা আদালতের মধ্যে অযথা ভীড় করবেন না।'

ইন্দ্রজিত, 'হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে তুমি মোটেই সুস্মিতা দে নও ?' তুমি যে সুস্মিতা দে এই আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবে ?'

আদালতের গৃহের মধ্য থেকে চিৎকার করে বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষণা করল, 'আমি প্রমাণ করে দেবো ঐ মেয়েটি সুস্মিতা দে কিনা ?'

ইন্দ্রজিত—কে আপনি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমি মেয়ের মা।'

ইন্দ্রজিত, 'আপনার সাক্ষী হয়ে গেছে আপনি আদালতের বাইরে

যান।'

টি. মুখার্জী, 'আদালতের কাছে নিবেদন আমি পিটিশান দিয়ে কল ফর করছি, ওর মায়ের আইডেনটিফিকেসান নেওয়া হোক, মেয়েটি সুস্মিতা কিনা?'

ইন্দ্রজিত, 'আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলব, শুধু উনি ঐ আমার মেয়ে—এই কথা বললে হবে না। যদি উনি প্রকৃত মেয়ের মা হন, তাহলে বলুন ঐ মেয়ের শরীরে গোপন অঙ্গে এমন কি চিহ্ন আছে যা থেকে আদালত বুঝবেন উনি মেয়ের মা, আর ঐ মেয়েই সুস্মিতা।'

জজসাহেব, 'ইট ইস্ সিওরলি জাষ্টিফায়েড্। এতে পি. পি. আপনার কোন প্রকার আপত্তি আছে?'

ইন্দ্রজিত, পি. পি. কে ঘাবড়ে যেতে দেখে খুবই উৎসাহিত, মনে মনে বলছে, এবার পথে এসো বন্ধু বল দেখি, কি জবাব দেবে?

টি. মুখার্জী, 'না, এতে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। জজবাহাদুর যা বলেছেন তাই হোক।'

জজসাহেব, 'বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েটির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। জজসাহেব বললেন, 'আপনার মেয়ের গোপন অঙ্গে বিশেষ কোন চিহ্নের বর্ণনা করুন, যা দেখে আমরা সকলে ঠিক করব; মেয়ে সত্যিই আপনার কিনা?'

মেয়েটি ডকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমি আমার মায়ের কাছে যাব। আই উইল গো টু মাই মাদার।'

বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমার মেয়ের বয়স যখন চার বছর ওকে দুধ খারয়ার জন্য একটি কাঁচের গেলাসে দুধ দেওয়া হয়েছিল। ও দুধ নিয়ে দৌড়তে গিয়ে পাকা মেঝেতে পড়ে যায়. এতে ওর ডান পায়ের হাঁটুতে এবং পেটে কাঁচ ঢুকে গিয়েছিল। অপারেশন করে ওই কাঁচ বার করা হয়েছিল, এখনও ঐ অপারেশনের দাগ শরীরে থেকে গেছে আর হাঁটুতেও দাগ থেকে গেছে। আমার মেয়ে হলে অবশ্যই ঐ দাগ ওর শরীরে থাকতে বাধ্য।'

জজসাহেব, 'আপনি দেখান এই মেয়েটির শরীরে আপনার বর্ণনা মত দাগ আছে কিনা?'

বিষ্ণুপ্রিয়া বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর, গাউন তুলে ধরল, ডান পায়ের হাঁটুতে কাট দাগ প্রকাশ পেল। ঐ দাগ সত্যি কাটাদাগ কিনা—ইন্দ্রজিত ও টি. মুখার্জী দেখলেন টি. মুখার্জী, জজসাহেবকে দেখালেন।

জজসাহেব, 'হুকুম দিলেন, পেটের দাগ আপনাকে দেখাতে হবে।'

টি. মুখার্জী, 'স্যার! এবার একটু ক্যামরা ছোট দরকার হবে, মেয়েটি প্রাপ্ত বয়স্কা, আদালতে প্রচুর ভীড়।'

জজসাহেব, 'মকর্দমায় যাদের দরকার আর উকিলবাবুরা ছাড়া অন্য কোন লোক আদালতে থাকতে পারবেন না। আপনাদের এখুনি আদালতের ঘরের বাইরে যেতে অনুরোধ করছি।'

জনতা নীরবে আদালত ঘর থেকে বার হয়ে গেল। একটা গুঞ্জন হল, 'এইবার ঘুঘু ফাঁদে পড়েছে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া গাউনটি ধরে উপরে তুলতে গেল, মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, গোয়ার সমুদ্রতীরে সানবাত্ চলাকালে দুজন ইউরোপীয়ান যুবক তার এই পোষাক খোলার চেষ্টা করেছিল। সেই দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়া ধমক দিয়ে বলে, 'সুমী! চুপ করে থাক্।' বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েটির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এই কোমল হাতের স্পর্শ সে বহুদিন অনুভব করেনি। তার জীবনে যেন কত শান্তি মায়ের কোমল স্পর্শে সে অনুভব করতে লাগল। বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েটির গাউন আস্তে আস্তে উপরে তুলে ফেলল, শরীরের পোশাকের বোতাম খুলে দিয়ে, পেটের সেই কাটা দাগটা বার করল। বিষ্ণুপ্রিয়া সেদিন একটা রিক্সা করে বাচ্ছা মেয়েটিকে পেটে কাঁচ বেঁধান রক্তঝড়া অবস্থায় কোলে করে ইটা-চুনা হাসপাতালে নগেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। নগেন ডাক্তার অপারেশন করে কাঁচ বার করে সেলাই করে দিয়েছিল। সেদিন ওর শরীর ছিল ছোট তাই ক্ষতস্থান ছিল ছোট। ও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ক্ষতস্থান বড় হয়েছে।

টি. মুখার্জী, 'স্যার লক্ষ্য করুন, বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষতস্থান মেয়েটির শরীরে বর্তমান রয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে ওর মাদারের ষ্টেটমেন্টে এবং পুরান ইনজুরীর বর্ণনা রেকর্ড করুন।'

ইন্দ্রজিত, 'আই অবজেক্ট দ্যাট, সিওরলি প্রিভিয়াসলি, ইট ওয়াজ শোন বাই পি. পি. স্যার! ঐ দাগ যে কাঁচের গ্লাসে কেটে যেতে পারে, শরীরে এই রকম কাটা দাগ হয়, এক্সপার্ট উইটন্যাস ডাক্তার ছাড়া যাবে না। আপনি, কাইণ্ডলি আমার অবজেকসনটি রেকর্ড করবেন।'

মেয়েটির প্রতি, 'আদিখ্যাতা দেখান হচ্ছে, খাড়া হয়ে দাঁড়াও। এবার বল দেখি তোমার সঙ্গে কারো ভাব ভালবাসা আছে কি?'

মেয়েটি ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার গলা জড়িয়ে ধরেছে তার কাঁধে মাথাটা রেখেছে, তার দু চোখ দিয়ে অঝোড়ে জল ঝড়ে যাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়ারও দুচোখ দিয়ে জল ঝড়ছে।

ইন্দ্রজিত, 'স্যার,' ডিমিনার অব দি উইটনেস রেকর্ড করুন।'

শিবু, 'স্যার, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।' আদালত গৃহে আওয়াজ উঠল, 'সে কি।' জজসাহেব, 'আই এ্যাডজোর্ন টুডে এণ্ড ফিক্স ফর টুমোরো।'

টি. মুখার্জী, স্যার, মেয়েটি যাতে ওর মায়ের কাস্টডিতে থাকতে পারে তার জন্য অর্ডার দিন। ওতো এখন জ্ঞান হরিয়ে ফেলেছে।' জজসাহেব, 'ওর মা বণ্ড দিয়ে নিক কাল কোর্টে হাজির করে দেবে। এই কনডিসান থাকবে।'

জসসাহেব এজলাস থেকে উঠে তাঁর খাস কামড়াতে চলে গেলেন।

আসামীরা তারের খাঁচা ঘেরা কাঠগড়া থেকে আদালতের বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তাদের শরীরের ঘামে গায়ের জামা ভিজে গেছে, কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়ছে। হরিধন, তার পেশকারী আসন থেকে লালকাপড়ের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। আসামীরা আসামী আজ আর ঐ দিকে তাকিয়েও তাকাল না। হরিধন বলল, 'মাথার উপর একজন আছেন, সত্যের ঢাক বাজবেই।'

শিবু আদালত কক্ষের ফ্যানের সুইস্ জোর করে দিল, শীতল বাতাস মা ও মেয়ের ক্লান্তি দূর করতে লাগল। শিবু সাক্ষীর বসার টুলটা এগিয়ে দিলে, তাতে কোনরকম বিষ্ণুপ্রিয়া মেয়েটিকে ধরে বসল। সুস্মিতার মনের রুদ্ধ দুয়ার হঠাৎ খুলে যায়। ঘটনার

সঙ্গে পরিচিত মুখগুলি একটার পর একটা, তার পুরান স্মৃতিকে আঘাত করে। তার মনের অবচেতন পর্দায় ঘটনাগুলি বারে বারে ভেসে উঠছে, মাঝে মাঝে সে মা-মা বলে চিৎকার করে উঠছে, আর তার মাকে কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরছে। হারান মেয়ে তার মাকে আর হারিয়ে না ফেলে এই আশঙ্কাই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সাড়া দিয়ে জানাচ্ছে, 'এইতো আমি রয়েছি।' তার গণ্ডদেশ বয়ে অশ্রু ধারা হিমালয় নিঃসৃত পুণ্য সলিলার মত বয়ে চলেছে।

—